সমন্বয় মার্গ

শ্রী সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

যাঁদের অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালবাসা এই পবিত্র কর্ম্মে আমাকে সাহস ও প্রেরণা দান করেছে, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে বইখানি উৎসর্গীকৃত হল।

১২ই মাঘ, ১৩৬৭ শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করার সৌভাগ্য হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী (১৯৩৮) উৎসবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে একনিষ্ঠ কেশব-সাধক শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "নববিধান" সাহিত্য নিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং প্রায় একত্রিশ বছর ধরে শতাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদির প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তার ভিতর ইসলাম ধর্ম্মে সুপণ্ডিত গিরিশচন্দ্র সেনের কোরাণ-বঙ্গানুবাদ তাঁর চেষ্টায় আমরা পেয়েছি। তেমনি হিন্দু, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের "শ্লোকসংগ্রহ" বইটার পরিবর্দ্ধিত (অষ্টম) সংস্করণটাও পেয়েছি। এই বইটা কেশব-নির্দ্দেশে সুরু হয় ১৮৬৬ খৃঃ এবং ১৮৮৬ খৃঃ পরিবর্দ্ধিত (তৃতীয়) সংস্করণে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থান পায়। ভারতীয়দের কাছে বিস্মৃতপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন কি ভাবে—প্রধানত: কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহকর্ম্মীদের প্রভাবে ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল. সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত রচিত "শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব" (১৮৮১) রচিত হল—এই বইটিও তিনি পুনঃপ্রকাশ করেছেন—এইসব গভীর ধর্ম্মসন্ধান ও সমন্বয়ের কাহিনী গ্রন্থকার প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের 'ধর্ম্মাঙ্কুর সভা' ও সিংহলী নেতা ধর্ম্মপালের 'মহাবোধি সমিতি' প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে, মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা যে বৌদ্ধ-চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন এবং বৌদ্ধ-যোগ-সাধনা ও নির্ব্বাণতত্ত্ব বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে জীবনে তার প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি কেশবভক্ত সুপণ্ডিত সতীকুমার তাঁর গ্রন্থে সুস্পষ্ট করেছেন। কেশবযুগের ঐ সকল মানুষদের কাছ থেকে ভারতের বহু পণ্ডিত অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনা ক্রমশঃ করেছেন। তাঁদের

কাছে সব খবর পৌঁছাতে হলে গ্রন্থকারকে এই মনোজ্ঞ রচনার একটি ইংরেজী ও একটি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার।

অসুস্থতার মধ্যেও আগাগোড়া "সমন্বয়-মার্গ" গ্রন্থখানি পড়েছি; সবিস্তার আলোচনা করা সম্ভব না হলেও এই নিবেদন করি যে বইটির দৃষ্টিভঙ্গী নূতন, পাঠক পাঠিকারা এই বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন ও ধর্ম্মজীবনে প্রেরণা পাবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও National Library প্রভৃতি গ্রন্থাগারে সঞ্চিত অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পুস্তিকার নির্য্যাস, বহু মনীষীর মত ও পথের সন্ধান গ্রন্থকার তাঁর "সমন্বয়-মার্গে" দিয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি এই মহৎ কাজ সুস্থ শরীরে বহুকাল সম্পাদন করে, সংঘাত-কণ্টকিত স্বাধীন ভারতে, তাঁর ঈপ্সিত সমন্বয়-মার্গের প্রসার দেখে যাবেন। তথাগত বুদ্ধের "ধর্ম্মচক্র" আমাদের জাতীয় প্রতীক হয়েছে; অথচ স্কুল কলেজে তার মর্ম্মগ্রহণ করাতে হলে এই গ্রন্থখানি তাদের গ্রন্থাগারে রাখা ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও করা চাই। শিক্ষকমণ্ডলীর এ ক্ষেত্রেও কর্ত্তব্য আছে— তাই "নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে" এ গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করতে অনুরোধ করি। সর্ব্ববিধ শিক্ষার মূলে যে নীতি-শিক্ষা ও তাই আসল জাতীয় জীবনের ভিত্তি সে কথা কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহপাঠী বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন প্রচার করে গেছেন। দুজনেরই জন্ম-শতাব্দী ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয়-শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে কি গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার অকাট্য প্রমাণ গ্রন্থকার দিয়েছেন "ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন" থেকে এক পাতা উদ্ধৃত (facsimilie) করে; এমনি অনেক প্রাচীন তথ্য নূতন তাৎপর্য্য নিয়ে দেখা দিয়েছে "সমন্বয়-মার্গে"। এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

সূচীপত্র

সংযোজন ও সংশোধন

পৃঃ ৮, ৩৭, ৫৯ "New Samhita" (1915 Edn.) P. 83, 81, 16.

পৃঃ ২৮ ১৯৫৫ খৃঃ বানুহুঙ্‌ মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়।

পৃঃ ৩০ "সঙ্গত সভার" পূর্ব্বে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃঃ ৩৬, ৩৯, ৪২ "Lectures in India" (1954 Edn.): We Apostles বক্তৃতার ৪৫০-৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৮ পাদটীকায় "একে দশ" ১৮৭৯ খৃঃ হইবে।

পৃঃ ৬৯ "ভক্তমালা" হইবে।

পৃঃ ৭১ ৪০ বৎসর হইবে।

পৃঃ ৮৩ বাদ্যযন্ত্রের সহিত "এস্রাজ" যুক্ত করিতে হইবে।

পৃঃ ৯১ Kagawa স্থলে Yanghee হইবে।

পৃঃ ১২২ "বুদ্ধচরিত"(১৮৯৪-৯৫),"Controversy"(১৮৮২-৯১ খৃঃ), ৩০শে নবেম্বর ১৮৪৭ জন্ম, ২৯শে মে ১৮৯৫ খৃঃ মৃত্যু।

পৃঃ ১২৪ ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা হইবে।

পৃঃ ১৩৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ হইবে।

পৃঃ ১৫৫ "Indian Mirror" পত্রিকা August 31, 1879 "Light of Asia" বইটীর সমালোচনা করেন।

পৃঃ ১৭১ "বৌদ্ধধর্ম্ম" (১৮৯৯) হইবে।

পৃঃ ১৮৮ জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী। মেট্রোপলিটন্ ইনষ্টিটুসান হইতে ১৮৭৯ খৃঃ এণ্ট্রাস পরীক্ষা দেন এবং ১৮৮৩ খৃঃ জেনারেল এসেম্ব্রীজ্‌ হইতে দর্শনশাস্ত্রে বি এ পরীক্ষা পাশ করেন।

পৃঃ ১৯৩ রমেশচন্দ্র দত্ত, মহারাণী সুচারু দেবী, সরলা রায়, সরলা দেবীচৌধুরাণীর সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

পৃঃ ২১২ ১৬। স্থলে ১৭। হইবে।

পৃঃ ২৬৬ "ধর্ম্মতত্ত্ব" ১লা ও ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৬৪ সনে জীবনীটি প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ২৬৭ Olcott হইবে।

পৃঃ ২৭৩ Dr. Bhimrao Ramjee Ambedkar হইবে।

পৃঃ ২৭৭ Yun Shan হইবে।

পৃঃ ২৮৫ Navavidhan, November 25, 1937 হইবে।

পৃঃ ২৮৭, ২৮৮ Thompson হইবে।

পৃঃ ২৮৮ চিঠিটি Navavidhan, Feby., 16, 1939 প্রকাশিত হয়।

পৃঃ ৩০০ ১৯০৬—২৪ খৃঃ হইবে।

পৃঃ ৩১৬ Temperance Federation ও প্যারীচরণ সরকারের নাম যুক্ত হইবে।

পৃঃ ৩৪৯ লালমোহন ঘোষ সফল হননি। দাদাভাই নৌরজী Central Finsbury হইতে ১৮৯২-৯৫ M.P. নির্ব্বাচিত হন।

আর্টপ্লেট

সমন্বয়-মার্গ

সমন্বয় আজ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় এক শতাব্দী হ'ল, আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন সমন্বয়ের কথা প্রকাশ করেন তখন অধিকাংশ লোকই সমন্বয়কে তাঁর ভাবুকতা মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অদম্য উৎসাহে অল্পসময়ের ভিতরেই জীবনের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়-মার্গের অন্তর্নিহিত প্রবল নৈতিকশক্তি প্রমাণিত হয়—সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, পুরুষ ও নারী, শাসক ও শাসিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান, নীতি ও শিক্ষা, রাষ্ট্র ও সেবা, পুরাতন ও আধুনিকতার সমন্বয়ে অপূর্ব্ব প্রগতি ও শান্তি দেখা দেয়। এ কথা অনেকেই জানেন।

সমন্বয়ের আরেকটি দিক—ধর্ম্মে-ধর্ম্মে সমন্বয়। ব্রহ্মানন্দ এই বিষয়ে বহু উপদেশ দেন। তার ভিতর একটীর *অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল—

"সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা, মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা, মুষা, শাক্য, গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর, এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি

---

* ১লা বৈশাখ ১৮০৫ শক (১৮৮৩ খৃঃ)—''প্রেরিতদিগের প্রতি সেবকের নিবেদন"

এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিত দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে!"

আচার্য্য কেশবচন্দ্র পূর্ণধর্ম্ম লাভের উদ্দেশে যে সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করেন তার ইতিহাস সকলের জানা নেই। এই জন্য তিনি নূতন ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী, নবযোগ সাধনা এবং আরও দুটি নূতন পথ দেখিয়েছিলেন—তার একটি "সমন্বয়-অধ্যয়ন", অন্যটি "সাধু-সমাগম"।

জীবন দিয়ে জীবনের অধ্যয়ন "সমন্বয়-অধ্যয়নের" মূল-কথা। এই অধ্যয়ন তুলনামূলক বা Comparative Study নয়; যেখানে সকল শাস্ত্রের মিল হ'য়েছে সেই মীমাংসাস্থলে উপস্থিত হওয়াই এর লক্ষ্য। "Objects of the New Dispensation" প্রবন্ধে (৩৩১ পৃঃ) আচার্য্য কেশবচন্দ্র "সমন্বয়-অধ্যয়নের" বিশদ বর্ণনা করেছেন। সেই ভাবে হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, ইস্‌লাম—এই চার প্রধান ধর্ম্মের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এক এক জন অধ্যেতার উপর এক একটি অধ্যয়নের ভার দেন। অধ্যেতারা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, অধ্যাত্ম-দৃষ্টির আলোকে বিভিন্ন ধর্ম্মের সাহিত্য ও ইতিহাস মন্থন করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নূতন চিন্তা, নূতন দর্শন, নূতন ব্যবহারের তরঙ্গ উঠে চতুর্দ্দিকে নবতরঙ্গের সৃষ্টি করে। জীবন ছিল তাঁর সমন্বয়ের ক্ষেত্র। সমন্বয়-অধ্যয়নের ফল জীবনের ভাষায় লিখিত হতে থাকে। শাস্ত্রের নীরস বর্ণমালা জীবন্ত আকার ধারণ করে। বহুশতাব্দীর বিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-বিধানগুলির অনির্ব্বাণ প্রাণধারা মিলিত হ'য়ে জীবনে নবপ্রবাহের সৃষ্টি করে। দেশ-বিদেশে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তার পরিচয় দিতে থাকে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ভাষায় সেই

হ'ল "নবশিশুর জন্ম"। তখন তিনি সমন্বয়-মার্গের পরীক্ষিত সত্যকে "নববিধান" নামে ঘোষণা করলেন। বিধাতার ইচ্ছা ও বিধাতার বিবিধ বিধান দিব্য প্রেরণায় অবতীর্ণ হয়ে, ব্যক্তিত্বের আকারে প্রস্ফুটিত হওয়াতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। এই কথাই তিনি "জীবন-বেদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—এই তাঁর জীবন-দর্শন।

"সমন্বয়-অধ্যয়নে"র ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করে যে অধ্যয়ন হয় এবং তার প্রভাব যে ধারার সৃষ্টি করে এই বইটি তারই ইতিহাস—সমন্বয়-মার্গের ইতিহাসের একখণ্ড মাত্র। অন্য খণ্ডগুলি সময়ে রচিত হবে আশা করি।

বইটি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচয়; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিদেশ অভিযানের কথা; তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমন্বয়-সাধনার পরিলেখ; চতুর্থ অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয়-অধ্যয়নের বিস্তৃত ইতিহাস ৩৫০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনার স্রোত বহুমুখী। তাকে সীমাবদ্ধ না ক'রে, অপ্রাসঙ্গিক বোধ হলেও ইতিহাসের বাস্তবিকতার জন্য, সমগ্রভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও মূল অধ্যেতার অধ্যয়ন এবং সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সময়ের মানুষদের ভিতর একুশ জনের বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে অধ্যয়ন, রচনা ও তাঁদের জীবনে সমন্বয়-অধ্যয়নের প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চারটি নূতন প্রতিষ্ঠানের কথাও বর্ণিত হয়েছে— (১) ধর্ম্মপাল ও "মহাবোধি সোসাইটী", "বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা"; (২) রবীন্দ্রনাথ ও "বিশ্বভারতী"; (৩) আশুতোষ ও "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"; (৪) গান্ধী ও "স্বাধীনভারত"। যে সকল মহামানবের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠান-গুলি গঠিত হয়েছিল, তাঁদের জীবন ও চিন্তার ভিতরের কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সঙ্গে বহু ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ও বহু ব্যক্তির জীবন ও চিন্তার কথা এসে

পড়েছে। অল্প সময়ের ভিতর জীবনের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়-মার্গ কি গভীর অনুপ্রাণনার সঞ্চার করেছিল দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। ঘটনার ও তারিখের সঙ্গে নানাবিধ সাধন ও মনস্তত্ত্বের কথা. বৌদ্ধদের বৈরাগ্য. ধ্যান, নির্ব্বাণ, জীবে দয়া, মধ্যপথ, প্রতিমাপূজা বর্ত্তমানের জীবনে যে নূতন আকারে উপস্থিত হয়েছে—নূতন সমবেত ব্রহ্মোপাসনা, প্রার্থনা, যোগ, ধ্যান, ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীদরবার, "শ্লোকসংগ্রহ", সঙ্কলন, অনুবাদ, নূতন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নাট্য-কলা-স্থাপত্যের ও কাব্য-দর্শন-সাহিত্যের নূতন অভিব্যক্তি, শিক্ষা-নীতি, নীতিশিক্ষা ও নারীশিক্ষার নূতন পদ্ধতি, নবসংহিতা, নবজাতীয়তা, সংবাদপত্র, বাগ্মিতা, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন, দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, প্রচার প্রভৃতি বহু বিষয় স্থান লাভ করেছে। এ সমস্তই ঐতিহাসিক ঘটনা। পঞ্চম অধ্যায়ে "কয়েকটি সাক্ষ্য" দিয়ে বইটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

যে সকল তথ্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তক-পুস্তিকা সংবাদপত্রের সাহায্যে পাওয়া গিয়েছে, সে জন্য আমি কলিকাতার "National Library", ও "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" গ্রন্থাগারের দ্বারা উপকৃত। উপরন্তু গত একত্রিশবৎসর নববিধান-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত থেকে দেশ বিদেশের সাধক, দার্শনিক ও সুধীবৃন্দের সঙ্গলাভের ও মতামত জানার যে সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছি তার কথা বলাই বাহুল্য।

সমন্বয় মার্গের ইতিহাসে বিগতশতাব্দীর বহু পুরুষ ও নারী চরিত্রেব নূতন পরিচয় এবং জাতীয় জীবনের পরিণতি ও অখণ্ড মানবপরিবারের নূতন সন্ধান পাওয়া যাবে আশা করি।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকাশ ও গতি

ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ ঘুরে ফিরে নবযুগের অভ্যুদয়ে আবার হিন্দুস্থানে প্রকাশিত হয়েছেন। অশোক-স্তম্ভের 'ধর্ম্মচক্র' ও 'সিংহমূর্ত্তি'কে রাষ্ট্রের প্রতীকরূপে গ্রহণ, বৌদ্ধ অর্হৎদের পূতাস্থি ও বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার ব্যবস্থা, বৌদ্ধতীর্থ সংস্কার, বৌদ্ধজাতিদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন, বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বুদ্ধজয়ন্তীর আয়োজনে দেশবাসী স্বাগতম্ জানিয়েছে।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত যে ধর্ম্মের আলোক ভারতবর্ষের জীবনকে বারশত বৎসর আলোকিত করে রেখেছিল, আবার বহু বৎসর অদৃশ্য হয়ে ছিল, সেই ধর্ম্মের সঙ্গে এখন আমাদের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? ঐ ধর্ম্মের কি আমাদের ভিতর ফিরে আসা সম্ভব? এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার উত্তর দেবার সময় এসেছে। আরো তিনটী ঐতিহাসিক ধর্ম্মও আমাদের উত্তরের অপেক্ষা করছে—ইহুদি ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম। এশিয়ায় জন্ম হলেও, এই ধর্ম্ম কয়টী আমাদের কাছে বিজাতীয় বলে গণ্য। অথচ বর্ত্তমানে নূতন পরিস্থিতিতে কাহাকেও বিজাতীয় বলে দূরে রাখা যায় না। এখন যে প্রশ্ন উঠেছে, তার উত্তর কে দেবে? কবির কথায় বলি—

"কথা কও কথা কও!
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও।
কথা কেন নাহি কও?"

নূতন পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে পরিচয় এবং আত্মীয়তা আবশ্যক। পরস্পরের ধর্ম্ম ও চিন্তার সঙ্গে হয় বোঝাপড়া করতে হয়, নয়তো ধর্ম্ম ও চিন্তাকেই বিদায় করে দিতে হয়। তাও কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তবে দেখা দরকার যে, ধর্ম্ম ও চিন্তার ভিতর একটা পূর্ব্বাপর

যোগ আছে কি না ? তাদের বহিঃরূপের পার্থক্যকে অতিক্রম করে কোন নিয়ম রয়েছে কি না, যার উপর তারা ছান্দোবদ্ধ ও সমন্বিত হতে পারে ? বিজ্ঞান দূরত্বের প্রশ্নকে সহজ করে ফেলায় মানুষে মানুষে সংস্পর্শ, সংঘর্ষ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া দুরন্তগতিতে বেড়ে চলেছে—জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির মীমাংসার জন্যই ১৯৩০ খৃঃ মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংসানীতি' এবং ১৯৫৫ খৃঃ পণ্ডিত জওহর লালের 'পঞ্চশীল' ; এবং সমগ্রজীবনে নব-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ১৮৮০ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করলেন। এই 'নববিধানের' অভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরাবিষ্কারের সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এই প্রবন্ধে সেই ইঙ্গিত ধরেই অগ্রসর হব।

বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষে তিনটী প্রধান ভাষার ব্যবহার দেখা যায়—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদের ভাষা, প্রাকৃত ছিল উত্তরভারতের কথ্য ভাষা, আর পালি ছিল মগধ থেকে উড়িষ্যার কপদগিরি পর্য্যন্ত কথ্য ভাষা। কথ্য ভাষাতেই বুদ্ধদেব মুখে মুখে 'ধর্ম্ম' শিক্ষা দেন। তাঁর লিখিত কোন গ্রন্থের কথা জানা যায়নি। বৌদ্ধাচার্য্যেরা তাঁর দেহান্তের পর, সভা আহ্বান করে, সকলের কাছ থেকে শুনে, তাঁর বাণীগুলি সঙ্কলন করেন। প্রথম সভাটী বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরেই আহূত হয়, সম্রাট অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজগৃহের নিকটস্থ বৈভার পর্ব্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়। আরো একশত বৎসর পরে কালাশোকের সময় বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয় সভা এবং তারও একশত বৎসর পরে প্রিয়দর্শী অশোকের আহ্বানে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সভার অধিবেশন হয়েছিল, চতুর্থ বা শেষ সভা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৭৮ সনে কাশ্মীর-রাজ কণিষ্কের সময়। আরও দুটী সভার কথা পাওয়া যায় ; খৃঃ পূঃ ২৯-১৩ সনে একবার সিংহলে এবং ১৮৭১ খৃঃ রাজা মিণ্ডনমিনের রাজ্যকালে ম্যাণ্ডালেতে। বৌদ্ধগ্রন্থগুলি অধিকাংশই পালি ও প্রাকৃতে লিখিত হয়েছিল। মিশ্রিত ভাষায়ও অনেক গাথা রচিত হয়। বুদ্ধদেব নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁর প্রথম কয়জন শিষ্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কাজেই প্রথম থেকেই সংস্কৃত ভাষাতেও যে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়েছিল, একথা অনুমান করা যায়। মহাযান সম্প্রদায়ের সব গ্রন্থই সংস্কৃতে। নেপালের বৌদ্ধেরা সংস্কৃতভাষায় চুরাশিহাজার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেছেন।* চুরাশিহাজার কথাটী বহুত্ব-সূচক হতে পারে—যেমন সম্রাট অশোকের শিলালিপির সংখ্যাকে বহু অর্থে চুরাশিহাজার বলা হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের যে সকল তন্ত্র বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন, তার ভাষা প্রাচীন বাংলার মতন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়। সেইজন্যই বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম জনসাধারণের বোধগম্য হয়েছিল এবং অতি সাধারণ মানুষের মন ও জীবনকে স্পর্শ এবং রূপান্তরিত করেছিল।

এই বৌদ্ধধর্ম্ম কি? বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্যই বা কি? সংক্ষেপে বলতে হয়, 'বোধিসত্ব' অবস্থা লাভ এবং সম্ভব হলে 'বুদ্ধত্ব' লাভ। তার পথ কি, অর্থই বা কি? 'ধর্ম্ম' তার পথ। 'ধর্ম্মের' অর্থ করা হয়েছে 'স্বভাব' বা 'নিয়ম'। এর প্রবাহ চলেইছে। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন যে, মানুষ ও 'স্বভাবের' মাঝখানে অজ্ঞানতা ব্যবধান স্বরূপ হয়ে রয়েছে; তার জন্যই সব দুঃখময়। আর মানুষের ভিতরে পুরুষকার ব'লে একটী বস্তু আছে, তার সাহায্যে ঐ ব্যবধানটীকে সরাতে হবে। তাহলেই ঐ দুঃখের নিবৃত্তি। শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর প্রভৃতি দ্বারা কিছুই হয় না। আত্মপুরুষকারই একমাত্র সহায়তা করতে পারে। আত্মপুরুষকার সহকারে 'ধ্যান' ও 'শীল' অভ্যাস করলে তবে 'ধর্ম্মকে' আয়ত্ত করা যায়।

বুদ্ধদেব বলেছেন—"নত্থি ঝানং অপ্‌ঞ্‌ঞস্‌স পঞ্‌ঞা নত্থি অঝায়তো। যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞং চ স বে নিব্বান সন্তিকে।" অর্থাৎ "প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান যাহার নাই, তাহার ধ্যানও নাই। ধ্যান যাহার নাই, তাহার প্রজ্ঞাও নাই। ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যাহার আছে, সে নির্ব্বাণের নিকটেই আছে।"

* 'The Sanskrit Buddhist Literature of Bengal' by Dr Rajendra Lal Mitra (1882)

যোগ আছে কি না ? তাদের বহিঃরূপের পার্থক্যকে অতিক্রম করে কোন নিয়ম রয়েছে কি না, যার উপর তারা ছান্দোবদ্ধ ও সমন্বিত হতে পারে ? বিজ্ঞান দূরত্বের প্রশ্নকে সহজ করে ফেলায় মানুষে মানুষে সংস্পর্শ, সংঘর্ষ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া দুরন্তগতিতে বেড়ে চলেছে—জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতির মীমাংসার জন্যই ১৯৩০ খৃঃ মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংসানীতি' এবং ১৯৫৫ খৃঃ পণ্ডিত জওহর লালের 'পঞ্চশীল' ; এবং সমগ্রজীবনে নব-পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ১৮৮০ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ঘোষণা করলেন। এই 'নববিধানের' অভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরাবিষ্কারের সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এই প্রবন্ধে সেই ইঙ্গিত ধরেই অগ্রসর হব।

বুদ্ধদেবের সময় ভারতবর্ষে তিনটী প্রধান ভাষার ব্যবহার দেখা যায়—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। সংস্কৃত ছিল পণ্ডিতদের ভাষা, প্রাকৃত ছিল উত্তরভারতের কথ্য ভাষা, আর পালি ছিল মগধ থেকে উড়িষ্যার কপদগিরি পর্য্যন্ত কথ্য ভাষা। কথ্য ভাষাতেই বুদ্ধদেব মুখে মুখে 'ধর্ম্ম' শিক্ষা দেন। তাঁর লিখিত কোন গ্রন্থের কথা জানা যায়নি। বৌদ্ধাচার্য্যেরা তাঁর দেহান্তের পর, সভা আহ্বান করে, সকলের কাছ থেকে শুনে, তাঁর বাণীগুলি সঙ্কলন করেন। প্রথম সভাটী বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরেই আহূত হয়, সম্রাট অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায়, রাজগৃহের নিকটস্থ বৈভার পর্ব্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়। আরো একশত বৎসর পরে কালাশোকের সময় বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয় সভা এবং তারও একশত বৎসর পরে প্রিয়দর্শী অশোকের আহ্বানে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সভার অধিবেশন হয়েছিল, চতুর্থ বা শেষ সভা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৭৮ সনে কাশ্মীর-রাজ কণিষ্কের সময়। আরও দুটী সভার কথা পাওয়া যায় ; খৃঃ পূঃ ২৯-১৩ সনে একবার সিংহলে এবং ১৮৭১ খৃঃ রাজা মিণ্ডনমিনের রাজ্যকালে ম্যাণ্ডালেতে। বৌদ্ধগ্রন্থগুলি অধিকাংশই পালি ও প্রাকৃতে লিখিত হঁয়েছিল। মিশ্রিত ভাষায়ও অনেক গাথা রচিত হয়। বুদ্ধদেব নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁর প্রথম কয়জন শিষ্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কাজেই প্রথম থেকেই সংস্কৃত ভাষাতেও যে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়েছিল, একথা অনুমান করা যায়। মহাযান সম্প্রদায়ের সব গ্রন্থই সংস্কৃতে। নেপালের বৌদ্ধেরা সংস্কৃতভাষায় চুরাশিহাজার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলেছেন।* চুরাশিহাজার কথাটী বহুত্ব-সূচক হতে পারে—যেমন সম্রাট অশোকের শিলালিপির সংখ্যাকে বহু অর্থে চুরাশিহাজার বলা হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের যে সকল তন্ত্র বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন, তার ভাষা প্রাচীন বাংলার মতন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হয়। সেইজন্যই বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম জনসাধারণের বোধগম্য হয়েছিল এবং অতি সাধারণ মানুষের মন ও জীবনকে স্পর্শ এবং রূপান্তরিত করেছিল।

এই বৌদ্ধধর্ম্ম কি? বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্যই বা কি? সংক্ষেপে বলতে হয়, 'বোধিসত্ব' অবস্থা লাভ এবং সম্ভব হলে 'বুদ্ধত্ব' লাভ। তার পথ কি, অর্থই বা কি? 'ধর্ম্ম' তার পথ। 'ধর্ম্মের' অর্থ করা হয়েছে 'স্বভাব' বা 'নিয়ম'। এর প্রবাহ চলেইছে। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন যে, মানুষ ও 'স্বভাবের' মাঝখানে অজ্ঞানতা ব্যবধান স্বরূপ হয়ে রয়েছে ; তার জন্যই সব দুঃখময়। আর মানুষের ভিতরে পুরুষকার ব'লে একটী বস্তু আছে, তার সাহায্যে ঐ ব্যবধানটীকে সরাতে হবে। তাহলেই ঐ দুঃখের নিবৃত্তি। শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর প্রভৃতি দ্বারা কিছুই হয় না। আত্মপুরুষকারই একমাত্র সহায়তা করতে পারে। আত্মপুরুষকার সহকারে 'ধ্যান' ও 'শীল' অভ্যাস করলে তবে 'ধর্ম্মকে' আয়ত্ত করা যায়।

বুদ্ধদেব বলেছেন—"নত্থি ঝানং অপ্‌ঞ্‌ঞস্‌স পঞ্‌ঞা নত্থি অঝায়তো। যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞং চ স বে নিব্বান সন্তিকে।" অর্থাৎ "প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান যাহার নাই, তাহার ধ্যানও নাই। ধ্যান যাহার নাই, তাহার প্রজ্ঞাও নাই। ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যাহার আছে, সে নির্ব্বাণের নিকটেই আছে।"

* 'The Sanskrit Buddhist Literature of Bengal' by Dr Rajendra Lal Mitra (1882)

'ধ্যান' দ্বারা 'ধর্ম্ম' মানুষের চিত্তে ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয় এবং 'শীল' দ্বারা জীবনকে ঐ ধর্ম্মনিয়মের অনুগত করা যায়। 'ধ্যান' ও 'শীলের' কাজ একসঙ্গে চলে। একটী আর একটীর পরিপোষক। চিত্তে ধর্ম্মের প্রকাশের একটী ক্রম আছে, যথা জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বোধি।

'ইন্দ্রিয় ভাবনা সূত্রে' বলা হয়েছে—

"ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ ইন্দ্রিয়-নিরোধ নয়, ইন্দ্রিয়-বিকাশ; অর্থাৎ তুচ্ছ পার্থিব বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে আবদ্ধ না রেখে, জ্ঞান বা সংজ্ঞার মধ্যে যে ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি-মূলক জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা উচ্চতর অনুভূতি, বোধি বা উচ্চতম সাক্ষাৎ উপলব্ধির স্তরে উপনীত হওয়ার চেষ্টা।"

দুঃখমুক্তির 'উপায়স্বরূপ' অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গ—'অরিয়ঞ্চ ঠ্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং'। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ ক্রিয়া, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি দ্বারা মানুষকে অজ্ঞানতা ও দুঃখ দূর করে 'আত্মজয়' বা নির্ব্বাণ বা বুদ্ধত্বে উপনীত হতে হবে। সমাধিব প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও শেষ ঝান বা ধ্যানের ভিতর দিয়া বুদ্ধ নির্ব্বাণ বা পবিত্র আনন্দময় অবস্থায় উপনীত হন। এই চতুর্থ ধ্যানেই নির্ব্বাণ বা পরি নির্ব্বাণ—"খীণাসবা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতা" অর্থাৎ মোহেব অন্ধতা হইতে মুক্ত হইয়া, যাহারা আত্মাতে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে, সংসারে তাহারাই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। আরো বলেছেন, "একাহং জীবিতং সেয্যো পস্সতো অমতং পদং" অর্থাৎ মৃত্যুর অতীত পদ দেখিয়া, একদিন জীবন ধারণ করাও শ্রেষ্ঠ। 'ধম্মপদে' বলা হয়েছে—

"যিনি আত্মজয় করেছেন, তাঁর সেই জয়কে পরাজয়ে পরিণত করা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব।"

এ সব কথা বলা হল কেন? তখন নূতন কি হয়? তখন "পরিনিব্বন্তি অনাসবা" অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রসূত তৃষ্ণা বা 'তণ্হা'

নষ্ট হয়ে যায়। ধ্যানী বুদ্ধ এই তণ্‌হা-শূন্য হয়েই বলেছিলেন—

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং
গহকারক! দিট্‌ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকুটং বিসঙ্‌খিতং
বিসঙ্‌খার গতং চিত্তং তণ্‌হানং খয় মজ্‌ঝগা॥"

"হে গৃহকার, তোমাকে আমি অনেক খুঁজিয়াছি, অনেক কষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি—তোমার দেখা পাই নাই। কিন্তু এইবার আমি তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। তৃষ্ণাই নির্ম্মাণ করে এই গৃহ (শোক-দুঃখময় দেহ); কিন্তু তৃষ্ণা আর এ ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারিবেনা। আমি এ ঘরের ভিত্তি ভগ্ন করিয়াছি—চিত্ত আমার এখন সংস্কারশূন্য। তৃষ্ণা আমার ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। (আর জন্ম হইবে না)।"

'মঝ্‌ঝিম নিকায়ে' বলেছেন—

"তখন আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হবেনা। আমরা মন্দবাক্য উচ্চারণ করবো না; আমরা সর্ব্বদাই ঈর্ষাশূন্য হয়ে করুণাকোমল, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান করবো; সম্পূর্ণরূপে অশুভবুদ্ধি ও হিংসা-বিরহিত হয়ে আমাদের আন্তরিক প্রীতির অসীম অনন্ত সর্ব্বব্যাপী প্রভায় সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে তুলবো।"

বৌদ্ধ সাধনার একটা 'না'-এর দিক ও একটা 'হাঁ'-এর দিক দেখতে পাওয়া যায়। 'তৃষ্ণার' ধ্বংস হ'ল 'না'-এর দিক এবং 'বোধি' হল তার 'হাঁ'-এর দিক। সমস্তই যদি আত্যন্তিক ভাবে মিথ্যা হয়, তবে তো সমস্তই স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়। তাও বুদ্ধের শিক্ষা নয়। সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটা সত্য-সম্বন্ধ স্থাপনই হল তাঁর শিক্ষা। কি উপায়ে তাহা সম্ভব? 'তৃষ্ণার' অপগমে সম্ভব। তৃষ্ণার দৃষ্টিতে যে দর্শন হয়, তৃষ্ণাক্ষয়ে তাহা থাকেনা, এই তাঁর শূন্য-বাদ। কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দময় ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম মানুষের কাছে ব্যবহারিক ভাবে সত্য থাকবেই। 'মায়াবাদ' তিনি প্রচার

করেন নি। তৃষ্ণার অপগমে, বোধির উদয়ে, চিত্তে যে ভাবের প্রকাশ হয়, সেই মৈত্রী এবং করুণার ভাবই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা এবং সত্য দৃষ্টি—তাহাই সত্য সম্বন্ধ। এ দৃষ্টি মায়াও নয়, মোহও নয়। আরম্ভে স্বাতন্ত্র্য ; পরিণতিতে উদার সহানুভূতি। বুদ্ধদেব আমাদের মতন সামান্য মানুষের জন্য পথটীকে সহজ করে সেই পথের নাম দেন 'মঝ্ঝিমা পটিপদা' বা মধ্যপথ। 'বৌদ্ধসূত্রে' বলা হয়েছে—

"এই পথ চরম ভোগ বিলাসের পথও নয়, চরম কৃচ্ছ্র-সাধনের পথও নয়। হে ভিক্ষুগণ, এই দুই চরম পথের মধ্যবর্ত্তী একটী তৃতীয় পথ আছে, যে পথে আসে প্রকৃত জ্ঞান, যে পথ নিয়ে যায় শান্তি, প্রজ্ঞা ও নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্যে।"

মধ্যপথ অবলম্বন করে চল্লে তৃষ্ণা তিরোহিত হয়, তৃষ্ণার অপগমে প্রজ্ঞার আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। তখন আমিত্ব বা স্বার্থবুদ্ধি চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখবোধ, বাসনা, হিংসা, দ্বেষ সব আপনা হতেই লোপ পায়। সেই স্থানে সবার সঙ্গে একত্ব ও মিলিত কল্যাণ-বোধের উদয় হয়। 'প্রজ্ঞাই' সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, ফলে তৃষ্ণা ধ্বংস হয় ও সঙ্গে সঙ্গে করুণার উদয় হয়। করুণা সত্যের পথে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে এবং নিত্য নূতন সৃষ্টি করায়। সত্য ও করুণার মিলন সকলকে-নিয়ে দুঃখ নিবৃত্তিব পথে—বোধির পথে যেতে চায়।

প্রাগ্‌বুদ্ধ ভারতে আর্য্য অনার্য্যের সংঘর্ষে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গড়ে উঠেছিল, তার কর্ম্মকাণ্ড ও বর্ণবিধি মানুষকে তৃপ্তি দেয়নি। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 'উপনিষদে' আরেকটী আদর্শ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ আদর্শ ভারতের চিন্তাধারাকে অধিকার করে। কিন্তু সেই আদর্শ ব্যবহারিক জীবনে গৃহীত হয়নি। আরো একশত বৎসর পরে জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম জীবনে ও ব্যবহারে তার প্রতিষ্ঠা করে। ঐ দুটী ধর্ম্মকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাহিরে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। জৈনধর্ম্ম কতক আপোষ করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ অবৈদিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের জীবনধারার ভিতর দিয়ে তখন যে আদর্শ জন্মাচ্ছিল, সেই আদর্শ হল একদিকে

আভ্যন্তরিক মুক্তি এবং অন্য দিকে পুরুষকার ও দুঃখবরণের ভিতর হ'তে পাওয়া মৈত্রী ও শান্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম এই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করে এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি॥

যাঁরা এই মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের বাহিরে বর্ণাশ্রমের বা অনুরূপ মত ও বিশ্বাসের আবরণ থাকলেও তাঁরা বৌদ্ধ-সংঘে গৃহীত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন যে, 'তুমি আমি' স্বার্থের যে ভেদ, তা মিথ্যা; অজ্ঞানতা এবং তৃষ্ণা থেকেই তার জন্ম; মানবের অখণ্ডত্বই সত্য এবং সেইটাই প্রকৃত 'সংঘ'। যখন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তখন তিনি একা, 'মনের মানুষ, পথের পথিক' কেউ ছিল না; তবু তিনি সকল মানুষের সঙ্গে একত্ব উপলব্ধি করলেন। কি করে তা সম্ভব হল? আমিত্ব-শূন্য, দুঃখমুক্ত এক পরিশুদ্ধ করুণাময় সত্তায় নিজে এবং সকলে, এই জ্ঞানেই তা' প্রত্যক্ষ করেছিলেন—এই তাঁর সংঘ। এই অদৃশ্য সংঘের মত সত্য বস্তু আর কিছু নেই। যুগে যুগে সকল মহাপুরুষই এর প্রত্যক্ষ করে গেছেন—বৈকুণ্ঠ, Kingdom of Heaven, বেহস্ত, ঐ অদৃশ্য সংঘেরই নামান্তর।

'ললিত বিস্তরে' এই উপলব্ধির কথা বলা হল—

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশ বিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষন্তো ন চ বুদ্ধ গুণক্ষয়ঃ॥"

অদৃশ্য সংঘ যখন প্রকাশিত হল, তখনই বাইরের সংঘ রূপগ্রহণ করলো। এ 'অদ্বৈতবাদ' নয়। এ হ'ল তুমি-আমি-স্বার্থ-শূন্য, দুঃখ-জ্বালা-মুক্ত, অজ্ঞানতা-পরিশূন্য, জ্ঞানপূর্ণ, বিপুল আনন্দময় এক নূতন জগৎ। এই 'সংঘই' বৌদ্ধবিধানের নূতনত্ব। বুদ্ধের ধর্ম্ম-পথের পথিক, বুদ্ধ-অনুগামী, তৃষ্ণাজয়ী ভিক্ষুর দল তার বাহ্য প্রকাশ মাত্র।

ভারতবর্ষে তার আগে ছিল অদ্বৈত পারমার্থিক সাধনা, আত্মায় পরমাত্মায় যোগ ও যোগের ভিতর বিলীনতা সাধন। জগৎ মায়াময় কিন্তু যতদিন এর ভিতর বাস, ততদিন আপনাকে রক্ষা করতে হবে বলে, বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাকে এবং কর্ম্মফলের

অকাট্য যুক্তিকে তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বৌদ্ধবিধানে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেএক নূতনত্ব দেখা গেল। সকল মতবাদ উপেক্ষা করে, জীবাত্মায় জীবাত্মায় যোগ ; সংস্কারবদ্ধ ক্ষুদ্র আমির বিসর্জ্জন, সবার কল্যাণে ব্যস্ত, নূতন আমির আবির্ভাব। এই করুণা তার কার্য্য-প্রেরণা (motive force); কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনাব ক্ষেত্রে এক পিতার সন্তান হয়ে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, জীবনের সঙ্গে জীবনের মিলনে পিতার রাজ্য কেমন করে গড়তে হয়—পিতার ইচ্ছা ও স্বরূপ কেমন করে পবিত্রাত্মারূপে সন্তানকে অধিকার করে, এ শিক্ষা তার ভিতর দেখা যায় না। সে উপলব্ধি হল খৃষ্ট-বিধানের। পরস্পরের বক্ত মাংস ভোজন, 'I and my Father are one, I abide in my brother' প্রভৃতির ভিতর স্বর্গরাজ্য রচনার আর এক ইঙ্গিত নিহিত ছিল। সেই বিধানের সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায় ভিক্ষুরাজ দেশ দেশান্তবে ঘুরে আজ 'নববিধানে' এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৌদ্ধ-বিধান নয়, ইহুদি-বিধান, খৃষ্ট-বিধান ও ইস্‌লাম্-বিধান আমাদের নিকটে এগিয়ে এসেছে। নববিধানে Church Universal আত্মপ্রকাশ করেছে—

"Which is the deposit of all ancient wisdom and the receptacle of all modern science, which recognises in all prophets and saints a harmony, in all scriptures a unity and through all dispensations a continuity"—*New Samhita*

এই Church Universalই অনাগত স্বর্গরাজ্যের অগ্রদূত—"The invisible kingdom of God in which is all truth. all love, all holiness"— *New Samhita*

সে কেমন জগৎ? সেখানে কেবলই সত্য, কেবলই প্রেম, কেবলই পুণ্য ; অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান সেখানে বিরাজ করছেন। সেখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, জীবনের সঙ্গে জীবনের, জাতির সঙ্গে জাতির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সংযোগে কেবলই

সত্য, প্রেম ও পুণ্য ফুটে বের হয়। এই নববিধানের নূতন মণ্ডলী, নবসংঘ। যুগযুগের সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও আঘাতের বেদনার ভিতর দিয়েই নূতনের—নব নব বিধানের জন্ম—এবং তার ভিতরেই সকল বিধানের পুনঃআবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

ব্রাহ্মণেরা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা ব্যাহত দেখে বৌদ্ধদের আক্রমণ করলেন—নূতন ব্যবস্থার প্রচলন করলেন। পশ্চিম ভারতে শ্রীকৃষ্ণের এবং মধ্যভারতে শিবের পূজা আরম্ভ হল। দুজনেই নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার, বৈরাগ্যের দেবতা। দুইই শ্রীবুদ্ধের ছবি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"আত্মনো গুরুরাত্মৈব"; শিবও তাই বলেন। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে', পাশুপত-দর্শনে ও শৈবদর্শনে তার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদর্শন পরবর্ত্তী কালের। ব্রাহ্মণেরা 'উপনিষদ' পরিত্যাগ করে 'মহাভারত', 'পুরাণ' প্রভৃতি 'ধম্মপদ' 'জাতক' 'ললিতবিস্তর' জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করলেন। বৌদ্ধ-ত্রিমূর্ত্তির স্থানে বসালেন কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা। হরপ্পার ঐতিহাসিক রেলিক্‌সে দেখা যায়, প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক ভারতীয়েরা মাতৃমূর্ত্তি, পশুপতিমূর্ত্তি, পিপ্পল-বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা করতেন; আর্য্যেরা কিন্তু এই সব তখন সমর্থন করতেন না। এখন সেই পথ ধরলেন এবং বৌদ্ধদের সময়ে প্রচলিত তত্ত্ব, পূজা ও জীবনপদ্ধতিকে নিজেদের মতন করে নিলেন; কিন্তু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যেমন ছিল, তেমনি রইলো। জীবন ও ধর্ম্ম আবার পৃথক হয়ে গেল।

বৌদ্ধেরা বারশত বৎসর জীবন্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্রাট অশোকের 'ধর্ম্মাভিযান' ঐ নূতন সভ্যতাকে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিল। অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে, সত্যের প্রভাবে অন্যান্য দেশ জয় করা, বৌদ্ধধর্ম্মেই প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল। ঐ সকল জনপদের অধিবাসীরা তাতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে এসে বৌদ্ধাচার্য্যদের কাছে সাক্ষাৎ ভাবে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর পরিচয় গ্রহণ করলেন। অশোকের মৃত্যুর পরে এসেছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাট মিনাণ্ডার। তিনি মহাস্থবির নাগসেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সে কি কম গৌরবের কথা? 'মিলিন্দ পঞহো' গ্রন্থে তার বিবরণ পাওয়া যায়। আরো কয়েক-

জনের কথা জানা যায়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক চিটেওয়ান্, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান্ ও তাঁর চারজন সহযোগী শ্রমণ, ষষ্ঠ শতাব্দীতে হোই সেঙ্গ ও সঙ্গচূন্, সপ্তম শতাব্দীতে হিউএন্থসং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায়—আরো কত ভক্ত এসেছিলেন, বলা কঠিন। বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর, তুষারাকীর্ণ দুস্তর পথ, অন্ধকার গিরিসঙ্কট, পার্ব্বত্য জনপদ অতিক্রম করে তাঁদের আসতে হয়েছিল। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটী বার বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, সাধনার ক্ষেত্র ও সংঘের পবিত্র স্পর্শ লাভ করা। তখন তক্ষশীলা, কপিলাবস্তু, বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী, নালন্দা বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। মথুরা, উজ্জয়িনী, কাশ্মীর প্রভৃতি সহর বৌদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। এই সকল কেন্দ্র থেকে বৌদ্ধসাধনা ও সভ্যতা দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব কি অপরিসীম ছিল, তা Saunders এর 'The Story of Buddhism in India' বইটীতে পাওয়া যায়—

"The history of Ceylon and Burma, as of Siam, Japan and Tibet may be said to begin with the entrance into them of Buddhism"

সম্রাট অশোকের ধর্ম্মাভিযান আরম্ভ হলে বৌদ্ধ-শ্রমণেরা দক্ষিণাভিমুখে গমন করে সিংহলে পৌঁছালেন খৃঃ পূঃ ২৭৩ সনে; সেখান থেকে যান ব্রহ্মদেশে; ৬৩৯ খৃঃ শ্যামদেশবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম আলিঙ্গন করলেন; তার আগেই যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করেছিল। আর উত্তরে কাশ্মীর-রাজ কনিষ্কের উদ্যমে খৃঃ পূঃ ৭৮ সালে চীন, মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হয়েছিল। ৩৩২ খৃঃ কোরিয়াবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন; ৫৫২ খৃঃ জাপানে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করলো।

এইরূপে দক্ষিণেঃ—সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোজ, অনাম এবং উত্তরেঃ—পারস্য, কাবুল, গান্ধার, কাশ্মীর, নেপাল, ভোটান, সিকিম, আসাম, তিব্বত, চীন, তুর্কী, মঙ্গোলিয়া, রুশিয়া, সাইবেরিয়া, কোরিয়া,

লিউকেন দ্বীপ, জাপান, ল্যাপল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হল।

এই সকল দেশের ভাবে এবং ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠলো। অনুবাদ, শব্দানুবাদ, সঙ্কলন সবই হল। সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম, কম্বোজে পালিভাষায়; নেপাল ও তুর্কীস্থানে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আধুনিক গবেষণার ফলে তিব্বতী, চীনা, মঙ্গোলীয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

আচার বিচার ও গঠন তারতম্যে বৌদ্ধেরা ১৮টী শাখায় বিভক্ত হয়েছিলেন—

১। থেরবাদ ২। মহাসঙ্গীতি ৩। গোকুলিক
৪। একব্যবহারিক ৫। প্রজ্ঞাপ্তি ৬। রাহুলিক
৭। চৈতীয় ৮। সর্ব্বাস্তিবাদ ৯। ধর্ম্মগুপ্তিক
১০। কাশ্যপিয় ১১। সনকান্তিক ১২। সূত্র ১৩। হৈমবত
১৪। রাজগিরয় ১৫। সিদ্ধান্তিক ১৬। পূর্ব্বশেলীয়
১৭। অপরশেলীয় ১৮। মহীশাসক।

উপলব্ধি-ভেদে বৌদ্ধদের ভিতর চারটী ভাগ দেখা যায়—

১। মাধ্যমিক ২। যোগাচার ৩। সৌত্রান্তিক
৪। বৈভাষিক।

মাধ্যমিক মতে—কোন পদার্থই বাস্তবিক বিদ্যমান নাই।
সব শূন্যময়। (সর্ব্বশূন্যত্ব)

যোগাচার মতে—অন্তরস্থ বিজ্ঞান স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু অন্য কোন পদার্থ বাস্তবিক বিদ্যমান নাই। বিজ্ঞানকেও দুইভাগে ভাগ করেছেন—প্রকৃতি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান। একটী জাগ্রত অবস্থার এবং অন্যটী স্বপ্নাবস্থার বিজ্ঞান। (বাহ্যশূন্যত্ব)

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে—বাহ্য ও অন্তরস্থ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, কিন্তু বলেন যে সমস্ত কিছু পরমাণুর সমষ্টি। সৌত্রান্তিক মতে—ইহা অনুমানসিদ্ধ; বৈভাষিক মতে—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

কিন্তু উভয় মতই বলেন যে, যখন যে বস্তুর
প্রত্যক্ষ হয়, তখন মাত্র তার অস্তিত্ব।
(বাহ্যার্থ অনুমেয়ত্ব)—(বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষত্ব)

প্রথম মত দুটী মহাযান সম্প্রদায়ের এবং শেষ দুটী হীনযান সম্প্রদায়ের ভিতর দেখা যায়। মহাযান সম্প্রদায় লক্ষ্য করে চলেছিলেন যে কেউ যেন বাদ না যায়। তাঁরা বিনয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন নি। তাঁরা মানুষকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। সবার উপরে বুদ্ধ, মাঝখানে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্বগণ, সব নীচে সাধারণ মানুষ। বোধিসত্বদের কৃপাদৃষ্টি মধ্যবর্ত্তী হয়ে মানুষকে উপরে তুলবে। তাই তাঁদের পূজা অর্চনা নিবেদন করার ব্যবস্থা দেখা যায়। হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা নিজের নিজের উপলব্ধির দিকেই লক্ষ্য রেখে ছিলেন এবং বিনয় ব্যবহার ও সাধনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাই এঁদের ভিতর ধ্যান ও স্বাধ্যায়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। মহাযানকে বলা যায় ভাবের বা হৃদয়ের দিক এবং হীনযানকে বলা যায় তত্ত্ব ও সাধনের দিক।

দেখা যায়, বৌদ্ধ সাধনা এবং সভ্যতা বারশত বৎসর একভাবে, তেজের সঙ্গে, ভারতবাসীর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর এমন সব ঘটনা ঘটলো, যে বৌদ্ধ জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিল; তখনকার বৌদ্ধেরা দাঁড়িয়ে ছিলেন নিরীশ্বর-বাদী, বেদ-ব্রাহ্মণ-বিরোধী, বর্ণাশ্রম-বিরোধী, দেব-প্রসাদ-পরাঙ্মুখ, অনাদি কর্ম্ম ও পুরুষকারে বিশ্বাসী। সিথিয়ানদের বা শক, পহ্লব, কুষাণ, হুনদের সংস্পর্শে আসার ফলে (৮০০ খৃঃ) তন্ত্রমন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হল, তাঁরাও প্রভাবান্বিত হলেন। ক্রমে ধর্ম্ম, পুরুষকার, প্রজ্ঞা ও করুণা ঢাকা পড়ে গেল; নাস্তিকতা, হৃদয়-হীনতা, শুষ্কতা ও বাহ্য আড়ম্বরের প্রাধান্য হল। বৌদ্ধদের প্রভাবে ভাঙ্গন ধরলো, নূতনের প্রয়োজন দেখা দিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজ মাথা তোলবার সুযোগ পেলেন। মূলে বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক্যবাদ কিনা, সেকথা চিন্তা করে না দেখেই তাঁদের তখনকার চাল চলনের নজির দেখিয়ে নাস্তিক্য-দোষে দোষী করা

হল। আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্য-বাদের যুদ্ধে নাস্তিক্য-বাদ পরাজিত হল। ১১০০খৃঃ দক্ষিণ ভারতে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক বসবের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের জন্ম হল; ইতিপূর্বে উত্তর ও মধ্যভারতে শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। নূতন আস্তিক্যবাদের স্রোত প্রবাহিত হল। দেবদেবীর পূজার স্রোত বইলো, মানুষ সেই স্রোতে—গা ভাসিয়ে দিল। এই হল একটী চিত্র। আরেকটী চিত্র দেখা যায় ঐ সময়ে, মহাপুরুষ মহম্মদের অনুগামী মোসলমানদের ভারতে আগমন। তাঁরা ১০০০ খৃঃ ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, ভারতের ধন দৌলতই তাঁদের প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন হল অপূর্ব অবদান। একেশ্বরবাদী মোসলমান নাস্তিকতাও বরদাস্ত করেন না, বহু দেবদেবীর পূজাও সহ্য করেন না। এবং সকলে সেই এক রাজার প্রজা, এই সাম্যবাদ তাঁদের রক্তে মাংসে, সেখানে উচ্চ নীচ, সম্রাট ফকির, ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মতামতের অনমনীয়তা এবং বিরুদ্ধপন্থীদের বল দ্বারা নিজের পথে আনাই ছিল তাঁদের রীতি।

কাজে কাজেই মুণ্ডিত-মস্তক নাস্তিক বৌদ্ধদের ভারতে অবস্থান অসম্ভব হল। একদিকে হিন্দুর আক্রমণ, অন্যদিকে মোসলমানের আক্রমণ। কুমারিল ভট্টের কথা ইতিহাস বিদিত। আবার মোসলমানেরা তাঁদের কিরূপ নৃশংস ভাবে ধ্বংস করেন, তার একটী প্রমাণ কাশীর কাছে সারনাথে পাওয়া গেছে। মাটীর নীচে খনন করে একটী বিহার পাওয়া গেছে, সেখানে বৌদ্ধেরা আহারে বসেছেন, এমন সময় মোসলমান আততায়ীরা এসে সমস্ত বিহারটী অগ্নিসাৎ করে দেয়। এই সময় থেকে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত হল। এই সাম্প্রদায়িকতা যে কত রক্তপাত এবং কত পাপের হেতু, সে আমরা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে দেখতে পাই। ঐ সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধেরা কতক ধর্ম্মত্যাগ করলেন, কতক দেশ ছেড়ে পলায়ন করলেন। ব্রহ্ম, সিংহল, নেপাল, ভোটান, আসাম প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে

তাঁদের যা-কিছু শাস্ত্র ঐ সব দেশে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময়েই পালি বইগুলি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশে চলে যায়; এবং সংস্কৃত বই উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দেশে, এশিয়ামাইনর প্রভৃতি দেশে চলে যায়। বৌদ্ধবিহার, চৈত্য, মহাচৈত্যগুলি হয় হিন্দুর মন্দিরে, নয় মোসলমানের মস্‌জিদে পরিণত করা হল। এই ভাবে বৌদ্ধনাম এ দেশ থেকে মুছে গেল বল্লে অত্যুক্তি হবেনা; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তার ছাপ রেখে গেল হিন্দুধর্ম্মে, আর ভারতের ছাপ বক্ষে ধারণ করে সে চলে গেল দেশ দেশান্তরে, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করার অজানা পথে।

নববিধানের পথে বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধযুগে বাহিরের জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে মৈত্রীর যোগ হয়েছিল ও যে আদান প্রদান চলেছিল, বৌদ্ধদের অন্তর্দ্ধানে তা ছিন্ন হল। সেই দুর্বল মুহূর্ত্তে ভারতভূমিতে বৈদেশিকেরা প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ধর্মাভিযানও নয়, ধর্ম্মশিক্ষাও নয়। ভারতের সুখ-সমৃদ্ধিই তাঁদের লুব্ধ করেছিল। অনেকেই এদেশের বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তাঁদের ভিতর মোসলমানদের সঙ্গেই আমাদের বেশী সম্বন্ধ। মোসলমানদের সহজ বিশ্বজনীন একেশ্বর-বাদ, সাম্যনীতি, নিষ্ঠা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি ভারতের জীবনকে প্রভাবান্বিত করলো। একটী মন্দও দেখা দিল। সেটী হল বলপ্রয়োগ করে ধর্ম্ম-প্রচারের নীতি। তাতেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করলো। তার বিষময় ফল আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক হয়েছিল। আজ নয়শত বৎসর পরেও সেই সাম্প্র-দায়িক বৈরী ও অবিশ্বাসের শান্তি হয় নি। তখন যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তার রেখাপাতে দ্বিজাতি-নীতির (Two Nations Theory) জন্ম হল এবং ১৯৪৭ খৃঃ স্বাধীনতা-লাভের মুখে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে গেল। ফলে জাতির জীবনে যে ওলট্ পালট্ এল, কতদিনে তার সমাধান হবে, কেউ বলতে পারে না। মোসলমান বাদশাহদের ভিতর আকবর*, দারা ও সুজো† সাম্প্রদায়িকতার বিষ ক্ষয় করে মিলন-বাণী প্রচারের বহু চেষ্টা করলেন। সেগুলি দার্শনিক উদারতায় পর্য্য-বসিত হল, জাতির জীবন এবং আচার অনুষ্ঠানকে স্পর্শ করলো না। লৌকিক নিয়মগুলি তাঁদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

সমস্যা-সমাকীর্ণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেকগুলি মহামানবের আবির্ভাব হয়, তার ভিতর রায় রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর, নামদেব, বল্লভাচার্য্য

---

*ইনি "দীন ইলাহী" মত প্রচার করেন।

†ইনি "মজমাউল বহরেন্" নামে বই রচনা করেন।

প্রভৃতি হিন্দু সাধকদের নাম করা যায়। ঐ সময়ে মোসলমানদের ভিতরেও সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিস্‌তি, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রভৃতি মিলনের সাধকদের আগমন। এঁরা আদিম এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলমান ধর্ম্মের মূল ভাবকে আত্মস্থ করে সহজিয়া সাধন, প্রেমের ধর্ম্ম, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক সমাজের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে হিন্দু-মোসলমানের মিলিত ভাষা উর্দ্দুর জন্ম। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাংলার মাতৃভাষার উন্নতি। এই সুফিরা, নানক-পন্থীরা ও চৈতন্যপন্থীরা ঐ সময়ে এক নবযুগের উদ্বোধন করলেন।

দেখা যায়, প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক কাল থেকেই আদিম ধর্ম্ম-ভাব, ঋষিদের পরমাত্মতত্ত্ব, বৌদ্ধদের একমানবতা, ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ, সাম্যবাদ, অন্যান্য জাতির বৈশিষ্ট পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে চলেছে, কিন্তু তাকে সব সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হযনি। কার্য্যত স্বাতন্ত্র্যই চলে এসেছে। অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার চেষ্টার ফলে বহু প্রকার অনিষ্টকর ব্যবহারের আরম্ভ হয়—গণ্ডীমার্গ, ছুৎমার্গ, সাম্প্রদায়িকতা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, অবরোধ-প্রথা, অদৃষ্টবাদ, যাদুবলে বিশ্বাস, বাহ্যিক আচার প্রচলন প্রভৃতির নাম করা যায়। স্বস্ব স্বাধীনতা সংকীর্ণতার গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ হয়ে মানুষ মানুষ থেকে পৃথক হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবন পঙ্গু হয গেল। শাসকদের বিলাসিতা, অকর্ম্মণ্যতা ও কুশাসনে দেশ জর্জরিত হল। মাঝখান থেকে অস্পৃশ্যের সংখ্যা বেড়ে গেল। এত বেড়ে গেল যে, ১৯৩৫ খৃঃ অনুন্নত শ্রেণীর (Schedule Class) গঠন করেও তার সমাধান হল না। মহাপুরুষদের সাধনা আপাতত ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঐ সময়ে ইয়োরোপের উপর দিয়ে একটা আলোড়নের স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল, যেন ভারতের এবং পৃথিবীর নব জন্মেরই আয়োজন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে রেনেসাঁর ঢেউ এলো। গ্রীক্‌ খৃষ্টানেরা কন্‌ষ্টান্টিনোপোলে মোসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পশ্চিমমুখে চলে এলেন,

সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন গ্রীক ও রোমান উচ্চ সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাব ও কর্ম্মপদ্ধতি। মধ্য-ইয়োরোপে এক নব চেতনা দেখা দিল। তার বুকে জাগলো 'প্রশ্ন'। প্রত্যুত্তরে এল স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞান, বিবেকের ধর্ম্ম এবং নবসাহিত্য। মার্টিন লুথারের অভ্যুদয় হল, 'পোপ এবং পৌরোহিত্যকে বর্জন কর', 'নিজের ধর্ম্ম নিজেকে অর্জন করতে হবে' এই রব উঠলো; বিবেক ও নীতির উপরেই যে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, সে কথা ভুললে হবে না, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানের জোয়ার রোধ করা গেল না। তার মাদকতায় ক্রমে জড়বাদের উৎপত্তি হল, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্ম হল। তার প্রসারের জন্যই পৃথিবীকে ভাল করে জানবার আকাঙ্ক্ষা ইয়োরোপকে উন্মত্ত করলো। ইয়োরোপের জাতিগুলি বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। ভারতবর্ষে অরাজকতার সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সকলকে সরিয়ে দিয়ে ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সুদূর প্রাচ্যবাসীরাও তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন। জ্ঞানের ও জড়বাদের দম্ভে স্ফীত ইয়োরোপ সকলকে ছোট করে দেখতে লাগলো। সাম্প্রদায়িকতার উপরে সাম্রাজ্যবাদ (Colonialism) ও বর্ণভেদের পাপ (Racialism) পৃথিবীর বায়ুকে দূষিত করলো। জড়বাদের আনুষঙ্গিক স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, শঠতা (Utilitarianism) মানুষকে ভিন্ন প্রকৃতির করে দিল। এদেশের মানুষের সুখ দুঃখ তাঁদের মনকে স্পর্শ করলো না—তাদের তাঁরা 'hewers of wood and drawers of water' করে রাখলেন। Kipling বল্লেন, 'The East is East and the West is West, And never the twain can meet'. সেইজন্যই ইয়োরোপীয়রা মোসলমানদের মত এদেশের বাসিন্দা হতে চাইলেন না। প্রাচ্যদেশবাসীরা অসভ্য, বর্ব্বর (heathen) ; অতএব তাদের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব উচ্ছেদ করে বিলাতী ছাঁচে ঢেলে গড়ার ব্যবস্থা আরম্ভ হল। ইয়োরোপের স্বার্থ ও রুচি প্রধান হয়ে দাঁড়াল; তাঁদের সদ্যলব্ধ বৈজ্ঞানিক শক্তি, সংগঠন-প্রণালী, যন্ত্রশিল্প, রাষ্ট্রতন্ত্র, অর্থনীতি, শিক্ষা ও

জাতীয় চরিত্রের নীতি এবং নিষ্ঠাকে ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করলেন। তাঁদের শাসনব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা, ডাকঘর, রেল, জাহাজ, ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়, বাণিজ্য, যন্ত্রশিল্প, গঠনকার্য্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিচারালয়, পুলিশ প্রহরী এদেশের অনেক উন্নতি সাধন করলো বটে*, কিন্তু বাইরের চাকচিক্যে মানুষ অন্তরের মূল্য ভুলে যেতে লাগলো। এশিয়াবাসীর ব্যক্তিত্ব ইয়োরোপবাসীর পীড়নে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। পরাধীনতা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের হানি ভারতবাসীকে অধিকতর আঘাত করলো। তাতেই ফুটে উঠলো জাতীয় চেতনা, নবসংস্কৃতি। পরাধীনতা থেকে মুক্তিই তখন ভারতের কাম্য হয়ে উঠলো।

বণিক ইংরাজদের ভিতর যাঁরা জ্ঞানী, তপস্বী, ধার্ম্মিক, তাঁদের প্রভাব তখন অল্পই বোধগম্য হয়েছিল। আজ সময়ের দূরত্বে, স্বাধীনতার পদক্ষেপের সঙ্গে তাঁরাই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন। তখন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতিদের প্রভাব বেশী ছিল, তাঁদেরই অনুকরণে এদেশে একটা Young Bengal এর দল গড়ে উঠেছিল। বিলাস, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচার, বিদ্যার ও সাহেবীয়ানার জাঁকজমক, নাস্তিকতা, বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার মাদকতায় তাঁরা নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই হল তখনকার জীবনের প্রথম বিরোধ। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদ্রীদের কাছে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করতে লাগলেন। এদেশের তৎকালীন পুরোহিত পাণ্ডা মোহন্তদের তুলনায় তাঁদের মার্জ্জিত ব্যবহার ও নীতি-প্রধান জীবন আকর্ষণের বস্তুই ছিল। শ্রীরাম-পুরের কেরী মার্শম্যান একদল লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে-ছিলেন। ডাঃ ডাফের কাছে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গুণী জ্ঞানীরাও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদেশীর বেশভূষা, আচার ব্যবহার ঐ ধর্ম্মের অঙ্গ এবং এদেশের যা-কিছু সব অসভ্যতার চিহ্ন, এই ধারণা মনে ঢুকলো; cultural conquestএর সূত্রপাত হল। মহাপুরুষ ঈশা যে এশিয়ার

---

* 'Economic Condition of India' by Dadabhai Nowroji
'England's Works in India' by N. N. Ghose.
'Economic History of India' by R. C. Dutt
'দেশের কথা' সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।

সন্তান, একথা তাঁরা ভুলে গেলেন। এই ভুল খৃষ্টধর্ম্মকে জীবনে প্রবেশ করতে দিলনা, বাহ্যিকতাই স্থান পেল। এই হল জীবনের দ্বিতীয় বিরোধ। আর এক শ্রেণীর মানুষ ঐ সময়ে দেখা দিলেন, তাঁরা জাতীয় সব-কিছু বজায় রেখে, আধুনিক ভাবে জাতীয় জীবনে উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াসী। কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কোন রকম সংস্কার সাধন করাকে জাতীয়তার বিরোধী বলে ধরে নিয়েছিলেন। ফলে জীবনে আরো একটা বিরোধ দেখা দিল। এই হল তৃতীয় বিরোধ। সে সময়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যলাভ হলেও সেটা অর্থকরীই ছিল, জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ছিলনা। মাননীয় বিচারপতি শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ১৮৭২ খৃঃ একটী ভাষণে বলেন—

"And what, after all, is the education we receive ? Is it based upon any general plan or system, really deserving of the name ? Or, is it not a sort of mere desultory and dispersive education, which enables us to catch a glimpse of this or that branch of knowledge, without giving us any connected or systematic view of our nature and situation."*

ইংরাজী শিক্ষা পত্তনের সময় মর্লি সাহেব যে সার্ভে করেন, তাতে দেখা যায়, তখন বাংলাদেশে দেড় লক্ষ টোল অর্থাৎ দেড় লক্ষ পণ্ডিত বা পুরোহিত ছিলেন। তাঁরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম্মনিষ্ঠাকে ধরে রেখেছিলেন ঠিক, যেমন বিলাতে Pastorরা ধরে রাখেন। ঐ সব টোলের পণ্ডিতদের ভিতর গ্রাম্যদোষ, কুপমণ্ডুকতা, বৃহত্তর যোগের অভাব ছিল ; গ্রামে গ্রামে এক এক রকম বুলি (dialect) ছিল। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় দফতরের কাজ হত, শিক্ষাও চলত। তখনকার কালে সমস্ত বাংলা দেশে একটী বাংলা ভাষা গড়ে, চলন করা বিদেশী রাজার শাসন পরিচালনার জন্য দরকারী

* **'Report of the Indian Reform Association' 1872**
Vide **'Biography of a New Faith' by Dr. P. K. Sen**

এই আবিষ্কারের কাজ সুচারুরূপে চালাবার জন্য পাশ্চাত্য মনীষীরা বহু প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। প্যারিসের Academie des Inscriptions et Belles Letters of the Institute of Paris (১৬৬৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত) সম্ভবত সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। ক্রমে ১৭৮৪খৃঃ কলিকাতার Royal Asiatic Society of Bengal স্থাপিত হল। কলিকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী। এই Asiatic Societyকে কেন্দ্র করে বহু উচ্চাঙ্গের গবেষণা আরম্ভ হল। রাজা রামমোহনের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর। তখন যুক্তি বিচারের (Reason ও Criticism) যুগ। বিশ্বে কুসংস্কার বনাম সংস্কারের যুদ্ধ চলেছে। ক্রমে দেখা যায়, রাম-মোহন এদেশে সেই যুদ্ধের কর্ণধার হলেন। কিন্তু Asiatic Societyর সঙ্গে তাঁর কোন যোগ দেখা যায় না। পরে অবশ্য রাজা যখন ১৮৩৩ খৃঃ প্যারিসে যান, তখন তাঁকে সেখানকার Societe Asiatic এর সদস্য করা হয়েছিল। রামমোহনের সমসাময়িক দেওয়ান রামকমল সেন Asiatic Societyর প্রথম দেশীয় সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন (১৮১৬-২৮ খৃঃ)। প্রথম প্রথম Asiatic Societyর উচ্চপদগুলি ইয়োরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী অধিকার করেছিলেন। ক্রমে একটী একটী করে বঙ্গসন্তান সেই সকল স্থান পূর্ণ করতে থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও অনেকে এই সকল বিষয়ে চর্চ্চা আরম্ভ করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে যে চর্চ্চা হয়, তারই একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। তার ভিতর দুজনের নাম বিশেষ করে বলা যায়—ডাঃ রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭ খৃঃ) ও ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র (১৮২২-৯১খৃঃ)।

(১) ডাঃ রামদাস সেনের নাম প্রথমে করা যায়। তাঁর 'ঐতিহাসিক রহস্য' বইটীতে* অতি মূল্যবান বিষয় সংগৃহীত হয়েছে। বইটীর দ্বিতীয় ভাগে 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়', 'বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচনা', 'বুদ্ধদেবের দন্ত' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় ভাগে 'বৌদ্ধজাতকগ্রন্থ' বিষয়ে কয়েকটী অধ্যায় আছে।

---

*'ঐতিহাসিক রহস্য' ১ম ভাগ ২২০ পৃঃ (১৮৭৪খৃঃ);
২য় ভাগ ২৩৬ পৃঃ (১৮৭২খৃঃ); ৩য় ভাগ ২৩০ পৃঃ (১৮৭৯খৃঃ)

তাঁর লিখিত 'বুদ্ধদেব—জীবনী ও ধর্ম্মনীতি' বইটী (২৮৩ পৃঃ) তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯১ খৃঃ তাঁর পুত্র প্রকাশ করেন।

(২) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম সকলের নিকটে পরিচিত। তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর এই কয়েকটী বই প্রসিদ্ধ। যথা—

(ক) 'ললিতবিস্তরঃ, সংস্কৃত সংস্করণ (১৮৭৭ খৃঃ)

(খ) 'An Introduction to the Lalita-Vistar' (1877)

(গ) 'Antiquities of Orissa' 2 vols, (1875 & 1880)

(ঘ) 'Buddha Gaya—the Hermitage of Sakyamuni' (1878)

(ঙ) 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (1882)

(চ) 'Lalita-Vistar' English Edition (1886)

(৩) সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের ভিতর স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তাশীল প্রবন্ধগুলি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হত। তাঁর লিখিত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (Religious Sects of the Hindus) ১ম ও ২য় ভাগ (১৭৯২ শক বা ১৮৭০ খৃঃ এবং ১৮৮৩ খৃঃ) বইটী বহু তথ্যে পূর্ণ। বইটীর ভূমিকায় দেখা যায় যে, তিনি ১৮৪৮ খৃঃ থেকে বইটীর উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রথমে H. H. Wilson এর হিন্দুসম্প্রদায় সম্বন্ধে Asiatic Research 16th and 17th Part এর বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করেন। নিজেও অনুসন্ধান করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। গ্রন্থে একশত আট বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবরণ আছে। 'বুদ্ধাবতার' বিষয়ে বইটীর দ্বিতীয় ভাগে ৪০পৃঃ একটী অধ্যায় আছে।

(৪) এমন সময়ে এক ক্ষণজন্মা পুরুষের অভ্যুদয় দেখা যায় যিনি শুধু জ্ঞানবাদী নন, জ্ঞানধর্ম্মী। স্যার যদুনাথের কথায় বলতে হয় যে, ইনিই প্রথম গবেষণার ফলকে গ্রন্থাগার সাজানোর

সামগ্রী না রেখে জীবনের উপকরণরূপে দেখতে শেখান। ঐ সময় থেকে জ্ঞানানুশীলনের মোড় ঘুরে গেল। জীবনকে জীবন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা আরম্ভ হল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র* তাঁর 'জীবনবেদ' গ্রন্থ রচনা করে জীবনের স্থান কোথায়, তা' নির্দ্দেশ করে গেছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম দেশীয় সম্পাদক দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা এখনো বিদ্বন্‌মণ্ডলীর কাছে ঠিক ভাবে গৃহীত হয়নি। তাঁকে ধর্ম্ম-সংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক বলেই সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর সংক্ষিপ্ত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনের ভিতর জাতির জীবনে তিনি যে রূপান্তর এনে দিয়েছিলেন, আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে যে ঐক্য এবং নূতন আদর্শ ধরে ছিলেন, সেই নবদৃষ্টি ও শক্তিই হল তাঁর অবদান। স্যার যদুনাথ ১৯৫৩ খৃঃ একটী বক্তৃতায় বলেন—"কেশবচন্দ্রের জীবন আজ সত্তর বৎসর হল শেষ হইয়াছে, কিন্তু তিনি নব্য ভারতের জীবন-ধারা যে কত মহৎ, কত সুন্দর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখন না ভুলি।"† নবপ্রকাশিত দৃষ্টিটীকে সমস্ত কাজের motive force করে, চলেন ও শেষ জীবনে সত্যদ্রষ্টা কেশবচন্দ্র তাকে 'নববিধান' আখ্যা দেন। এই 'নববিধান'কে কেউ বা মনে করেছিলেন বিলাতি ছাঁচের বা Christian outlook এর বস্তু, কেউ বা মনে করেছিলেন একটী Reform movement এর নামান্তর বা একটী সম্প্রদায়, অনেকে বলেছিলেন Electicism বা তালি দেওয়া কাপড়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বক্তৃতায় নববিধান তত্ত্বটী যে কি বস্তু, তা খুব সহজ করে দিয়েছেন—

"কেশবচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের যখন উজ্জ্বল উদীয়মান অবস্থা. তখন আমার বয়স অল্প ছিল। সে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে তাঁহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের গুরুত্ব ও

---

*ইঁহার বহু জীবন চরিত আছে। তাহার ভিতর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' চারি খণ্ড এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রচিত **Life and Teachings of Keshub Chunder Sen** প্রধান।

† 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সন।

বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে আমার পরবর্ত্তী জীবনে কেশব-জীবনের শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি,…পরবর্ত্তী সময়ে আমি কেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম, ঋষিগণ যে ভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী বিদেশী সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনে তাঁহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন।… এইরূপে স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-সাধনের এক উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে, সার্ব্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জীবনের ও সাধনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।"*

কেবল প্রকৃতির ভিতর বা ইতিহাসের ভিতর বা সাধুদের জীবনের ভিতর সমন্বয় নয়, স্ব স্ব আত্মার ক্রিয়ার ভিতর যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম; জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা; বৈরাগ্য, প্রেম, পুণ্য; নির্ব্বাণ, প্রেম, বাধ্যতার ভিতর কেশবচন্দ্র সমন্বয় দর্শন ও সাধন করেন এবং তার ভিতর বুদ্ধ, চৈতন্য ও ঈশার মিলন লাভ করেন। রামমোহন† এবং দেবেন্দ্রনাথ বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে নীরব ছিলেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্ম আন্দোলন 'ঔপনিষদিক' পরিধির ভিতর আবদ্ধ ছিল। ঐ সঙ্গে আধুনিকতার প্রভাবে Rationalism ও Social Reform দেখা গিয়াছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ভিত্তি করলেন। তিনি কেবল নীতিবাদী ছিলেন না, তিনি ঈশ্বরপ্রীতির টানে নীতিধর্ম্মী হয়েছিলেন। বিবেক এবং ভগবৎ-প্রেরণা এই দুটীকেই তিনি সকল কাজের মূলে দর্শন ও স্বীকার

*'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১২ই মাঘ ১৩১৬

† *Vide* **'Biogradhy of a Naw Faith, by Dr. P. K. Sen —on Universalism of Rammohun and Keshub.**

করতেন। ফলে তাঁর জীবনে Reason ও Faith, Science ও Religion উদারতা ও নিষ্ঠার মিলন দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে Frethinking—Ethics—Science—Rationalism—Commerce—Constitution—Culture—Politics—Economics প্রভৃতি পাশ্চত্য জাতিগুলিকে ধাপে ধাপে বাহিরের দিকেই আকর্ষণ করেছে, ফলে সংঘর্ষ ও শান্তির অভাব জীবনকে জর্জরিত করেছে। তার প্রভাব ভারতবর্ষের জীবনেও দেখা গিয়েছে। মানবচিত্তে একটা উচ্চতম মুহূর্ত্ত আসে, যখন বিধাতার ইচ্ছাকে মানুষ প্রেরণারূপে লাভ করতে পারে। এই ভাবেই মানুষ তাঁর অভ্রান্ত পরিচালনায় জীবনধারাকে ক্রমবিকাশের পথ দিয়ে, নিত্য নব অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ইতিহাসে বিধাতা নিত্য আত্মপ্রকাশ করছেন। যেখানে যা কিছু ঘটছে, সবই অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। বাইরের দিকে দেখলে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, ভিতরের চালনা স্পষ্ট করে ধরে থাকলে অখণ্ড জীবনের শক্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্যের বহির্মুখীনতা এবং প্রাচ্যের অন্তর্মুখীনতা, দুই-ই যে জীবনের উপকরণ, এই কথা আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রমাণিত করলেন। নীতি ও প্রেরণার সাহার্য্যে, একের আলোকে অন্যের নিকট অপ্রকাশিত যাহা কিছু, সব প্রকাশিত করাই নববিধানের বড় কথা। তখনই পৃথিবীতে অখণ্ড প্রেম-পরিবার সম্ভব হয়, এই পথেই বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরাবিষ্কার সম্ভব হয়। কেবল পুনরাবিষ্কার নয়, বৌদ্ধ-সাধনা নূতন করে জাতির কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়েছে। কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম নয়, আমাদের ভিতর বৈষ্ণবধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মোসলমানধর্ম্মের প্রতি যে বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, সব দূর করে দিয়ে, তাদের প্রতি কেশবচন্দ্র মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছিলেন দ্রষ্টা এবং শিল্পী। তিনি কি ভাবে আপনার ও দলের জীবনে নববিধান তত্ত্বটাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, দেখলে অবাক হতে হয়। ঐ নবসাধনার সঙ্গে দেশে নানা ধর্ম্মগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হল—আর্য্যসমাজ, বেদসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ

মিশন, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা, মহাবোধি সোসাইটী, গৌড়ীয় মঠ, খৃষ্ট সেবাসঙ্ঘ, বাহাই সম্প্রদায়, আহ্‌মোদিয় সম্প্রদায় প্রভৃতি হিন্দু, খৃষ্টান, মোসলমান ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নব জাগরণ দেখা গেল।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১৪ই মার্চ্চ ১৮৮০ খৃঃ 'শাক্য-সমাগম' অনুষ্ঠানে যে নূতন পথ প্রদর্শন করলেন, তখন থেকে নববিধানমণ্ডলীর ভিতরে এবং বাইরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে নানা অধ্যয়ন, গবেষণা ও সাধনা চলে এসেছে।

প্রথম পুরুষে—ডাঃ রামদাস সেন, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগৌবিন্দ রায় প্রভৃতিকে দেখা যায়।

দ্বিতীয় পুরুষে—রমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণবিহারী সেন, শরচ্চন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

তৃতীয় পুরুষে— ঈশানচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু, চারুচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অম্বিকাচরণ সেন, দ্বিজদাস দত্ত, মহারাণী সুনীতি দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

চতুর্থ পুরুষে—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বিমলাচরণ লাহা, বেনীমাধব বড়ুয়া, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র রায়, বিজয়-চন্দ্র মজুমদার, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, কালিদাস নাগ, সাতকড়ি মুখার্জী, নলিনাক্ষ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সদানন্দ ভাদুড়ী প্রভৃতি।

পঞ্চম পুরুষে—ডাঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী, ডাঃ নীহার-রঞ্জন রায়, ডাঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম করা যায়।

Asiatic Society-তে সকল ধর্ম্মের অধ্যয়ন হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই পথে একটী একটী System এর অধ্যয়ন হয়েছে। নববিধানের নবচিন্তাধারায় ঐ সব বিচ্ছিন্ন System কে প্রেরণার আলোয় এক অখণ্ড জীবন-ধারায় দেখা হয়েছে, তাই তাদের জীবন ও সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে। ফলে যে বুদ্ধ-মুর্ত্তিতে অমঙ্গলের আশঙ্কা হত, সেই মুর্ত্তি আজ গৃহে গৃহে শান্তির প্রতীক।

অশোকস্তম্ভের মূর্ত্তি সুশাসনের নিদর্শন। কাব্যে, গল্পে, শিশু-সাহিত্যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধ-কাহিনীর স্থান হয়েছে। বৌদ্ধ-কাহিনী, নাটিকা ও সংগীত আজ ঘরে ঘরে গীত আবৃত্ত হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার ফলে আজ বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ যুগের বহু কথা জানতে পেরেছি। নববিধান সাহিত্যের সমন্বয়ভাষ্যালোচনা সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলে দিয়েছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়েছে এবং ঐ সূত্রে জাতির জীবনে বৌদ্ধ-চিন্তা সঞ্চারিত হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীতে' বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে জাতিকে ঘনিষ্ঠ করে দিয়ে গেছেন। 'মহাবোধি সোসাইটী', 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা' দেশ-বিদেশের বৌদ্ধসাধকদের সাধন-কেন্দ্র হয়েছে। বান্‌দুঙ্‌ মহাসভায় বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি অবলম্বন করে প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির মিলন সার্থক হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আজ আমাদের জীবনের অঙ্গ, বৌদ্ধেরা আমাদের আত্মীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সমন্বয়-সাধনা

ইতিহাসের চলচ্চিত্রে চিরদিনই নিদ্রা জাগরণ, উত্থান পতন, ভাঙ্গা গড়া ও পরিবর্ত্তন দেখা গিয়েছে। এযুগে তারই ভিতর একটী কথা মানুষের কাছে নূতন করে উপস্থিত হয়েছে যে, পরস্পরের সংস্পর্শ, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন এসে জগৎকে পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এই সত্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কাছে প্রবল ভাবে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তারই নামকরণ করেছিলেন 'নববিধান' বা 'The Religion of Harmony'; এবং এর ভিতর যে নিগূঢ় নিয়ম রয়েছে, সেটী ধরবার ও প্রকাশ করবার জন্যই তিনি আত্মনিবেদন করেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবনে অনেকগুলি বিভিন্ন ধারা এসে মিলিত হয়েছিল। সেগুলি তাঁর জীবনের বাহিরে দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে, প্রেরণার আকারে তাঁর সজীব মনে সমন্বয়ের ধারায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর পিতৃকুল বৈষ্ণব, মাতৃকুল শাক্ত। তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন কলিকাতা সহরে, পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যে, ইংরাজ অধ্যাপক এবং খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছে। তাঁর পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন রক্ষণশীল, অথচ এদেশীয় এবং বিদেশীয় বিদ্বজ্জনের মিলনস্থল। নূতনের আহ্বান কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর আকর্ষণ করে আনে। সেখানে তিনি রাজা রামমোহনের ইস্‌লামিক ভাব এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবের সংস্পর্শে আসেন। মহর্ষির সঙ্গে ১৮৫৭ খৃঃ সিংহল-ভ্রমণে গিয়ে বৌদ্ধসংঘের একটী ছবি দেখতে পান।* ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পূর্ব্বেই British Indian Association, Goodwill Fraternity প্রভৃতি দল গঠন করে, সদলে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য অনুশীলন এবং ধর্ম্মভাবের আলোচনা ও আদান প্রদান আরম্ভ করেন। তখন কে তাঁর সহায় ছিল? "যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন

---

* **'Diary in Ceylon'** *Vide*—**'The Book of Pilgrimage' by Keshub Chunder Sen**

কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটী গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর,' এই ভাব, এই শব্দ, হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল।··· তোমাদের বন্ধু কেবল এই একটী পরম সহায় পাইয়াছিল।"* 'প্রার্থনাই' তাঁর প্রাণের গভীর আকুতি জানিয়েছিল। নিজের জীবনে যে সকল বিভিন্নমুখী ধারা মিলিত হয়েছেল এবং সে সময়ে সমাজে ও রাষ্ট্রে যে সব বিরোধ দেখা দিয়েছিল, ঐ প্রার্থনার স্রোতই দ্রুতগতিতে তাঁর অন্তরে ও বাহিরে তার সমন্বয়-সাধনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

ভিতরের কথা তিনি 'জীবনবেদে' বলে গেছেন। বাহিরে দলগত জীবনে যা দেখা যায়, তা তাঁর জীবনীকারেরা বর্ণনা করে গেছেন। পরম দেবতার হাতে আঁকা সমন্বয়-সাধনার ঐ ছবি যে কত মহৎ ও সুন্দর ছিল, তার একটী পরিলেখ এখানে দেওয়া হল—

১। 'সঙ্গতসভা' (১৮৬০ খৃঃ)—ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত ব্রহ্মোপাসনা, সংস্কৃত জীবন ও মহর্ষির ব্যক্তিত্ব নিয়েই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে অগ্রসর হন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যব্রত, প্রচারের কাজ, জনসেবা ও শিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং নারীজাতির ভিতর শিক্ষার ও ব্রহ্মোপাসনার প্রভাব বিস্তার করার কাজেও অগ্রসর হন। পরস্পরের উপলব্ধি এবং জিজ্ঞাস্যের আদানপ্রদানের জন্য† এবং নৈতিক জীবন গঠনে সহায়তা করার জন্য এই 'সঙ্গতসভা' গড়লেন। কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও নীতির প্রভাব বিস্তার করলেন। রাজা রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানে যুক্তিবিচারের বিকাশ হয়; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ে অধ্যাত্ম জীবনকে সহজ করে; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাস-বিবেক-বৈরাগ্যে গড়া নূতন নীতির পথ দেখালেন। সেই সময়েই জাতির জীবনে নৈতিকবোধের প্রথম জাগরণ। ঐ নব-নীতির বলেই তাঁরা পৃথিবী জয়ের শক্তিলাভ করেছিলেন।

---

* 'জীবনবেদ'

† 'সঙ্গত' ১ম ও ২য় খণ্ড দেখুন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের 'The Brahmo Somaj Vindicated' (1863) বক্তৃতা শুনে বৃদ্ধ পাদ্রী ডাক্তার ডাফ্ বলেন, "The Brahmo Somaj is therefore power and a power of no mean order—in the midst of us!"† এই হল সমন্বয়ের প্রথম সূচনা—নীতির ভিত্তিতে দলগত জীবনের প্রতিষ্ঠা।

২। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (১৮৬৬ খৃঃ)—নীতির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, উদার সার্ব্বভৌমিকতা এবং বিশ্বপ্রেম স্বতই অধিকার বিস্তার করলো। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ছেড়ে অন্তরঙ্গ সাধন আরম্ভ হল। ব্রহ্মানন্দের নির্দ্দেশে এই শ্লোকটী জীবনের নূতন আদর্শরূপে রচনা করা হল—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

সম্প্রদায়, মন্দির, তীর্থ, শাস্ত্র ও ধর্ম্মমত ছোট হয়ে গেল; বিশ্বই মন্দির দাঁড়ালো; চিত্তই তীর্থ হল। সত্যই শাস্ত্র এবং বিশ্বাসই সমস্ত সাধনার মূল; প্রীতি ও স্বার্থনাশের দ্বারা চালিত হয়ে সকল সাধন ও সকল কার্য্য করাই তাঁদের পথ হল। সমাজের জীবনে, ভিতর থেকে, এই প্রথম বিপ্লব দেখা দিল।

বিপ্লবের পুরোধা আচার্য্য কেশবচন্দ্র (ক) নব বার্ত্তা প্রচারের জন্য 'Indian Mirror' (১৮৬১ খৃঃ) এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৬৪ খৃঃ) নামে দুটী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করলেন, (খ) ১৮৬৪ খৃঃ সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের এবং প্রাদেশিক জনসাধারণের কাছে 'নীতি ও সত্যধর্ম্মকে' নূতন Challenge রূপে ধরলেন এবং তার উপর সকল প্রদেশকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন। কলিকাতায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', মাদ্রাজে 'বেদসমাজ', বোম্বাইএ 'প্রার্থনা-সমাজ', পাঞ্জাবে 'আর্য্যসমাজের' জন্ম হল। জাতির জীবনে সাড়া পড়ে গেল। চিন্তাশীল লেখক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বলেছেন—

† 'Christian Work' July 1863.

"জাতীয় জীবনযজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচারকর্মের অপূর্ব উন্মাদনা, নূতন ভাব চিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য্য সৃজনীশক্তি এবং সর্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এক ধর্ম, এক জাতি, এক ভগবান্ এই মহাবাক্য প্রচার কল্পে যে বাঙালী কবি মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কবি নবীনচন্দ্র কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। কেশবের অব্যবহিত পরবর্তী কালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার প্রচার-প্রণালী ও কর্মপদ্ধতিতে কেশবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। যে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা কেশব তাঁহার 'জীবনবেদে' উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ কর্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত।"*
(গ) ভারতবর্ষে সম্মানিত সকল ধর্ম্মবাদীদের মিলনসাধনের ক্ষেত্ররূপে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন (১৮৬৬ খৃঃ) (ঘ) হিন্দুর মন্দির, মোসলমানের মস্জিদ ও খৃষ্টানের গির্জার মিলিত ছাঁচে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নির্ম্মাণ করালেন (১৮৬৯ খৃঃ); এই রকম একটী মন্দির পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। (ঙ) ভারতবর্ষে সম্মানিত সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র থেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচনাবলী (Theistic Texts) সঙ্কলন করে 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থে একসঙ্গে প্রকাশ করালেন (১৮৬৬ খৃঃ) ও একত্ব-সাধনের জন্য নিত্যপূজা-উপাসনায় ভক্তির সঙ্গে তাহার পাঠ প্রচলন করলেন। এই ধরণের বইও পৃথিবীর সাহিত্যে এই প্রথম। (চ) ১৮৭০ খৃঃ বিলাতে নিমন্ত্রিত হয়ে যান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান প্রদান এবং সমন্বয় আরম্ভ করেন। (ছ) সামাজিক উপাসনা-প্রণালী এবং আচার অনুষ্ঠান নূতন আকার ধারণ করলো। 'সঙ্গত সভার' প্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল—উপবীত ত্যাগ করিয়ে ব্রাহ্মণশূদ্রকে এক করা হয়েছিল। তার উপর নূতন আহ্বান এল, "নর নারী সাধারণের

* 'বঙ্গশ্রী' ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

১৮৬৯ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত।

সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার"। কেবল সামাজিক জীবনে নয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সকলের সমান সুযোগ হল। বাহ্য আড়ম্বর ছেড়ে মূলভাব অবলম্বনে এবং সাম্প্রদায়িকতা ছেড়ে সার্ব্বজনীন ভাবে দলগত জীবনের প্রতিষ্ঠা সমন্বয়ের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করলো।

(৩) ব্রহ্মোপাসনা নূতন ব্যাপার, ঐ বিষয়ে একটু বিস্তৃত ভাবে বলা প্রয়োজন। ব্রহ্মোপাসনার ভিতর দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ তার বৈশিষ্ট লাভ করেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় একমেবা-দ্বিতীয়মের উপাসনার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। তিনি বল্লেন— "ভাব সেই একে" এবং সেইজন্য একটী উপাসনা-পদ্ধতি স্থির করলেন—গায়ত্রীমন্ত্র জপ—উপনিষদের বাক্য আবৃত্তি—শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন। জনপ্রিয় করবার জন্য তার মধ্যে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতের ব্যবস্থা করলেন, তাতেও উপাসনা সাধারণের মতন হলনা। শ্রীমন্ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নেতৃত্বকালে উপাসনাকে,—অর্চ্চনা—প্রণাম—সমাধান— ধ্যান — স্তোত্র—প্রার্থনা—স্বাধ্যায়ে বিস্তৃত করলেন* ; ঐ জন্য সংস্কৃতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ রচনা করলেন, কিন্তু সংস্কৃত পাঠ সকলে বুঝতেন না। তাই তরুণ কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি বাংলায় 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান'† আরম্ভ করলেন। ঐ ব্যাখ্যান কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যের বাংলা অনুবাদ নয়, তাঁর উপলব্ধির ভিতর ঋষিবাক্যের নবজন্ম হল। কেশবচন্দ্র ব্যাখ্যানে কৃতার্থ হয়ে তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধি দেন। মহর্ষিও কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি ভূষিত করে আলিঙ্গন দিলেন। ব্রহ্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত ও নীতিধর্ম্মী—প্রার্থনা, পাপবোধ ও বিবেক আগেই তাঁকে অধিকার করেছিল। তাই তিনি উপাসনায় পারমার্থিক ভাবের সঙ্গে উন্নত জীবন লাভের উপযুক্ত প্রেরণা চাইলেন। মহর্ষি তাঁর ভাবে ভাবান্বিত হয়ে উপাসনা-মন্ত্রে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' মন্ত্র যোগ করলেন। ব্রহ্মানন্দের যোগ্যতা দেখে মহর্ষি তাঁকে আচার্য্যপদে বরণ করলেন।

* 'ব্রাহ্মধর্ম্মঃ' গ্রন্থ দেখুন।

† 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' দেখুন।

এতদিন উপাসনা-পদ্ধতি ছিল বৈদিক-ছাঁচে-ঢালা, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আচার্য্য হওয়া সম্ভব ছিল না, বেদ ভিন্ন উপাসনা হ'তনা, একত্রে বসলেও উপাসনা ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে বরণ করায় ব্রহ্মোপাসনার* নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। এখন সংস্কৃতের স্থলে মাতৃভাষার ব্যবহার এবং শাস্ত্রের স্থলে অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রেরণা (Inspiration), পারমার্থিকের সঙ্গে উন্নত জীবন এবং ব্রাহ্মণের স্থলে শুদ্ধতা ও ঐকান্তিকতা উপাসনাকে প্রাণের বস্তু করে তুল্‌লো। অনেকের ধারণা যে কেশবচন্দ্র emotional, ভক্তিবাদী। প্রার্থনা এবং কীর্ত্তনে তাঁর জীবনে প্রথমে ভক্তি এসেছিল সত্য, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার ভিতর ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের বৈচিত্র এবং বিরোধের সামঞ্জস্য ক্রমে অপূর্ব্ব পূর্ণতা দান করে ছিল। গায়ত্রীমন্ত্রে একদিন প্রাচীন ঋষিরা যে শুভবুদ্ধি-প্রেরয়িতার ধ্যান করেছিলেন, তিনিই নূতন উপাসনায় প্রেরণারূপে অবতীর্ণ হয়ে, মানুষের বুদ্ধিকে অধিকার করলেন। ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দাঁড়াল। উপাসনাব অঙ্গ হল, উদ্বোধন -- আরাধনা—ধ্যান—প্রার্থনা—শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। এই উপাসনাপদ্ধতিই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উপাসনায় যে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন এল, তাতে কোন প্রশ্ন উঠলো না—সকলের অন্তর তাকে স্বীকার করে নিল। নূতন উপাসনার ভিতর দিয়েই তাঁরা নূতন মানুষ হয়ে গেলেন। নূতন নূতন ব্যবস্থাও দেখা দিল। (ক) ভারতাশ্রম (১৮৭২ খৃঃ)—ব্রহ্মোপাসনায় যে নূতন আদর্শ প্রকাশিত হয়, জীবনে ও আচরণে তাহা পালন করা খুবই কঠিন ছিল। নানা নির্য্যাতন এসে উপস্থিত হত, কারণ সে সময়ে অন্যায়ও কুসংস্কারের ভারে জাতি অবনত হয়ে ছিল। সৎ-সঙ্গের প্রয়োজন হল। দেশ বিদেশ থেকে নির্য্যাতিত পরিবারগুলি 'ভারতাশ্রমে' পরস্পরের উপার্জ্জনে বাস করে, পরস্পরের সাহচর্য্যে

---

* 'উপাসনা-প্রণালীর ব্যাখ্যা'—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিবৃত।
'ব্রহ্মোপাসনা বা উপাসনা-তত্ত্ব'—ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রণীত।

নূতন আদর্শের দিকে অগ্রসর হলেন। নূতন-ভারতীয়-জীবনের চিত্র 'সুখী পরিবার' পুস্তিকায় অঙ্কিত হল। নূতন বিবাহ-বিধি Act III of 1872 বিধিবদ্ধ করা হল। তার ফলে সমাজে বাল্যবিবাহ, ব্যভিচার, নারীদের প্রতি অত্যাচারের পথ বন্ধ হল এবং বিধবা-বিবাহ ও শঙ্কর-বিবাহের পথ উন্মুক্ত হল, জাতি-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা-ভেদ-বর্জিত নূতন সমাজ দেখা দিল। (খ) ভারত সংস্কার সভা (১৮৭০)—নব-জাগ্রত সামাজিক-বিবেকের চালনায় দেশের অবস্থা উন্নত করার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা। সর্ব্বসাধারণের জন্য শিক্ষার আয়োজন; তাদের দুঃখ অভাব ও মাদকতা অশ্লীলতা প্রভৃতি দোষ নিবারণ; শাসন ব্যাপারে যে সব অন্যায় অবিচার হত তার প্রতিকার ও জনমত গঠন; কৃষক, শ্রমজীবি ও দরিদ্রের প্রতি ধনী, বণিক ও জমিদারের অবহেলা সংশোধন এই সভার কাজ ছিল। (গ) ব্রহ্মগীতোপনিষদ্—সমন্বয়ের ভাব প্রথম থেকেই তাঁদের ধর্ম্মমতে প্রকাশ পেয়েছিল। তার বিশেষ সাধন আরম্ভ হল। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এবং মার্গ-চতুষ্টয়ের সমন্বয় নিয়ম-মত আরম্ভ করলেন। যাঁর ভিতর যেটীর প্রাধান্য সেটীর সঙ্গে অন্য সবগুলিকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল এই সাধনের লক্ষ্য।

"যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে সেই মীমাংসা স্থলে যাইতে হইবে। যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই সে সমুদায় অপরাবিদ্যা; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।" *

সাধু অঘোরনাথ যোগ-শিক্ষার্থী, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভক্তি-শিক্ষার্থী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ জ্ঞান-শিক্ষার্থী, ভাই উমানাথ ও ভাই প্রাণকৃষ্ণ সেবা-শিক্ষার্থী হলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সকলের সঙ্গেই রইলেন। (ঘ) শ্রীদরবার— নবজাত মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর উপর নিয়ন্ত্রণের

* 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ্' ৮ই মার্চ্চ, ১৮৭৭ খৃঃ।

ভার দিলে একনায়কত্ব অপরাধ হয়। অন্যদিকে জনসাধারণের মতাধিক্যে, হাত-তুলে কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণে দেখা দেয় অপ্রেম, চক্রান্ত ও মিথ্যা। এর সমাধান কোথায়? একদিন জাতির জীবনের এক সঙ্কটকালে, সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও ঐক্য স্থাপনের জন্য শিখ-গুরুরা যে পথে চলেছিলেন, সেই 'সঙ্গত' 'শ্রীদরবারের' পথ তাঁরা ধরলেন। 'সঙ্গতের' কথা আগেই বলা হয়েছে। 'শ্রীদরবারে' প্রেরিত দল একত্রে বসে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য প্রার্থনা ও ধ্যান করতে আরম্ভ করতেন এবং পবিত্রাত্মার পবিচালনার জন্য অপেক্ষা করতেন। প্রেরণা পেয়ে সকলে একমত হ'লে সেই কাজে অগ্রসর হতেন। একমত না হলে কোন নির্দ্ধারণ হ'ত না। সামাজিক বিপ্লবের ভিতর তাঁরা এই ভাবে সমবেত নৈতিক চেতনার এবং প্রেরিতদের অন্তরে প্রকাশিত বিধাতার সাক্ষাৎ আদেশবাণীর উপব পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন।

(৪) নববিধান—সব যুগধর্ম্মেই একটী একটী বিশেষ ভাব কাজ করে গেছে। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রধান ভাব সমন্বয়। আচার্য্যদেব তার নামকরণ করলেন 'নববিধান'—

"Such is the New Dispensation.... It gives to history a meaning, to the action of Providence a consistency, to quarreling Churches a common bond and to successive dispensations a continuity."*

মনীষী মামফোর্ড নববিধান বিষয়ে লিখেছেন—

"In that spirit, only in that spirit will the classic religions find regeneration, only so can all nations and kindreds and people, to use the words of Apocalypse come within speaking distance of each other." †

---

* 'We Apostles of the New Dispensation' বক্তৃতা হইতে ৩৮, ৩৯ ও ৪২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উক্তিগুলি গৃহীত।

† 'The Conduct of Life'—Lewis Mumford (1952) P. 117.

মীমাংসা আবিষ্কার করাই হল তার সাধন। নববিধানের এই কয়টী যুগান্তকারী সাধন দেখা দিল। (ক) অধ্যেতাব্রত—ব্রহ্ম-গীতোপনিষদে ধর্ম্মের বিভিন্ন মার্গসাধনের সমন্বয়-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল ; এখন নব অধ্যয়নে বিভিন্ন শাস্ত্রের সমন্বয়-তত্ত্ব প্রকাশিত হল। আচার্য্যদেব লিখলেন - "in all scriptures a unity and through all dispensations a continuity"; তাঁর জীবনের আলোক ধরে, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ম্মের, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খ্রীষ্টধর্ম্মের, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মোসলমান ধর্ম্মের অধ্যেতাব্রত নিলেন। তাঁদের অনুসরণ করে চিরঞ্জীব শর্ম্মা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্ম্মের, কৃষ্ণবিহারী সেন সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করলেন। নব অধ্যয়নের ফলে সমন্বয়-ভাষ্যমালা প্রকাশিত হল—নূতন নূতন কথা লিখিত হল—ধর্ম্মসাহিত্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনলো। মানুষের ব্যাখ্যা ছেড়ে, বিধাতার ইচ্ছার দিকে দৃষ্টি পড়লো। 'শ্লোকসংগ্রহ' বইটীতে এতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম স্থান পায়নি—নব অধ্যয়নের পরের সংস্করণে 'ললিতবিস্তরের' বাক্য তাতে সংযুক্ত করা হল। বৌদ্ধধর্ম্ম অজ্ঞেয়বাদ নয়, নিরীশ্বরবাদ নয়, দুঃখবাদ নয়, নিছক্ নীতি-ধর্ম্ম নয়, Protestantism মাত্র নয়, ইহা সবার অধ্যাত্মধর্ম্মের একটী আবশ্যকীয় সোপান, এ কথায় আর সন্দেহ রইলো না। (খ) সাধুসমাগম—আচার্য্য বল্লেন মানুষ স্বতন্ত্র নয়—মানুষ 'একে দশ'। এর অর্থ কি? "আমি আমার ঘরে বিচরণ করি এবং আমার ঘরে আর দশজন বিচরণ করেন। সেই দশজন হইতে স্বতন্ত্র আমার চরিত্র নাই। আমার ঘরে সেই দশজনেরও অধিকার আছে। ...ভূতকালের সমস্ত বংশ বর্ত্তমান বংশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, আবার বর্ত্তমান বংশ ভবিষ্যদ্বংশাবলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তোমার রসনায় মান আর নাই মান, তোমাদিগের আত্মা স্বীকার করিবে, যে তাঁহারা সকলেই তোমাদিগের আত্মার ভিতরে বিচরণ করিতেছেন। যদি বল,

আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম, আমরা কাহারও নিকট ঋণী হইব না, তোমরা তোমাদের স্বতন্ত্রতা লইয়া, তোমাদিগের সেই কল্পিত ও স্বতন্ত্র স্বর্গে প্রবেশ কর। আমি সেই জঘন্য স্বর্গ চাইনা। আমি পৃথিবীর সমস্ত সাধুদিগের সঙ্গে থাকিব।"*

এই সঙ্গে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ Dr. Carl Jungএর এই কথাগুলি কেমন মিলে যায়—

"If it were permissible to personify the unconscious, we might call it a collective human being combining the characteristics of both sexes, transcending youth and age, birth and death, and from having at his command a human experience of one or two million years—almost immortal."†

যুগে যুগে যে Representative men এসেছেন, তাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বহু মহাপুরুষের চরিত্রের মিলনে সম্ভব হয়েছেন। ভবিষ্যতে যে সব মহাপুরুষের অভ্যুদয় হবে, তাঁরাও সমস্ত অতীতকে নিজের ভিতর লাভ করবেন।

একটী বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বলেছেন—

"Let many sided truth incarnate in saints and Prophets come down from heaven and dwell in you that you may have that blessed harmony of character which is eternal life and salvation."*

কেবল নিজের নিজের সাধু বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে নিলে হবে না, সকল সাধুকে নিতে হবে। তাই তিনি বললেন— নববিধান "Recognises in all prophets and saints a harmony"—স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী কথা মুছে গেল।

আচার্য্যদেব এই সত্য সাধন করার জন্যে 'সাধুসমাগম' অনুষ্ঠান করলেন। এই সাধন এক অভিনব ব্যাপার—আত্মিক তীর্থযাত্রা। শ্রীভগবানের বক্ষে এক একটী সাধুর সঙ্গে মনে ও প্রাণে, ভাবে ও চরিত্রে মিলিত হওয়া

---

* 'একে দশ' ২৩শে মাঘ ১৯৭৯ খ্রীঃ।

† 'Modern Man in Search of a Soul'—Carl Jung.

এই সাধনের মূল কথা। ১৮৮০ খৃঃ মুষা, সক্রেটিশ, শাক্য, ঋষি, খ্রীষ্ট, মোহম্মদ, চৈতন্য, বৈজ্ঞানিক—এই আটটী সমাগম হল। ধ্যান, প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতর দিয়ে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তা 'সাধুসমাগম' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়। (গ) অনুষ্ঠান, ব্রত ও নিদর্শন—ব্রহ্মানন্দের 'Diary in England', ১৫ই এপ্রিলে দেখতে পাই—"Ritualism has always excited my interest and made me anxious to examine it carefully." Symbolism ও Rituals এর তাৎপর্য্য নির্ণয় করার জন্য আজ মনস্তত্ত্ব-বিদেরা এবং নৃতত্ত্ববিদেরা কত গবেষণা করছেন। তাঁরা দেখছেন যে, এগুলি স্থূল হলেও সূক্ষ্ম ভাবের বাহন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী মূর্খ দুই শ্রেণীকেই Symbolism এবং Rituals সহজে নাড়া দিয়েছে। শিক্ষিতেরা যেমন বুদ্ধির বেড়াজালে, ভাবের স্বল্পতায় তার উপকার থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হন, অশিক্ষিতেরাও তেমনি মিথ্যা, কল্পনা ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হন। রহস্যবাদ মনে হলেও Symbols ও Rituals অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক। গোঁড়ামী ও অসত্যের জন্য স্থানীয় Symbols ও Rituals অন্যদের কাছে বিরোধের একটী মস্ত কারণ হয়েছে। একমাত্র সহানুভূতি ও সত্যদৃষ্টি স্থূলের ভিতরের সূক্ষ্মভাব, ভিন্ন ভিন্ন Symbols ও Ritualsএর অনুপ্রাণনা লাভ করতে পারে। তখন সকল মিথ্যা বিরোধের অবসান হয়। সহানুভূতি-শূন্য উদারতা আদর্শকে Abstractionএ পরিণত করে—উদারতার প্রাণবস্তু নিষ্ঠা যুক্ত না হলে আদর্শ নিষ্ফল হয়। উদারতা ও নিষ্ঠা, সত্য ও অনুষ্ঠান পূর্ণজীবনের ভিতর এবং বাহির। নববিধানের সমন্বয়দৃষ্টি একথা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, এখন আর ফাঁকি দেবার পথ নেই। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সমন্বয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করে নববিধানের নিশান তুলে ধরে বললেন—

"Before the flag of the New Dispensation, bow ye nations, and proclaim the fatherhood of God and the brotherhood of man".

নববিধানেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমন্বয় সাধনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। নববিধানেই সূক্ষ্ম এবং স্থূল, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম, অতীত এবং বর্ত্তমানের ও বিশ্বমানবের মিলনভূমি। নববিধানের নূতন সঙ্গীত গীত হল—

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল

শুনহে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার।
পাপী তরাইতে, স্বর্গ হ'তে, এসেছে ভবে এবার।
(শুন হে ও জগদ্বাসী)

অনাদি পুরুষ ব্রহ্ম, (যাঁরে দেবগণে পায় না ধ্যানে) বেদে গায় যাঁর মর্ম্ম, অতি অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, বিধির লীলা বিহার।

যুগে যুগে দেশে দেশে, তাঁহারই মঙ্গল আদেশে, কত যোগী ঋষি সাধু ভক্ত করিলেন ধর্ম্ম প্রচার। (পাপ অন্ধকার বিনাশিতে)

পুরাতন ব্রহ্মবাদী, (যত আর্য্যকুল-শিরোমণি) শিব শুক জনকাদি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, নানক, চৈতন্য প্রেমের আধার।

কবীর, শঙ্করাচার্য্য, বাসুদেব, যোগাচার্য্য, ঈশা, মহম্মদ, মুষা, শাক্য এক ভক্ত-পরিবার। (লোক-গুরু জগতের পূজ্য)

সকলেই মহামান্য, (এক ভাবের এক মহাজন) পরম ভক্তিভাজন, কিন্তু নহেন কেহ স্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যবর্ত্তী অবতার)

এক হরি পরিত্রাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পাতা, নিত্য জাগ্রত বিশ্ববিধাতা সর্ব্বশক্তি মূলাধার। (অদ্বিতীয় রাজরাজেশ্বর)

হস্তপদদেহশূন্য, (বাঁকা মনের অগোচর) অখণ্ড জ্ঞান চৈতন্য, প্রেম পুণ্যের সুন্দর দেবতা অপরূপ নিরাকার।

নাহি রূপ রস গন্ধ, অরূপ সচ্চিদানন্দ, দেখরে হৃদয়-ধামে প্রেমনয়নে মনোহর রূপ তাঁহার। (ভক্তিযোগানন্দে মগ্ন হ'য়ে)

অসীম তাঁহার দয়া, সকলে দেয় পদচ্ছায়া, যার আছে ভক্তি পা'বে মুক্তি, নাহি কোন জাতিবিচার।

সেই নিরাকার হরি, এসেছেন দয়া করি, ভক্তি উপহারে পূজ্‌লে তাঁ'রে হইবে সবে উদ্ধার।

বিশ্বাসে দর্শন পা'বে (দেখে শুনে প্রাণ শীতল হ'বে) বিবেকে কথা শুনিবে, নিত্য পূজা প্রার্থনায় ঘুচিবে পাপ কল্পনা বিকার।

হইবে ব্রহ্মবাদিনী, যতেক কুলকামিনী, এই দেবতার ঘরে ঘরে দিবে প্রেম-উপহার।

ভ্রাতৃভাবে নিরখিবে, (হিংসা দ্বেষ নিন্দা পরিহরি) সকল জাতি মানবে পরসেবা-ব্রতে হ'য়ে সুখী প্রেমেতে দিবে সাঁতার।

ত্যজি জ্ঞান অভিমান, হইবে তৃণসমান, বিনয় ভক্তিতে করিবে রে ভাই স্বর্গরাজ্য অধিকার।

নাহি মূর্ত্তিপূজা বিধি, বনবাস সন্ন্যাসাদি, যোগ-সাধনবলে জীবন্মুক্তি তপোবন হয় এ সংসার।

অনুতাপ পাপের দণ্ড, সর্ব্বদোষ করে খণ্ড, ব্রহ্মসহবাস স্বর্গ ইহ-পরকাল একাকার।

হরি বেদ বিধি মন্ত্র, গুরু জ্ঞান শাস্ত্র তন্ত্র, হরি পিতা মাতা অন্নদাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।

এই সুসংবাদ দিতে, হরিভক্তি প্রচারিতে, প্রভুর আদেশে এসেছিরে ভাই তোদের দ্বার॥

—ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল

ভৈরবী—পোস্ত

করহে নববিধান মূর্ত্তিমান্ এ জীবনে।
যোগভক্তি কর্ম জ্ঞান সবাকার সম্মিলনে।
সক্রেটিশের আত্মজ্ঞান, ঋষিদের যোগধ্যান,
মুষার বিবেকনীতি, যাচি তব শ্রীচরণে।
ঈশার অভেদভাব, চৈতন্যের মহাভাব,
শাক্যের নির্ব্বাণ দয়া, দাও দীন অকিঞ্চনে।
মহম্মদের নিষ্ঠারতি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি,
জনকের অনাসক্তি সঞ্চার হৃদয় মনে॥

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

নববিধানের সমন্বয় সাধনা একটী ছাঁচে ঢালা মতবাদ বা বুদ্ধি দিয়ে গড়া সাধন পদ্ধতি নয়। নববিধানে নূতন মানুষের

ভিতর দূরদূরান্তরের মানুষেরা নিজের মনের মানুষকেই পেয়েছে, অখণ্ড পরিবার যে সত্য বুঝতে পেরেছে। Landmark হিসাবে একটী একটী বিশেষ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে ধরে বিবর্ত্তনের ছবিটী আঁকা হল। ঐ সমন্বয় ধর্ম্ম কোন অনাদিকালে বিধাতার হাতে নবশিশুর মতন জন্ম নিয়ে মাতৃদুগ্ধে বড় হয়ে উঠছে। তাকে আচার্য্য কেশবচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন এবং সদলে তার সাধন করে যা দিয়ে গেছেন, তা যাবে কোথায়? তাই এখন চতুর্দ্দিকে আকার নিচ্চে। আশানেত্রে সে দিকে তাকিয়েই একদিন আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলেছিলেন—

"When all nations and countries will thus eat and absorb each other's goodness and purity, then shall the inward kingdom of heaven be realized on earth, which ancient prophets sang and predicted. All truth shall then be harmonized and reduced to a beautiful subjective synthesis in the life of humanity. No longer do you see jealousies and enmities dividing the world. The battle-cry is hushed and the sword of sectarian hate has found rest in the sheath. No longer do we see scriptures arrayed against scriptures, churches against churches, sects against sects—endless group of fighting zealots. It is one undivided spirit-world, in which there is neither caste nor sect nor nationality. This is heaven indeed."

নববিধান সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম

নব অধ্যয়নের পরিবেশে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাধক-মণ্ডলী ও পার্শ্ববর্ত্তী মনীষীরা বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক রচনা করেন, তার পরিচয়, সঙ্কলন ও রচয়িতাদের কথা এই অধ্যায়ে দেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন পরিষদের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করা হল না। নব অধ্যয়নে বিজ্ঞান-সম্মত সকল গবেষণার প্রতিই দৃষ্টি ছিল, কিন্তু নব অধ্যয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল, জীবন দিয়ে জীবনের অধ্যয়ন ও তার ভিতর যাকিছু জীবনপ্রদ (Spark of life), তার সঙ্গে পরিচয়। নববিধান সাহিত্যে জীবনের গতির ছবি আমরা দেখতে পাই।

নববিধান সাহিত্যকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ, বক্তৃতা (২) ব্রহ্মসঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, নাটক, স্তোত্র (৩) সমন্বয়ভাষ্যমালা, ভক্তচরিতমালা (৪) আত্মজীবনী ও সাক্ষ্যদান।

সমন্বয়ভাষ্যমালা ও ভক্ত-চরিতমালার অন্তর্গত বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক বইগুলির ভিতর আচার্য্য কেশবচন্দ্রের 'শাক্যসমাগম', সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব' ও চিরঞ্জীব শর্ম্মার (ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যালের) কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত, কেবল নববিধান সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ঐ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। তার আগে ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক রহস্য' বইটীতে দু একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু শাক্যমুনির সমগ্র জীবন-চরিত ও ভাষ্য লিখিত হয়নি। তখন এদেশে বৌদ্ধ ছিলেন না, 'মহাবোধি সোসাইটী', 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভা', 'বৌদ্ধ সাহিত্য-সভা'র জন্ম হয় নি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালির চর্চ্চা আরম্ভ হয়নি। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহসাধকেরা

ব্রহ্মোপাসনার ভিতর এই হারানো সম্পদ উদ্ধার ক'রে জগদ্-বাসীকে দিয়ে গেলেন। নববিধানের ব্রহ্মোপাসনার ভিতরেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত Spiritual Rebirth বা পুনরাবিষ্কার হল। এর ভিতর Political, Academic বা Sectarian ভাবের লেশ মাত্র নাই। তাঁদের ভিতর সমানে সেই সাধন চলে এসেছে ও তার প্রভাবে চারিদিকে নূতন চিন্তা ও রচনা দেখা দিয়েছে। শাক্যমুনি—"ভেদাভেদ বিনাশ করে, একাকার নিরাকার ধর্ম্মের" সন্ধান দিয়ে বিভিন্ন দেশবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন মতবাদী মানুষদের শুদ্ধ-জ্ঞান-নীতির ধর্ম্মে মিলিত করে শান্তির সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন; আবার নববিধানের বৈচিত্রময়-অখণ্ড-ধর্ম্মের ভিতর শাক্যমুনির সেই নূতন প্রকাশে ধর্ম্ম, অহঙ্কার ও হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে নির্ব্বাণ, ঐক্য ও বিশ্বশান্তির পথ নির্দেশ ক'রছে। কবির সঙ্গে বলি—

"নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী।"

কয়েকটী বই—

১। ১৮৭১-৮০খৃঃ—"শাক্য-সমাগম', অন্যান্য উপদেশ ও পত্রিকা—আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

২। ১৮৮১খৃঃ— 'শাক্য-মুনি চরিত ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব'—সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রণীত ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় সম্পাদিত।

৩। ১৮৮০খৃঃ— 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন'—(চিরঞ্জীব প্রভৃতি)

৪। ১৮৮৬খৃঃ— 'শ্লোক-সংগ্রহ'—তৃতীয় সংস্করণ

৫। ১৮৮২খৃঃ— 'Faith and Progress of the Brahmo Samaj'—by Protap Chunder Mozoomdar.
১৮৯৩খৃঃ— 'Lowell Lectures'— Do

৬। ১৮৭৫-৯০খৃঃ—'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ'—কবিরাজ কালিশঙ্কর দাস প্রণীত।

৭। ১৮৮৩ খৃঃ— ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়’
২য় ভাগ—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

৮। ১৮৮২-৯১ খৃঃ— Articles in the *Liberal*,
on Buddhism—
by Krishna Bihari Sen, M. A.

১৮৯২ খৃঃ—‘অশোক-চরিত’ (গদ্য পুস্তক ও নাটিকা)—
শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।

১৮৯৪-৯৫ খৃঃ—‘বুদ্ধ-চরিত’ (প্রবন্ধ)—ঐ

১৮৯৬ খৃঃ— ‘নববিধান কি?’—ঐ

৯। ১৮৮৩ খৃঃ— ‘বুদ্ধদেবচরিত ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত
বিবরণ’—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত।

১০। ১৮৮৫ খৃঃ— ‘বুদ্ধদেবচরিত’ (নাট্য)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১। ১৮৯৫ খৃঃ— ‘অমিতাভ’ (কাব্য)—কবি নবীনচন্দ্র সেন

১২। ১৮৯৯ খৃঃ— ‘বৌদ্ধধর্ম্ম’— অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ
সেন, এম্, এ, বিবৃত।

১৯০০ খৃঃ— ‘Intellectual Ideal’— ঐ

১৯১০ খৃঃ— ‘আরতি’—নবব্রহ্মবিদ্যা—ঐ

১৩। ১৮৯৩-১৯০২ খৃঃ—স্বামী বিবেকানন্দের বিবৃতি।

১৪। ১৯০০-১৯১১ খৃঃ—ভগিনী নিবেদিতার বিবৃতি।

১৫। ১৮৯৯ খৃঃ— ‘আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-
প্রতিঘাত ও সংঘাত’—
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবৃত।

১৬। ১৯০০ খৃঃ— ‘বৌদ্ধধর্ম্ম’— শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ
ঠাকুর, আই সি এস্ প্রণীত।

১৭। ১৯০০ খৃঃ— ‘শঙ্কর ও শাক্যমুনি—
শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ বিবৃত।

১৮। ১৯০৯ খৃঃ— ‘মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র’ (অনুবাদ)—
ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী।

১৯০১ খৃঃ— ‘বুদ্ধদেবের স্থান’—ঐ

১৯। ১৯০৬-১০ খৃঃ—'বৌদ্ধধৰ্ম্ম ও নির্ব্বাণধৰ্ম্ম'—
শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন, এম, এ, বিবৃত।

২০। ১৯১৭ খৃঃ— 'বৌদ্ধধৰ্ম্ম ও নববিধান'—
ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, এম্, বি, বিবৃত।

১৯৩০ খৃঃ— 'Buddhism and Navavidhan' (English translation of the above *vide*: 'The Fragments in the Exposition of Navavidhan', later 'Synthesis of Religions—A New Exposition') by Dr. B. C. Ghosh

২১। ১৯২৯ খৃঃ— 'The Life of Princess Yashodara'—
by Sunity Devee, C. I., Dowager Maharani of Cooch Behar.

২২। ১৯৩৩ খৃঃ— 'সর্ব্বধৰ্ম্ম-সমন্বয়'—
অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত, এম্, এ, প্রণীত।

২৩। ১৯৪২ খৃঃ— 'উপনিষদের সাধন-পথ ও কেশব'—
অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রণীত।

২৪। ১৮৯১-১৯৩৩ খৃঃ— ধৰ্ম্মপাল ও 'মহাবোধি সোসাইটী'।

২৫। ১৮৯১-১৯৪১ খৃঃ— রবীন্দ্রনাথ ও 'বিশ্বভারতী'

২৬। ১৯০৬-২৪ খৃঃ— স্যার আশুতোষ ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'।

২৭। ১৯১৭-৪৭ খৃঃ— মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীন ভারত

নববিধান সাহিত্য সঙ্কলন
ও
লেখকদের পরিচয়

১। 'শাক্য-সমাগম'(১৮৮০খৃঃ)—সমন্বয়-ধর্ম্ম-সাধন এক অভিনব ব্যাপার। এই জন্য ব্রহ্মানন্দ বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের ভিতর 'সাধু-সমাগমের'* প্রবর্ত্তন করেন। তার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে। 'সাধু-সমাগমের' তিনমাস আগে তাঁরা বুদ্ধগয়ায় যান, সেখানে বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যান ও প্রার্থনা করেন এবং ফিরবার সময় সেখান থেকে 'বৃক্ষখণ্ড ও প্রস্তর খোদিত শাক্যমূর্ত্তি' সংগ্রহ করে আনেন। বুদ্ধগয়ায় বোধি-বৃক্ষমূলে আচার্য্যদেব যে প্রার্থনা করেন†, তাতে বলেন—

"হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় পঁচিশ শত বৎসর অতীত হইল, এই বৃক্ষতলে তুমি মহাত্মা শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য, যোগ এবং জীবে দয়া শিক্ষা দিয়াছিলে। তাঁহার জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার অনাসক্ত আত্মা আজ আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছে—'তোমরাও বৈরাগী হও'। তাঁহার জীবন্ত গম্ভীর বাক্যে আমাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধান চলিয়া গেল। এখন আমরা বুদ্ধদেবের আত্মাকে নিকটে দেখিতেছি। বৈরাগীর বন্ধু, সন্ন্যাসীদিগের মাতা, সেই জগজ্জননী তাঁহার পুত্র শাক্যমুনিকে ক্রোড়ে করিয়া এখানে বসিয়া আছেন। হে জননী, আজ তোমার নিকট বিশেষরূপে বৈরাগ্য ভিক্ষা করিতেছি। যে তুমি শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের এই হীন· মলিন নীচাসক্ত মনগুলিকে জিতেন্দ্রিয় এবং প্রমত্ত

* 'সাধু-সমাগম' (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খৃঃ)

† 'আচার্য্যের উপদেশ' দশমখণ্ড ; ১৫ই নভেম্বর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের উপদেশ।

বৈরাগী করিয়া লও। আর যেন আমরা সংসারের মায়ায় ভুলিয়া, হে বৈরাগীদিগের জননী, তোমাকে ভুলিয়া না যাই।"

বুদ্ধগয়ায় যাবার আগেই নব অধ্যয়ন আরম্ভ হয়েছিল—আচার্য্যদেব ২৩শে ভাদ্র, ১৮৭৯খৃঃ চারজন সাধককে—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মুসলমান—এই চারটী ধর্ম্মের শাস্ত্রের অধ্যেতা ব্রত দেন। বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে এসে ফাল্গুন মাসে 'সাধুসমাগম' বা আধ্যাত্মিক 'তীর্থযাত্রা' আরম্ভ হয় প্রত্যেক সমাগমের আগে প্রার্থনা যোগে সেই সেই সাধুর সঙ্গে যোগবলে দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করে একাত্মতা সাধন করেন—এক একটী সাধুর জীবনরূপ মহাতীর্থে উপস্থিত হয়ে, ঐ তীর্থের পবিত্র আলোকে, পবিত্র বাতাসে, পবিত্র স্পর্শে সম্পূর্ণভাবে সেই সাধুজীবন লাভ না করলেও কতকাংশে লাভ করে নবজীবন প্রাপ্ত হন। এ কেবল সাধুদের ভক্তি করা নয়, ইচ্ছা ও ভাবযোগে নিজ নিজ স্বভাবে ও চরিত্রে তাঁদের লাভ করা। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সাধুসমাগম অনুষ্ঠানে যে আটটী সমাগম সাধন করেন, 'শাক্যসমাগম' তার ভিতর তৃতীয়। 'শাক্যসমাগমের' দিনে "উপাসকগণ একত্র হইলেন, সঙ্গীত ও প্রার্থনার পরে উপরে গেলেন এবং দ্বারদেশে ভক্তি-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। আরাধনা ও ধ্যানের পর কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করেন",* ঐ প্রার্থনার কয়েকটী অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"হে প্রাচীন পরমাত্মন্, যুগের উপর আরোহণ করিয়া তুমি অপর যুগে চলিয়া যাইতেছ। তোমার এক চরণ একযুগের উপর, আর এক চরণ অপর যুগের উপর। তোমার এক হস্ত বুদ্ধের মস্তকের উপর, আর এক হস্ত এই আড়াই হাজার বৎসর পর আমাদিগের মস্তকের উপর। তোমার পদতলস্থ শাক্যকে এই ভবভয়ে ভীত, পাপভয়ে ভীত নরনারীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে বল।"

"যদিও বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু হিন্দুস্থান তাঁহার হইল না। ...বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে, বুদ্ধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি

---

* 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত।

লোক দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু বীরপুরুষ বুদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন—'আমি বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাতি-ভেদ মানি না'। বুদ্ধের আন্দোলনে হিন্দুস্থান টলমল্ করিতে লাগিল। গৌতমের ধর্ম্ম ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া সমস্ত একাকার নিরাকার করিল। ···হে ঈশ্বর, তুমি যখনই নূতন বিধান স্থাপন কর, তখনই তোমার মনোনীতদিগকে পুরাতন হইতে বাহির কর। শাক্যদেবের নূতন বিধান নূতন সেনাপতি লইয়া প্রবল বেগে চলিয়া গেল। তিনি চিন্তা এবং ধ্যানের বলে অভিমান উড়াইয়া দিলেন। অথচ তিনি বলিলেন, মনুষ্যের কাছে মাথা হেঁট করিব না, ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত, বেদের অতীত পরাবিদ্যা শিখিব। বুদ্ধ, নিজের বুদ্ধি-প্রভাবে নিমীলিত নয়নে যে রাজ্য দেখা যায়, সেই রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৌদ্ধ-জাতি, জ্ঞানীর জাতি, বৈরাগীর জাতি গঠন করিলেন। ···একদিকে পুরোহিত এবং পুরাতন শাস্ত্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া, মনুষ্যের একজাতিত্ব প্রমাণ করিয়া উদারতা শিক্ষা দিলেন, অন্যদিকে কিসে জীবের দুঃখ যায়, এই চিন্তা করিয়া এক নূতন বুদ্ধির পথ, নূতন জ্ঞান, নূতন চৈতন্যের পথ প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বাণ-সমাধিযোগে ডুবিতে ডুবিতে তিনি দেখিলেন, একস্থানে এমন অবস্থা আছে, যেখানে দুঃখ নাই। সেই অবস্থা নির্ব্বাণের অবস্থা, সেই পথ নিবৃত্তির পথ। তিনি দেখিলেন, জীবের মনে বাসনার আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন ইত্যাদি নানা প্রকার আগুন জ্বলিতেছে; শান্তিজল ঢালিয়া এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেই জীবের দুঃখ দূর হয়। ···যাহাতে জগৎ তরিবে, মানুষের গতি হইবে, তিনি সেই নির্ব্বাণ-পথ আবিষ্কার করিলেন। আমরা আজ তাঁহার কাছে ভিখারী হইয়া, দাস হইয়া আসিয়াছি।

"হে ঈশ্বর, ঐ তিনি তোমার বক্ষের মধ্যে চক্ষু নিমীলন করিয়া, দুই সহস্রাধিক বৎসর সমাধিযোগে মগ্ন রহিয়াছেন; ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি গভীরতর হইয়া আসিয়াছে।···যদিও তিনি মুখে বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবন বলিতেছে—'আয় আয়,

দুঃখদগ্ধ জীব, আয়, আয়, শোকভারে ভগ্ন জীব …আমি নির্ব্বাণ-জলে সকলকে শীতল করিব। এই নির্ব্বাণ কথাটী আড়াই হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে।…তিনি বলিলেন না, 'আমি ধর্ম্ম দিব, পুণ্য দিব'। কিন্তু তিনি বলিলেন, 'তোরা কাঁদিতেছিস্, তোদের অশ্রু মুছাইয়া দিব।'

"বিশ্বজননী যখন তোমাকে সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতরে এমন কি পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে? …তুমি জননীর নিকট কি গূঢ়মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছিলে?

"হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে নির্ব্বিকার হরি কি অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জন সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিলে? …এমন দুঃখ দরিদ্রতার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিলে, অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণরত্ন পাইবার জন্য, তুমি রাজত্ব, স্ত্রী পুত্রাদি সর্বস্ব ছাড়িলে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন। পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া, সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে পার। এইজন্য স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, ধর্ম্মরাজ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিল, তোমার স্বর্গের পিতা তোমাকে গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন। তোমার উচ্চ বৈরাগ্য এবং গভীর ধ্যানের কথা শুনিয়া পৃথিবীর বড় বড় রাজারা বলিল, 'আমরা এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব'। কোথায় তিব্বত, কোথায় চীনদেশ, কোথায় ব্রহ্মরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হে গৌতম, তুমি এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছ। তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ব্বাণের পথ, জীবে দয়া দেখাইয়াছ।

"পুরাতন মৃত পুস্তকের বিদ্যাভিমানী হইয়া আমাদিগের বুদ্ধি খুলিল না। এই বিদ্যাভিমানের পদতলে পড়িয়া প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দৈববাণী শুনিতে পাই না। ···বুদ্ধের আত্মা শত শত বৎসর পর এখনও বলিতেছেন, 'ওরে এখনও আমি আছি; আমি বাহিরের বেদবেদান্ত মানিনা; আমি নূতন বিধান স্থাপন করিয়াছি। আবার তোরা বাহিরের বিদ্যামদে মত্ত হইয়াছিস্, আবার আমার উপরে নির্য্যাতন?' এইরূপে তাঁহার গম্ভীর আত্মা বিদ্যামদরূপ অসুর বিনাশ করিতেছে। বুদ্ধদেব উঠিতেছেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠি। উঠিয়া, জননি, যেখানে জড়ের প্রভুত্ব নাই, জ্ঞান, পৌরোহিত্যের অভিমান নাই, তোমার আজ্ঞানুসারে সেখানে শাক্যের নির্ব্বাণ-মন্ত্র সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

"বিশ্বজননি, তোমার যোগীকে তুমি কোলে করিয়া আমাদের নিকট বসিয়া আছ। তোমার যোগী আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন না; উনি কেবল উঁহার গম্ভীর যোগ সমাধির অবস্থা দেখাইলেন। ···মা, তুমি ত বৈরাগ্য দ্বারা উঁহাকে জিতেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছ, আমাদিগেরও কিছু উপায় কর। ···তুমি আশীর্ব্বাদ কর, উঁহার গায়ের পবিত্র বৈরাগ্য বাতাস আমাদের গায়ে লাগুক।

"মা, নির্ব্বাণ-রাজ্য আসিতেছে। তোমার সুপুত্র শাক্যসিংহকে পাঠাইয়াছ · যে শাক্যকে গ্রহণ করে, তাহার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়। হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শাক্যের বন্ধু এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করিয়া দেও। ···হে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের বৈরাগ্য-বিহীন মস্তকের উপরে তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর; ঐ চরণ-স্পর্শে আমরা সকল লালসা ছাড়িয়া, সকল দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত আমরা তোমাকে বার-বার প্রণাম করি।"

সাধুজীবনের আলোয় অপূর্ব্ব সুর ঝঙ্কৃত হল—

আজ আলোকের এই ঝরণা-ধারায়
ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা
ধূলায় ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যে-জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে,
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে
তা'র কপালে,
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও!

সেই নূতন সুরেই আচার্য্যদেব যোগশিক্ষার্থীকে নূতন করে বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও যোগের সম্বন্ধ দেখাইয়া দিলেন—

"হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি যে যোগধন লাভ করিবে, তাহার উপায় কি? কোন্ পথে গেলে যোগরত্ন পাইবে? উদ্দেশ্য তোমার যোগ, উপায় তোমার নির্ব্বাণ। পরপারে যোগ, এপারে সংসার, মধ্যে নির্ব্বাণ-সমুদ্র। ...বিয়োগ প্রথমে, যোগ পরে। মৃত্যু আগে, দ্বিতীয় জীবন পরে। ...নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন কর।...আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কার্য্য, চিন্তা এসমুদায় হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার হইতে মনের সমস্ত অনুরাগ স্নেহকে নিবৃত্ত কর। ...প্রিয়, অপ্রিয় মনে কাহাকেও স্থান দিবে না। উপেক্ষার পথ মধ্যবর্ত্তী। নিরপেক্ষ হওয়া চাই।... যিনি চুপ করিয়া থাকেন, তিনি অনেক কার্য্য করেন। রাগ আসিবে না, সুতরাং ক্ষমাও আসিবে না। ধনী হইবে না, আপনাকে নির্ধনও মনে করিবে না। ...সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ, আংশিক নহে। একেবারে মনকে খালি করিয়া ফেলিবে। ...শূন্য মন কি, তাহা ভাব। পূর্ণ মন ভাবিও না। জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব। প্রতিজ্ঞা কর, কোন ভাবনাকে মনে আসিতে দিব না। যথার্থ, বৌদ্ধ-জীবন ধারণ কর। ...যদি 'ঈশ্বর আছেন' যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তবে 'আমি নাই' ইহা সিদ্ধান্ত কর। 'আমি'

গেলে আর পাপ প্রলোভনের সম্ভাবনা থাকিবে না। কেন না প্রলোভন যাহাকে আকর্ষণ করিবে, সে নাই। আমি-রূপ মূল কাট। ···এই গৌতমের জীবন, এই শান্তি, এই নির্ব্বাণ, এই পূর্ণ নিবৃত্তি। ···যদি 'আমি' না মরিয়া থাকে তবে যোগপথে দ্রুতগামী হইও না।"*

আচার্য্যদেবের 'যোগানন্দ' উপদেশটীতে ঐ সুরই শুনতে পাই—

"যদি ধ্যানের সুখভোগ করিবার স্পৃহা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধ-আত্মাকে আহ্বান কর, অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধের নির্ব্বাণ পথ ধারণ কর। ···মনুষ্যের শরীরের ভিতর কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নরকের আগুন জ্বলিতেছে, এ সকল আগুন যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ কিরূপে ব্রহ্মরূপ দেখিতে পাইবে? এ সকল আগুন নির্ব্বাণ না হইলে, কোন মতেই শান্তি লাভ করা যায় না এবং শান্ত-চিত্ত না হইলে ধ্যান হয়না। এইজন্য সুচতুর বুদ্ধ নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের লক্ষ্য নির্ব্বাণ এবং বৈকুণ্ঠের পথও নির্ব্বাণ। এই এক নির্ব্বাণ কথাতে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত। ···যিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে একবার নির্ব্বাণ-সমুদ্রে ডুব দিতেই হইবে। নির্ব্বাণ ভিন্ন গভীর সমাধি ও ধ্যান-যোগ অসম্ভব।··· নির্ব্বাণের অবস্থায় ভাল মন্দ কিছুই থাকেনা। নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থায় অভাবপক্ষ সাধন। পরে ভাবপক্ষ সাধন। ···শূন্যের পরে ব্রহ্মবস্তু দেখা যায়।

"যখন এইরূপে মন নির্ব্বাণ লাভ করে তখন একটী সম্পূর্ণ নূতন রাজ্য প্রকাশিত হয়। নির্ব্বাণে 'না' সাধন শেষ হইলে, অভাবপক্ষ সাধন শেষ হইল, এখন ভাবপক্ষের সাধন আরম্ভ হইল। ···নির্ব্বাণ-সরোবরে ডুব দিয়া যাহারা যোগ-রাজ্যে গমন করে, তাহারা পরলোকগত মহাত্মাদিগের অব্যবহিত নৈকট্য অনুভব করে। যোগরাজ্যে দেশ-ভেদ জাতিভেদ নাই। যখন জড়রাজ্য ছাড়িয়া চিন্ময় হইয়া আধ্যাত্মিক লোকে গমন করি, তখন সমুদয়

* 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ'—১৯শে আগষ্ট ১৮৮০ খ্রীঃ উপদেশ।

অশরীরী আত্মা ঈশ্বরেতে সংযুক্ত দেখিতে পাই। ...যখনই তুমি সেই রাজ্যে গিয়া সেই রাজ্যের ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলে, তিনি তোমাকে আপনার বাগানের নানা প্রকার প্রেম ও পুণ্যফুলে সাজাইতে লাগিলেন। সেখানে বসিয়া পরলোকবাসী ভক্তদিগের সঙ্গে সহজে একাত্মা হইয়া যাইবে; সেখানে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা শুনিতে লাগিলে। এক একবার তাঁহার উৎসাহের কথা শুনিয়া মৃত জীবনে নবজীবনের সঞ্চার হইতে দেখিলে। সমস্ত জীবন কখন কি করিবে, সেই স্বর্গের পরমবন্ধুর নিকট সমুদয় জানিলে।"*

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধ্যানের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বলা দরকার। বৌদ্ধধ্যানের প্রথম কথা বৈরাগ্য। বৌদ্ধ-ধ্যানের প্রতিস্তরে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ভারতীয় সাধনার প্রাণ। ধন-মান-সুখ-লালসা, আমিত্ব-মমত্ব-চিন্তা আমাদের চিত্তকে সমস্তক্ষণই অস্থির করছে। তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখাই হল বৈরাগ্য। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের সাধনায় বৈরাগ্য প্রবল। তাঁদের বৈরাগ্য ছিল 'স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং'। তাঁদের বৈরাগ্য নিয়ে কথা উঠেছিল যে—'বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে—আবার এসব কি? Plain living, high thinking হলেই তো হল।' ব্রহ্মানন্দ তাঁর এক বিদেশী বন্ধুকে এ বিষয়ে যে উত্তর দেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"It (asceticism) is needed. That is my explanation. Providence has pointed out this remedy for many of the besetting evils of the Samaj in these days. ......This, however, I will not conceal from you, I love and wish to encourage asceticism. But my asceticism is not what is ordinarily accepted as such." †

* 'সেবকের নিবেদন'—১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮০ খ্রীঃ উপদেশ।

† *Vide* **'The Brahmo Year Book' (1877).**

শ্রীকেশবচন্দ্র সত্য, পবিত্রতা ও প্রেমের উপর বৈরাগ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সময়ের ব্রাহ্ম-সত্যবাদিতা, ব্রাহ্ম-সংযম, ব্রাহ্ম-বিশুদ্ধভাবের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ—তার বলেই তাঁরা শাস্ত্রের অভ্রান্তবাদ, বেদ ও ব্রাহ্মণের অধীনতা, আচার বিচারের বাড়াবাড়ি, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধনী দরিদ্র ও স্ত্রী পুরুষের অধিকার-ভেদ প্রভৃতিকে অতি সহজে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন। তার ফলে বিপ্লব এসে সমগ্র দেশকে নূতন জীবনীশক্তি দিয়ে যায় ডাঃ কে, টি, সাহ আগেই লিখে গেছেন—*

"Rebels, of course, there always will be, as well as protestants. Saints and seers have, in the past,—from Mahavira and Buddha to Nanak, Kabir and Keshub Chander Sen more than once attempted to eradicate the very principle of caste," (P. 196)

'The Heart of Aryavarta,'র রচয়িতা Marquis of Zetland কে, টি, সাহের বইটির ভূমিকায় এই কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই জন্যেই বৌদ্ধদের মতন তাঁদেরও বিধর্ম্মী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল—সে ভাব এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। স্যার যদুনাথ ব্রহ্মানন্দের কথা যা বলেছেন, তা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি। ডাঃ কালিদাস নাগ বলেছেন—Keshub Chunder Sen was a social prophet — এই সব কথার তাৎপর্য্য বোঝার সময় এসেছে।

সত্য, পবিত্রতা ও প্রেম যেমন একদিকে সমাজ-জীবনকে, অধিকার করে, তেমনি তাঁদের অধ্যাত্মজীবনেও ঐ সত্য, পবিত্রতা এবং প্রেমই কঠোর বৈরাগ্যের রূপ নেয় ও

---

* *Vide* The Splendour That Was Ind— A Survey of Indian Culture and Civilisation (From the Earliest Times to the Death of Emperor Aurangzeb)—K. T. Shah, B. A., B. Sc (London) Bar-at-Law. (1930)

ব্রহ্মোপাসনার ভিতর ফুটে ওঠে। ব্রহ্মোপাসনার একটী অঙ্গ হল ধ্যান। সাধারণত ধ্যান বলতে আমরা ঈশ্বর-ধ্যান ও ভগবৎ-চিন্তা বুঝি। পাশ্চাত্য সাধকদের meditation আরেক রকম। বৌদ্ধধ্যান আর্য্যসত্য চিন্তা বুঝায়। বৌদ্ধধ্যান থেকে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। Dr. Suzuki-যুগল, Dr. Takakusu প্রভৃতির গবেষণা এবং পাশ্চাত্য সাধকদের রচনা আজকাল এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ১৮৭১ খৃঃ থেকে ধ্যানের উপর জোর দিয়েছিলেন। ব্রহ্মোপাসনার ধ্যানের ভিতর বৌদ্ধধ্যান ও ভারতীয় ধ্যানই নূতন রূপ লাভ করেছে।

বৌদ্ধধ্যান—বৈরাগ্যের ভিতর চিত্ত শান্ত হয় এবং এক উচ্চ জগৎ প্রকাশিত হয়, সেই হল ধ্যানের আরম্ভ। বৌদ্ধ সাধনায় যে 'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বুদ্ধদেব দিয়ে গেছেন, তার প্রথম সাতটী মার্গ—নির্ব্বাণের পথে নিয়ে যায়—তারপব অষ্টম মার্গ হল সম্যক্ সমাধি বা চারি স্তরের ধ্যান। প্রথম সাতটী মার্গকে বলা হয়েছে—'সপ্ত সমাধি পরিক্খার' অর্থাৎ তারা সমাধির জন্য পথ পরিষ্কার করে। এগুলি পথ মাত্র, লক্ষ্য নয়। পথ হল বাসনা সংহার, প্রজ্ঞা ও ধ্যানে চিত্তকে বশীভূত করা, লক্ষ্য হল বুদ্ধত্ব বা আলোক লাভ।

এই আটটী মার্গে ধাপে ধাপে কি ভাবে নির্ব্বাণ লাভ ও প্রজ্ঞা লাভ করা হয়, দেখা যাক্। (১) সম্যক্ দৃষ্টি অর্থাৎ দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, দুঃখের নিরোধ কি, দুঃখের নিরোধ কি প্রকারে হয়, সেই চিন্তা; (২) সম্যক্ সঙ্কল্প অর্থাৎ নিষ্কাম ভাব, অবিদ্বেষ ভাব, অহিংসা বিষয়ে সঙ্কল্প; (৩) সম্যক্ বাক্ অর্থাৎ অসত্য কথা, রূঢ় কথা, কুৎসা, অসার কথা না বলা; (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত অর্থাৎ প্রাণ বিনাশ না করা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, কামভোগ থেকে বিরত থাকা; (৫) সম্যক্ আজীব অর্থাৎ অন্যায় উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন না করা, ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা;

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম অর্থাৎ যাতে প্রাণে পাপ ও অহিত চেষ্টা না আসে, তার জন্মে চেষ্টা করা, যে সব পাপ ও অহিত চেষ্টা এসেছে, তা দূর করার চেষ্টা, যে সমস্ত হিত চেষ্টা আসেনি, তা আনার চেষ্টা, যে সমস্ত হিত চেষ্টা এসেছে, তা রাখবার চেষ্টা ; (৭) সম্যক্ স্মৃতি অর্থাৎ সব সময়ে, সব অবস্থায় দেহ মনের সব বিষয়ে স্মৃতিমান থাকা ও যে সত্য পেয়েছি, তাকে না ভোলা। আর কয়েকটী গূঢ় বিষয়ে স্মৃতিমান থাকা, যথা ঃ—পঞ্চনীবরণ (কাম, দেহ মনের আলস্য, ঔদ্ধত্য, কুকর্ম্ম-পরায়ণতা, সন্দেহ করা) ; পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ; ছয় আয়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন); সপ্ত বোধ্যঙ্গ (স্মৃতি, ধর্ম্মানু-সন্ধান, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশান্তভাব, সমাধি, উপেক্ষা) ; চারি সত্য (দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়) ; (৮) সম্যক্ সমাধি—আগে যে সব অভ্যাসের কথা হল, সব যে একেবারে হয়ে যায় তা নয়, তবে পথে চলার আরম্ভ হয়। তখন সমস্ত ক্রিয়া এক সঙ্গে চলতে থাকে, কোনটা বেশী, কোনটা কম। ক্রমশঃ যে অবস্থা আসে, তাকে 'দশশৃঙ্খল মুক্ত' হওয়া বলা হয়েছে। ঐ দশটী শৃঙ্খল হল—(১) আমি আমার বোধ, (২) বুদ্ধ বাণীতে অবিশ্বাস, (৩) সারহীন বাহ্যিক আচার বিচার অনুসরণ, (৪) সাংসারিক বস্তুতে লোভ, (৫) হিংসা, (৬) পার্থিব জীবনে অন্ধ আসক্তি, (৭) ইন্দ্রিয়আসক্তি, (৮) অহঙ্কার, (৯) ঔদ্ধত্য, (১০) সত্য জ্ঞানের অভাব। এই সব থেকে মুক্ত হলে তবে ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন—"প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান যার নাই, তার ধ্যানও নাই, ধ্যান যার নাই, তার প্রজ্ঞাও নাই। ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যার আছে, সে নির্ব্বাণের নিকটে আছে" অর্থাৎ ধ্যান ও প্রজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে চলে।

'অঙ্গুত্তর নিকায়ে' চারি ধ্যানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্যানের কয়টি ভাব হল, বিতর্কপূর্ণ, বিচার-পূর্ণ, বিবেকজ, প্রীতি-সুখ-পূর্ণ, একাগ্রতাময়। প্রথম ধ্যানে

বিতর্ক ও বিচার প্রধান। 'বিশুদ্ধি মাগ্‌গে' বলা হয়েছে যে, ঘুড়ি ওড়াবার সময় প্রথম যখন ঘুড়িটাকে আকাশে ছাড়া হয় তখন তা ডানা নেড়ে নেড়ে চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায়, এই হল বিতর্কের অবস্থা। কিন্তু পরে অনেক উচুঁতে উঠে গেলে সেই ঘুড়িই স্থির নিশ্চল ভাবে আকাশে বিরাজ করে, এই হল বিচারের অবস্থা।৮- তারপর চিত্ত-চাঞ্চল্য-মুক্ত হলে সাধক স্থির, শান্ত, সমাহিত ভাবে দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ করেন। তখন প্রধানত প্রীতিসুখ ও একাগ্রতা থাকে। ধ্যানের যে সহজ ভাব চিত্তকে উৎফুল্ল করে, তাকেই 'প্রীতি সুখ' বলা হয়েছে। তৃতীয় ধ্যানে ঐ সুখ বোধ থাকলেও, তার প্রতিও সাধক বীতস্পৃহ হয়ে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞ-সুখ-বিহারী একাগ্রতায় স্থিতি করেন। তারপর চতুর্থ ধ্যানে সুখ দুঃখের অতীত উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ একাগ্রতায় স্থিতি হয়। তখন সাধক নির্ব্বাণ লাভ করেন এবং তাঁকে অর্হৎ বলা হয়। কিন্তু এই ধ্যানও লক্ষ্য নয়, পথ মাত্র। লক্ষ্য হল—অভিজ্ঞা, সম্বোধ, নির্ব্বাণ। 'দীঘনিকায়ে' বলা হয়েছে যে চতুর্থ ধ্যানে, 'চিত্ত সমাহিত' হয়, পরিশুদ্ধ স্বচ্ছ হয়, নির্দ্দোষ নিষ্পাপ হয়, কোমল হয়, কর্ম্মণ্য হয়, স্থির ও অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন চিত্ত নিশ্চেষ্ট থাকেনা। কর্ম্মণ্য থাকে, অর্থাৎ আরো উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে। ঐরূপ পাঁচটী স্তরের কথার উল্লেখ আছে। প্রথম চার ধ্যানকে রূপমূলক ধ্যান বলেছেন; পরের পাঁচটীকে অরূপ ধ্যান বলেছেন। অরূপ ধ্যানে নানাত্ব বোধ থাকেনা—'আকাশ অনন্ত' জ্ঞান মাত্র থাকে। তারপর 'বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন' প্রকাশিত হয়। তারপর 'শূন্যতার অনন্ত আয়তন'। তারপর সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার শূন্যতার আয়তন। শেষ স্তরে বেদনা বা সংজ্ঞা কিছুই থাকেনা, তখন প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে সমুদায় পা বিনষ্ট হয়। "তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে গমন করেন, নিশ্চিন্ত ভাবে দণ্ডায়মান হন, নিশ্চিন্ত ভাবে উপবেশন করেন, 'নিশ্চিন্ত ভাবে শয়ন করেন।"

বুদ্ধ আরেক প্রকার ধ্যান করেছেন দেখা যায়—যার নাম—'চারি ভাবনা' (১) মৈত্রী ভাবনা বা মিত্রের প্রতি যে ভাব, সেই ভাব সাধন, (২) করুণা ভাবনা বা অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ এবং সেই দুঃখ দূর করার ইচ্ছা, (৩) মুদিতা ভাবনা বা অপরের সুখে সুখ, (৪) উপেক্ষা ভাবনা বা দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ।

সম্যক্ সমাধি হল 'আমি' থেকে মুক্তি, আর চারি ভাবনায় হল অন্যের ভিতর নিজের প্রসার। সম্যক্ সমাধিকে বলা হয়েছে অনিমিত্ত, আকিঞ্চন্য, শূন্যতা চিত্ত-বিমুক্তি, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু চিন্তার বিষয় হয়না, কিছু নেই ভাব আসে, আমি-আমার বোধও চলে যায়, শূন্যতায় চিত্ত বিমুক্ত হয়। চারি ভাবনায় যে অবস্থায় পৌঁছে দেয় তাকে 'ব্রহ্ম-বিহার' বলা হয়েছে—তাতে চিত্ত বিমুক্ত হয়ে, সকলের ভিতর করুণাময় সত্তায় স্থিতি হয়। এই দুই অবস্থাই হল নির্ব্বাণের অবস্থা। তার পরে কি? শ্রীবুদ্ধ বলেছেন—'এসে দেখ'। তারপরে 'বহুজন-হিতায়', 'বহুজন-সুখায়' আত্মোৎসর্গ। সে অবস্থা যে সত্যশিবসুন্দরের প্রকাশ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধেরা সেই স্থানেই 'আত্মদীপ' হয়ে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' বলে এক হয়ে গিয়েছিলেন। এই হল বৌদ্ধসাধন।

ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মস্বরূপ হল 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধং।' এই হল ভক্তের উপাসনার মাপকাঠি। সেই চিরজাগ্রত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী পরম ব্যক্তির সম্মুখীন হয়েই ব্রহ্মোপাসনার ধ্যান সম্পন্ন হয়। **"These separated attributes shall then be realized together as a Holy Personal Presence in silent Meditation, the congregation observing the profoundest silence for a few minutes."*** শ্রীবুদ্ধ ঈশ্বরের নাম করেননি, কিন্তু বলেছেন 'এসে দেখ' এবং যে সকল স্তরের ভিতর দিয়ে গেছেন, তা বিচার করলে পাওয়া যায়,

Vide New Samhita

সত্য—অনন্তজ্ঞান—শান্ত—শিব—শুদ্ধ—পরিশুদ্ধ করুণাময় সত্তা, মাতৃভাব।

এখানে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ধ্যান বিষয়ক দুটী উপদেশ এবং চিরঞ্জীব প্রভৃতির কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত উদ্ধৃত করা হল—তার থেকে নূতন ধ্যানের পরিচয় পাওয়া যাবে। ঐ ধ্যানের ভিতর তাঁরা সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বুদ্ধের সাধনার—তাই বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁদের কাছে ইতিহাসের চর্চ্চা বা নীতিকথা বা দার্শনিক তত্ত্বরূপে উপস্থিত হয়নি, উপস্থিত হয়েছিল সাধনের ভিতরে। সেই সাধনকে নূতন করে লাভ করে তাঁরা বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব লাভ করলেন। এবং সুন্দর, মধুময়, দুঃখ-জ্বালা-মুক্ত হয়ে, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির পথ রচনা করার আশা-বর্ত্তিকা রূপে সেই নূতন নীতি ও নূতন বৈরাগ্য, নূতন আত্মসংযম ও নূতন ধ্যান তাঁরা জগৎকে দিযে গেলেন।

ধ্যান বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ

"ধর্ম্মের সমস্ত সাধারণ লক্ষণ যেমন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত এবং কোন ব্যক্তির তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই, তেমনই আবার ইহার বিশেষ লক্ষণ কোন কোন ব্যক্তি এবং কোন কোন জাতি বিশেষে অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের এই দেশ ধ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ। ধ্যানের উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্য, দীর্ঘতা এবং প্রশস্ততা ভারতের আর্য্যগণ যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেন, এরূপ আর কোন দেশে দেখা যায় না। ইহারা ভিন্ন আর কোন জাতি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জড় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন, এমন শুনা যায় না। ধর্ম্মের অন্য অন্য গুণ অনেক দেশে দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া থাকা, গম্ভীর ভাবে অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে ধারণ করা, ইহা ভারতের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। বাস্তবিক ভারতের বিশেষ গৌরবের বিষয় ধ্যান। অন্যান্য দেশ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত অন্য অন্য ধর্ম্মরত্ন লইব; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ-দত্ত অমূল্য ধ্যান-রত্ন আমরা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। কেমন করিয়া

আহারের সময়, পথে চলিয়া যাইবার সময়, বন্ধুদিগের সহিত আমোদ করিবার সময় এবং কিসে সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারি, তাহার উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে।

ধ্যানের জগৎ আশ্চর্য্য জগৎ। একবার যদি ব্রাহ্ম 'সত্যং' বলিয়া ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে পারেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের গৃহ বলিয়া পরিচিত হয়। একবার যদি 'শিবং' বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, সমস্ত জগতে তাঁহার মঙ্গল ভাব এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া ব্রাহ্ম মুগ্ধ হন। ব্রাহ্মের এই অসাধারণ ক্ষমতা যে, তিনি শূন্যের মধ্যে পূর্ণ পরব্রহ্মের আবির্ভাব দর্শন করিতে পারেন। ...পুস্তকের উপর নির্ভর করিবনা, বন্ধুর উপর নির্ভর করিব না, ব্রহ্ম-মন্দিরের আড়ম্বরের উপর নির্ভর করিব না; কেননা শ্মশানে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ব্রহ্মধ্যান-বলে শূন্য অন্ধকার মধ্যে আমরা আলোক দর্শন করি। সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে সমস্ত মনকে আলোকিত করিতে হইবে। জগতের সমস্ত নিকৃষ্ট ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজ্যে, যেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ এবং যাহা শান্তি পুণ্যের প্রস্রবণ, সেখানে প্রবেশ করিতে হইবে।

এখানে শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া বহুকালের দুঃখ দূর করিবেন। যাঁহাদের চক্ষু এতকাল অভদ্র দর্শন করিয়াছে, এখানে বিশুদ্ধতা এবং ভদ্রতা দেখিবে। যাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ করিয়াছেন, এখানে আসিয়া পরস্পরকে প্রণয়-চক্ষুতে দর্শন করিবেন। যাঁহারা নর নারীর বিরুদ্ধে অপবিত্র চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে অনুতাপ খড়্গ দ্বারা সে সকল পাপ ছেদন করিবেন। যাঁহারা এতদিন সাধনের পরেও মনের অপবিত্র অভ্যাস সকল বিনাশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যতক্ষণ সে সকল হইতে নিস্তার না পাইবেন, ততক্ষণ এখানে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিবেন। নিরাশাতে যাঁহারা আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এখানে তাঁহাদের আশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।"

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খ্রীঃ

"আমি আছি এবং জগৎ আছে, এই দুটি সত্য যেমন তোমরা সহজে বিশ্বাস কর, তেমনই 'ঈশ্বর আছেন' সহজ ভাবে যদি ইহা বলিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তোমরা ধ্যানের সঙ্কেত শিখিয়াছ। কঠোর নীরস ধ্যান আমাদের নহে, যে ধ্যানে ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে হয়, সে ধ্যান আমরা চাইনা। যুক্তি, চিন্তা দ্বারা আমরা ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিতে চাহিনা এবং কল্পনা দ্বারা আমরা তাঁহাকে সাজাইতে ইচ্ছা করিনা। ...যেমন বাহিরের জগৎ বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনই সেই অন্তরতম চিরজাগ্রত পুরুষ আত্মার অন্তরতম ভক্তি-চক্ষুর নিকট বিদ্যমান। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস-নয়নে দেখিতেছেন—কেহ তাঁহাকে প্রেম ভাবে স্পর্শ করিতেছেন—কেহ বা তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সকলের এখনও এক সোপানে আসিবার সময় হয় নাই; অতএব নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চল. সকলে তাঁহার সেই নিভৃত গৃহে গমন কর। ...একাগ্রচিত্তে, তদ্গতভাবে, বিষয়রাজ্য হইতে ক্রমে চলিয়া যাও, অন্ধকারের পর অন্ধকার এবং তাহা অপেক্ষাও ঘোরান্ধকার অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও। ভয় নাই, নিরাশ হইও না, শীঘ্র কাজ সারিয়া লইব, এরূপ মনে করিওনা; কিন্তু শান্তভাবে ধীরে ধীরে সেই পুণ্যালয়ের দিকে গমন কর; কিছু দূরে গেলেই দেখিবে, কেমন সুন্দর সেই মঙ্গলময়ের প্রেমরাজ্য। কোথায় সেই মঙ্গলময়ের প্রেমরাজ্য, কোথায় সেই পুণ্যধাম? তোমাদের আত্মার মধ্যে প্রাণের মধ্যে। যাত্রিগণ! যাও সেই প্রাণ-রাজ্যে, দেখিবে, প্রাণের অধিপতি হইয়া, প্রাণসিংহাসনে সেই 'রাজরাজেশ্বর' প্রতিষ্ঠিত। ধ্যানেচ্ছু সাধকগণ! সাবধান, আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করিওনা, ব্রহ্মভক্তি অবলম্বন কর, তাঁহার কৃপাস্রোতে ভাসিয়া যাও। চল, সেই পিতার ধ্যান করিতে যাই, প্রেম যাঁহার সিংহাসন এবং ভক্তি যাঁহার গৃহ চল, সেই রূপ দেখি, যাহা দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয় এবং জীবন সার্থক হয়। পিতা দয়াময়, তিনি জানেন যে আমরা তাঁহার কাছে যাইতে

পারিনা। তিনি স্বয়ং করুণা করিয়া আমাদিগকে ধ্যানগৃহে লইয়া যাউন, যেখানে ভক্তদিগকে দেখা দেন।"

—১১ই মাঘ, ১৮৭২ খ্রীঃ

"ধ্যানের পথ বিজ্ঞানের পথ। ইহাতে কল্পনা নাই, অসত্যতা নাই। ইহা যথার্থ পূর্ণসত্যের পথ, এবং ধ্যানের পথ কঠোর নহে, ইহাতে মিষ্টতা আছে, সুধা আছে। পাঁচ মিনিট ধ্যানে নিমগ্ন হইলে ব্রাহ্মদিগকে ধ্যানসাগর হইতে টানিয়া আনা কঠিন হইবে। ধ্যানের মধ্যে এত আমোদ, এত সৌন্দর্য্য।"

—১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ খ্রীঃ

"হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মতত্ত্ব! এতদিন মনে করিয়াছিলাম, ধ্যান-পথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবেনা; কিন্তু তোমার প্রসাদে এখন দেখিতেছি, যত মূল দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব, ততই ভাইভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়া আগে যেটুকু সুখশান্তি পাইতাম, সেইটুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে গলায় ছুরি দেয়, তাহার স্থিরতা নাই। তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ।"

—২১ জানুয়ারী ১৮৭৭ খ্রীঃ

"দয়াময় বিধাতা, যোগী ঋষিদিগের ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির করিতে হইবে। হৃদয়ের সমুদয় দ্বার বন্ধ করিতে হইবে। কেননা হৃদয়-দ্বার খোলা রাখিলে তন্মধ্যে বাহিরের বিষয়, চিন্তার আলোক আসিবে। অতএব সমুদয় দিক বন্ধ করিয়া একাগ্রমনে অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মপক্ষী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মনের ভিতরে অনন্ত আকাশের পক্ষী বর্ত্তমান। আরও অন্ধকার হউক, আরও অন্ধকার হউক, হৃদয়ের গভীর স্থানে ঘোরান্ধকার মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি। বাহিরের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গেল। হৃদয়রাজ্যে হৃদয়েশ্বর প্রকাশিত হউন। ধ্যানের আরম্ভে মনে হয়, ব্রহ্মপক্ষী একবার এইদিক,

একবার ঐদিক যাইতেছেন, কেননা তখনও মন চঞ্চল থাকে। এইজন্য মনকে স্থির করিতে হইবে। একাগ্রতা-রজ্জু দ্বারা মনকে বদ্ধ করিব। সকলে ব্রহ্মপক্ষীকে ধরিবার জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ করুন। হৃদয়ের সকল কপাট কি বন্ধ করিয়াছি? একটুও কি আলোক আসিতেছেনা? একটীও কি বিষয়ের চিন্তা আসিতেছেনা? একটুও কি কোলাহল আসিতেছেনা? অন্ধকার, তুমি এস। ব্রাহ্মগণ, ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মধ্যান কর। যত নিকটে জমাট করিয়া ঐ ঘন পদার্থ ব্রহ্মকে দেখিবে, ততই কৃতার্থ হইবে। সেই ব্রহ্মপক্ষী অন্ধকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়া তোমাদের সমক্ষে, ভিতরে এবং চারিদিকে রহিয়াছেন। কৃপাসিন্ধু তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন।"

—২৬শে জানুয়ারী ১৮৭৯ খ্রীঃ

"মন, তুমি ধ্যান করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তুমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছ, তখন যখনই আমি তোমাকে ধ্যান করিতে বলিব, তখনই তোমার প্রস্তুত হইতে হইবে। তুমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তোমার মন অন্যদিকে আছে, এই কথা বলিলে চলিবে না। এখন ধ্যানের সময়। সেই অপার প্রেমের আধার, অপার জ্ঞানের আধার, অপার সুখের সিন্ধু তোমাকে দেখা দিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার কোন নিগূঢ় কথা আছে। এইজন্য তিনি তোমাকে চাহেন। থাকুক সংসারের সুখ সম্ভ্রম। ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলাম। সংসার হইতে বিদায় লইয়া মন চলিল। কত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল। শরীর-রাজ্য, মনোরাজ্য, হৃদয়রাজ্য ছাড়িল। অবশেষে মন প্রাণরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে মন চিন্তা করেনা, যেখানে হৃদয় উত্তেজিত হয়না, সেই আসল ব্রহ্মরাজ্যের অন্তঃপুরে গিয়া মন উপনীত হইল। সেখানে কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় নাই। এখানে যথার্থ যোগী যোগে মত্ত, যথার্থ ভক্ত ভক্তিরসে মত্ত। এই রাজ্যে অতি নিস্তব্ধভাবে বসিতে হইবে। এখানে একটু জোরের

সহিত নিঃশ্বাস ফেলিলে মনে হইবে, যেন বজ্রধ্বনি হইল; অতএব এখানে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের নিঃশ্বাসে যোগীদিগের ধ্যান ভঙ্গ না হয়। এখানে সকলেই প্রশান্ত, সকলেই স্থির। এখানে কেবল পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার যোগ। এই যোগেতে আমরা মগ্ন হই। কৃপাসিন্ধু আমাদিগকে দর্শন দিন, তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতিজনের শরীর মনকে তিনি কৃপা করিয়া শুদ্ধ করুন।”

—২৫ জানুয়ারী ১৮৮০ খ্রীঃ

ধ্যান বিষয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা

শিব সুন্দর চরণে মন, মগ্ন হ'য়ে রও রে।
ভজরে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে,
বিভু-পাদপদ্ম-সুধা-হ্রদে ডুবে' প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ সত্ত্ব হিরণ্ময়, মানস-পটে তাঁরে,
নিরখিয়ে সচেতনে, পূর্ণকাম হও রে।

—পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ

মজ মন বিভু-চরণারবিন্দে, গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে।
চিত্ত-বিনোদন, মূরতি-মোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে (সেই);
ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেম-রস অবিচ্ছেদে।
যোগিজন-চিত, সদা প্রলোভিত, যাঁর প্রেম-মকরন্দে (সেই);
জীবন সঞ্চার, পাতকী উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
করিয়ে সাধন, ইন্দ্রিয় দমন, লহ স্থান হরিপদে,
গাও তাঁহার জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে।

—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

মুলতান—একতালা

(বাউল)

দেখ্‌রে হৃদয়ঘরে কি মজার সংবাদের তার।
(ক্ষেপা মন আমার)
করে ভিতরে তার গতিবিধি স্বর্গধামের সমাচার।
প্রেম-বিজলি যোগে, ধ্যান সমাধি যোগে, আসে তত্ত্বকথা কত
সেথা শুভসংযোগে ; আহা ! কোথায় গোলোক—কোথায় ভূলোক,
পলকে হয় একাকার। (প্রেম-যোগবলে)
কথা শোন্ রে অপ্যেয়ে, একটু ব'সে স্থির হয়ে,
বিবেক-কাণে স্বর্গপানে মনটী ফিরায়ে ;
ঐ শোন্ নীরবে স্বরবে হরি, ডাকছেন তোরে বারে বার।
(প্রেমধামে যেতে)
ঐ প্রেমের দরবার, চল্ দেখি রে একবার,
ভক্ত মাঝে ভগবান্ কেমন চমৎকার ;
প্রেমদাসে বলে সাধুদলে মিশে যারে তুই এবার।
—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি-গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল, অবিরত যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি, সমাধি-মন্দিরে তুমি
কি করগো একা বসি' ; অভয় পদকমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি।
—ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

(সাধু অঘোবনাথের হস্তাক্ষর)

জন্ম—ডিসেম্বর ১৮৪১ খৃঃ

স্বর্গারোহণ—৯ই ডিসেম্বর ১৮৮১ খৃঃ

ইনি মূল সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাবলী অন্বেষণ করিয়া ১৮৮১ খৃঃ বাংলা ভাষায় প্রথম শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্বের ভাষ্য রচনা করেন।

বাউলে—আড়খ্যামটা

এবার ডুবিলাম ডুবিলাম প্রাণারাম-সাগরে ;
এযে সাগর নয়, অমৃতের আধার,
এর ঢেউ লেগে প্রাণ শান্ত করে।
কোথায় গেল সংসারের কোলাহল, আশার প্রলোভন,
ষড়রিপুর বল, আমার প্রাণ হ'ল শীতল ;
এ সুখ বর্ণনা কি যায় বচনে, এর মননে ভুনয়ন ঝরে।
প্রেমনীরে ডুব দিয়ে আর কিছুই দেখি না,
সুধা-সিন্ধুনীরে করি সন্তরণ, সুধামাখা বিশ্বসংসারে ;
এসেছি এখানে যাবনাকো আর,
খুঁজিয়া পেয়েছি আনন্দ-ভাণ্ডার, হেথা নাইকো অন্ধকার ;
এবার অমর হব, এম্‌নি রব, দয়াল হরির চরণ ধরে'।

—হরিসুন্দর বসু

২। 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' (১৮৮১ খৃঃ)—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিয়োজিত বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যেতা সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় এই বইটী রচনা করেন। বইটী সমন্বয়-ভাষ্যমালার ভিতর প্রথম গ্রন্থ এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও শাক্যমুনি বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ। সমন্বয়ের আলোকে বইটীর ভিতরে বুদ্ধের চরিত-কথা, জীবন-কথা ও সাধন-কথা গ্রন্থকার ফুটিয়ে-তুলেছেন। ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের মতে—"বইটী বৌদ্ধ সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্। বইটীর রচনা-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত ও মৌলিক। বইটী পড়লেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থকার স্বভাবসিদ্ধ পণ্ডিত (born scholar)। ১৮৭৯-৮০খৃঃ গ্রন্থকার বুদ্ধদেব-সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা এতদিন পরে সমর্থন লাভ করেছে। বইটীর পুনর্মুদ্রণ হওয়া দরকার।"*

সাধু অঘোরনাথ ১৮৪১ খৃঃ শান্তিপুরে (নদীয়া) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁর পিতা যোগপরায়ণ সাধু ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও

* লেখকের নিকট বলেন

পার্সি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।* পিতার প্রভাব সন্তানের উপর পড়েছিল। অঘোরনাথের শিক্ষার আরম্ভ টোলে ও পাঠশালায়। পরে তিনি কিছুদিন কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধারা অন্যরূপ ধারণ করে। Final Entrance পরীক্ষা আর দেওয়া হলনা, মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৬৩ খৃঃ তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কাছে নবধর্ম্ম-প্রচারের ব্রত নিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন করে গেলেন। সারাজীবন বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধ-রচনায় তাঁকে ব্যাপৃত দেখা যায়। প্রচারক অবস্থায় তিনি এক অনাথা বিধবার পাণিগ্রহণ করেন এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মপ্রচারে ও ধর্ম্ম-সাধনে ব্যস্ত থাকতেন। অভিভাবকরূপে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের উপর তাঁর গৃহসংসার পরিচালনার সকল ভার ছিল। অঘোরনাথের পবিত্র জীবনের প্রভাব, উপাসনা ও উপদেশের শক্তি বহু ব্যক্তিকে নব ধর্ম্মের পথে আনে। তার ভিতর বহু ধর্ম্মনেতার নামও করা যায়—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

অঘোরনাথের বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর লিখিত 'বীর-পূজা' প্রবন্ধে অঘোরনাথের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন—'তিনি বিনম্র, সরল, প্রেমিক, পরোপকারী, ধর্ম্মপ্রিয়, নির্ব্বিকার স্বভাব ছিলেন।'

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পরেই 'সঙ্গতসভার' আলোচনায় অঘোরনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার', 'বঙ্গবন্ধু' প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। আরও দেখা যায়, *তিনি 'ভারতাশ্রমের' শিক্ষকতা, 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ের'* শিক্ষকতাও করতেন। 'প্রত্যাদেশ অন্তরে', 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ',

---

* 'সাধু অঘোরনাথের জীবন চরিত'—চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত

'দেবর্ষি নারদ' প্রভৃতি কয়েকটী ছোট ছোট বই তিনি লেখেন। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে 'ভক্তমাল' নাম দিয়ে, শ্রেষ্ঠ ভক্তদের একটী জীবনীও রচনা করেছিলেন। লেখাটী ছাপাখানায় হারিয়ে যাওয়ায় প্রকাশিত হয়নি। ঢাকার 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে' তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ঐ সময়ে তিনি ঢাকায় ও ময়মনসিংহে যে সব সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেন, তা' 'ধর্ম্ম-সোপান' নামে একটী পুস্তকে প্রকাশিত হয়। নবধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করার জন্যে তিনি পেশোয়ার থেকে আসাম পর্য্যন্ত খালি পায়ে, বোঁচকা কাঁধে, উটের পিঠে, গরুর গাড়ীতে বা পায়ে হেঁটে—যেখানে যেমন তেমনি ভাবে (১৮৬৩-৮১) ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্ম-জীবনে তাঁর অশেষ দান। একদিকে তিনি আচার্য্য কেশব-চন্দ্রের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ—অন্যদিকে আমিত্বশূন্য, প্রেম ও বৈরাগ্যে ভূষিত, হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের ভাণ্ডার-বিশেষ ছিলেন। 'শ্লোকসংগ্রহ' সঙ্কলনের সময় (১৮৬৫-৬৬) আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁর উপর হিন্দুশাস্ত্র থেকে সঙ্কলনের ভার দেন। যখন 'সাধক-ব্রত' ভাগ করা হয় (১৮৭৬-৭৭), তাঁকে যোগশিক্ষার্থীর ব্রত দেন। 'অধ্যেতাব্রতে' (১৮৭৯) তাঁর উপর বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ভার পড়ে।

১৮৭৪ খৃঃ তিনি একবার উত্তর ভারতে প্রচারে যান। সেই সময়ে স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সম্বন্ধ পরে খুব ঘনিষ্ঠ হয় এবং ঐ সূত্রেই স্বামীজি শ্রীকেশব-চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। অঘোরনাথকে দেখে উত্তর ভারতের সাধুরা তাঁকে নিজেদের একজন বলে মনে করেছিলেন। উত্তর ভারতে প্রচারের সময় তিনি উর্দ্দু ও গুরুমুখী ভাষা শিখে নেন। একবার তিনি উড়িষ্যায় প্রচারে যান এবং সেখানে উড়িয়া ভাষা শেখেন। এই ভাবে ভারতের বহু ভাষা ও ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় পরিচয় হয়েছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন *তাঁকে 'যোগশিক্ষার্থীর' ব্রত দেন, সেই সময় অঘোরনাথ* বিধিপূর্ব্বক যোগশিক্ষা করেন। মূল 'যোগবাশিষ্ঠ', 'পাতঞ্জল' প্রভৃতি যোগশাস্ত্র তিনি পূর্ব্বেই অধ্যয়ন করেছিলেন, এখন

নূতন ভাবে সকল যোগশাস্ত্র আয়ত্ত করে নবযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্মানন্দের 'ব্রহ্মগীতোপনিষদ্' ও 'নবযোগসূত্রম্' বই দুটিতে এই নবযোগের তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁকে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যেতা পদে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করে পালি, প্রাকৃত, ইংরাজী ও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ে ঐ সময় যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সব অধ্যয়ন করেন। নিজের গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে যোগিপ্রবর অঘোরনাথ দু' বছরের ভিতর প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে, নববিধানের সামঞ্জস্যের আলোকে, 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' বইটীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। মনে হয়, এই পুস্তক-রচনায়, তিনি ব্রহ্মানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ-বিহারী সেন মহাশয়ের, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ও Asiatic Societyর গ্রন্থাগারের সাহায্য পান। ১৮৮১ খৃঃ তিনি পাঞ্জাবের পথে প্রচারে রওনা হন এবং পথে বৌদ্ধতীর্থগুলি হয়ে যান। এই প্রচারের ভিতর তিনি ঐ পুস্তকের রচনা-কার্য্য শেষ করেন। এই প্রচারে তিনি রাউলপিণ্ডি, ডেরাইস্মাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। ফিরবার সময় লক্ষ্মৌ থেকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি ব্রহ্মানন্দকে দেখবার জন্য পাঠান। বইটীর প্রস্তাবনায় শ্রীঅঘোরনাথ লিখেছিলেন—

"যে মহাত্মা, দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি এখন কোথায়? বাস্তবিক কি তিনি মরিয়াছেন? তিনি এখন নির্ব্বাণসাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নির্ব্বাণ-জলধি, দেবদেব, আদিদেবে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নির্ব্বাণ-রসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি, ধ্যান, বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণ, পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে, আমি যোগ-সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার

ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি।"

ভগবানের ইচ্ছা তিনিই জানেন। লেখাটী পাঠাবার পরেই মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ ওলাওঠা রোগে লক্ষ্ণৌএ তাঁর ইহজীবনের অবসান হয়। ভারতের আধ্যাত্মিক গগনে নক্ষত্রপাত হল—আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিঃসঙ্গ হলেন। আচার্য্যদেব তারপর থেকে তাঁকে 'সাধু' নামে অভিহিত করেন।

তাঁর তিরোধানে আচার্য্যদেব পাণ্ডুলিপিটী পড়ে, সম্পাদনা করার ভার গৌরগোবিন্দ রায়ের উপর দেন। ইনিও অপূর্ব্ব মানুষ। ১৮৪০ খৃঃ পাবনায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১২ খৃঃ কলিকাতায় মৃত্যু হয়। অতি শৈশবে পিতৃহীন হয়ে তিনি পিতৃব্যের কাছে বর্দ্ধিত হন। পিতৃব্য পণ্ডিত ও উদারচেতা ছিলেন—সেই প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। অল্প ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করে পুলিশের কাজে প্রবেশ করেন। কাজ উপলক্ষে তিনি একবার রংপুরে যান। সেখানে সাধু অঘোরনাথ প্রচারে যান ও গৌরগোবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তার ফলে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পদিনের ভিতরেই ১৮৬৬ খৃঃ প্রচারক-ব্রত নেন। তাঁর পবিত্র চরিত্র, দৃঢ়চিত্ততা, কষ্টসহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা, যুক্তি, চিন্তার গভীরতা এবং প্রশস্ততা, শাস্ত্রে অধিকার প্রভৃতি গুণের জন্য আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁকে অন্তরঙ্গ-দলে নেন এবং তাঁকে শ্লোকসংগ্রহ-সঙ্কলনের সময় অঘোরনাথকে সাহায্য করার ভার দেন, ১৮৭৬ খৃঃ তাঁকে 'জ্ঞান-শিক্ষার্থীর' ব্রত দেন। ১৮৭৯ খৃঃ হিন্দু-ধর্ম্ম অধ্যয়নের ভার দিয়ে তাঁকে নববিধান-মণ্ডলীর 'উপাধ্যায়' পদে অভিষিক্ত করেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রন্থসম্পাদনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা, সামাজিক অনুষ্ঠানাদির পৌরোহিত্যের ভার তাঁর উপরেই ছিল। হিন্দুধর্ম্মের অধ্যেতারূপে তিনি যে সাধন, অধ্যয়ন এবং পরিশ্রম করেছিলেন, তার পরিচয় দেয়—তাঁর রচিত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা সমন্বয়ভাষ্য' (সংস্কৃত) ১৮৯৯ খৃঃ, 'গীতাপ্রপূর্ত্তি' (সংস্কৃত) ১৯০২ খৃঃ, ও 'বেদান্ত-সমন্বয়ভাষ্য'

(সংস্কৃত) ১৯০৬ খৃঃ। পরে তিনি ঐ বইগুলির বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' (১৮৮৯), 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার স্বভাবনিষ্ঠ যোগ' (১৯০৯), 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র' ১১ খণ্ড (১৯০০ খৃঃ) প্রভৃতি তাঁর কয়েকটী উৎকৃষ্ট বই আছে। ইনি সংস্কৃতে 'শ্রুত-প্রকাশ' নামে একটী পত্রিকা প্রকাশ করে, তাতে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রধান প্রধান বই সংস্কৃতে অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। তার ভিতর 'নবযোগসূত্রম্' ও 'বিশ্বাসবিবৃতিঃ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পাণিনি অবলম্বনে তিনি দুটী সুন্দর সংস্কৃত বই রচনা করেছিলেন—'ভাষ্যসঙ্গমনী' ও 'দৃষ্টান্তসর্ব্বস্বম্'। ইনিও বহু ভাষাবিৎ ছিলেন—বাংলা, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরাজী, উড়িয়া, কানারীজের নাম করা যায়। তিনি সাধু অঘোরনাথের বাড়ীর পাশে 'মঙ্গলবাড়ীতে' থাকতেন। তাঁদের দুজনের ভাবযোগ গভীর ছিল। তিনি 'শাক্যমুনিচরিত' সম্পাদনার ভার নিয়ে, পালি, প্রাকৃত ও ইংরাজী ভাষায় যে সব বই থেকে সাধু অঘোরনাথ বইটীর রচনায় উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তা যতদূর সম্ভব পাঠ করে, উদ্ধৃতাংশ মিলিয়ে সুন্দরভাবে বইটী সম্পাদনা করেন। বইটী তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয। দ্বিতীয় ভাগে গৌরগোবিন্দ একটী 'অবতরণিকা' লেখেন।

'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' প্রথম খণ্ড (১১০ পৃঃ) ১৮৮১ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় (১৸০+৮৭পৃঃ) ও তৃতীয় খণ্ড (৫৭ পৃঃ) পরপর বৎসরে প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খৃঃ বইটীর তৃতীয় সংস্করণ দুই ভাগে (সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪ পৃঃ ১৸+৶০) প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ খৃঃ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে বইটীর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ললিতবিস্তর' (সংস্কৃত) ও ডাঃ রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য' বই দুটী সাধু অঘোরনাথের প্রধান অবলম্বন ছিল, দেখা যায়। আনুষঙ্গিক বহু হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার উল্লেখ বইটীতে পাওয়া যায়। প্রচার উপলক্ষে তিনি প্রধান

প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলি স্বচক্ষে দেখেছিলেন ও সেখানকার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর বর্ণনাগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। বইটীতে এই কয়টী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ললিতবিস্তর' (সংস্কৃত)। ডাঃ রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য'। শ্রীমদ্ভাগবত। বাল্মিকী-রামায়ণ। মহাভারত। বায়ুপুরাণ। কল্কিপুরাণ। শম্ভুপুরাণ। অমরসিংহ। হেমচন্দ্র ত্রিষষ্টি ফলাকা পুরুষ-চরিত্র। গণেশপুরাণ। জৈনদর্শন। পাতঞ্জল। যোগসূত্র। জৈমিনি। বৈশেষিক। ন্যায়। সাংখ্য। বেদান্ত। বল্লভাচার্য্য। রামানুজাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য। কানাদ। বিনয় পিটক। অরিয়বসানি। (দীর্ঘনিকায়)। অনাগত ভয়ানি। (অঙ্গুত্তর নিকায় তৃতীয় ভাগ)। মুনিগাথা (সূত্ত নিপাত ২০৬—২২০ শ্লোক)। মনের সূত্তঃ (মোনিষ্য সূত্রঃ অঙ্গুত্তর নিকায় প্রথম ভাগ ও ইতিবুত্তকের অন্তর্গত)। উপতিষ্য পসিন (সারিপুত্র সংবাদ)। মহাবংশ (সিংহলের ইতিহাস, G. Turner সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোমান অক্ষরে মূল দেন)। মললঙ্কতউত্তো। বুদ্ধঘোষ 'বুদ্ধচরিত্র'। রাহুলসূত্র। মহারাহুলসূত্র। সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক। অভিধর্ম্ম চিন্তামণি। বুদ্ধবচন। ত্রিপিটক। Senart। Hodgson। Tournour। Beal। Rhys Davids। Foucaux। Bigandet। Cunningham। Fahien।

বইটীতে গ্রন্থকার ভগবান বুদ্ধের পিতামাতার জীবন-কথা, সেই সময়ের অবস্থার চিত্র, তাঁর জন্মমাহাত্ম্য ও জন্মকাহিনী, শিক্ষা, বিবাহ, তপস্যার স্তর এবং বিভিন্ন স্তরে বুদ্ধদেবের বিভিন্ন ভাব 'ললিতবিস্তরের' বর্ণনানুযায়ী উপস্থিত করেছেন। "তিনি গভীর অধ্যাত্মযোগে মহাত্মা শাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অভিনব দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে, সন্দেহ নাই।" *

* সম্পাদকের মন্তব্য

বইটীর শেষে গ্রন্থকার নিজ প্রতিপাদ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ ৫২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করেছেন।

বইটীর কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"বুদ্ধ প্রথমে চিত্ত-সমাধান ও বৈরাগ্য-সহকারে বিবেক-বলে স্থূল হইতে অধ্যাত্ম জগতে উপস্থিত হইলেন।...

"ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইল, একই সত্ত্বা যাহা অজর অমর সুখ দুঃখে লিপ্ত নহে, তাহাই নিত্য ও সার, সমুদায় জগতের আর তাবৎ অবস্তু ছায়ামাত্র। এই একত্বে তিনি সমাহিত হইলেন।...

"ধ্যানের তৃতীয় অবস্থায় তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে উদাসীন, যোগ বিয়োগে, বিবেক অবিবেকে উদাসীন, আত্মার স্বরূপাবস্থায় একত্ব স্মরণেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন।...

"ধ্যানের চতুর্থাবস্থায় সুখদুঃখের অতীত হইয়া আমিত্বানুভব বিলুপ্ত হইলে যে নির্ম্মল সুখোদয় হয়, তাহাতেই বিহ্বল, তৎসুখেই সুখী। যাই তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল, তৎক্ষণাৎ সমুদায় মানবের দুর্গতি ক্লেশ তাঁহার নেত্রপথে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ..প্রথম আমিত্ব গেল, পরে জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল।" (পৃঃ ৩০) "তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই অবধারণ করিলেন, অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিব।" (পৃ: ৩৬) অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান অথবা ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ববুদ্ধির নাম অবিদ্যা ; প্রবৃত্তি-নিচয়ের নাম সংস্কার ; অহংভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহের নাম বিজ্ঞান ; সংস্কার ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হইলে বিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বাহ্যবস্তু। তখন প্রত্যেক বস্তু নামরূপে পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আর্য্যদর্শনে আত্মস্থ অধ্যাত্মজ্ঞান 'বিজ্ঞান'। তাঁহারা বলিতেন, রূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ তাবৎ ইন্দ্রিয়। সেই

ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম স্পর্শ। এই স্পর্শ হইতে…তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার জ্বালায় মানুষ দিবানিশি জ্বলিতেছে। তৃষ্ণাই মানবের মুক্তির পথ অবরোধ করিতেছে। তৃষ্ণা হইতে উপাদান অর্থাৎ চারিভূত। সেই ভূত অর্থাৎ চারি ধাতু হইতে সব উৎপন্ন হইতেছে। এই উৎপত্তি জাতি অর্থাৎ মনুষ্যাদির পরিচয় এবং সঞ্জাত মানব জরা মৃত্যু শোকাদির আস্পদ। এই কারণপরম্পরায় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে দুঃখস্কন্ধ পাঁচ প্রকার যথাঃ—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার।

"রূপ—ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় সকলকে রূপ বলে।

বিজ্ঞান—আমিত্ব-জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। আমি আমি, আমার আমার করাতে সেই অগ্নি অন্তরে ক্রমাগত প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

বেদনা—সুখদুঃখাদির অনুভবকে বেদনা বলা যায়।

সংজ্ঞা—ইহা অশ্ব, ইহা গো, ইহা মেষ, ইহা মুখ, এইরূপ ভেদ-বোধক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা।

সংস্কার—রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি আন্তরিক ভাব-সমূহকে সংস্কার বলে।" (পৃঃ ৩৭-৩৯)

"এই দুঃখ-নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। কিন্তু আমিত্বরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে সব অন্ধকার হইয়া যায়। সেই আমিত্ব-জ্ঞান প্রদীপ্ত থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সুখ-দুঃখানুভব, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা, ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। …মহামুনি বুদ্ধ নির্ব্বাণ বিষয়ে বৈদিক পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল।"

"যাহা হউক, ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র কেমন এক সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে। অহংজ্ঞানেই অধর্ম্ম এবং তদভাবেই ধর্ম্ম; আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের উদয়। এই অহং-

বিনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং শুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশের নামই নব জীবন, বা নূতন মানবের জন্ম অথবা দ্বিজাত্মা হওয়া। এই অহংতাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা এবং তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্যতা। এই অহংভাবেই ঋষিদিগের যোগভঙ্গ এবং তার বিনাশই ব্রহ্মযোগ। ...ঈশার সমস্ত সাধনের ফল আমিত্ববিনাশ। ...তিনি কেবল আত্ম ইচ্ছা নিরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে মগ্ন ছিলেন। ...এই আত্মবিনাশে সমস্ত বিলয় ও পুণ্যের বিকাশ। সেই ইচ্ছাজলধিতে বিলীন হইয়া 'আমি নাই' ও 'আমি গিয়াছি' এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। তিনি বলিতেন না, প্রচার করিতেন না, সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিত।" (পৃঃ ৩৯-৪০)

"পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাণের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহা অভাব পক্ষের, কিন্তু ভাব পক্ষের নির্ব্বাণের স্বতন্ত্র লক্ষণ। তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, কিন্তু ধ্বংস বা শূন্য ভাব নহে। তাহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব ও নির্ম্মল সত্ত্বা; নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, পরিশুদ্ধি, নির্ব্বিকার সত্ত্ব।" (পৃঃ ৪০)

"ললিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে। ...তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনটীই বিশ্বাস করিতেন।" (বুদ্ধ স্বতন্ত্র অধ্যাত্ম জগতে বিশ্বাস করিতেন, বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্বদিগের অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন, শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন।) "বুদ্ধ বলিতেন, আমিত্ববোধই আত্মা। ইহার বিনাশে কে থাকে? শুদ্ধ নির্ব্বিকার এক সত্ত্ব থাকে।" (পৃঃ ৪২)

এই বিষয়ে ডেবিসন, ল্যাসেন, বোর্ণোফ, টর্ণার, চাইল্ডার প্রভৃতির ভ্রান্ত মত অঘোরনাথ স্বীকার করেননি। "নির্ব্বাণ যদি ধ্বংসই হইত, পরদুঃখে কি এত কাতর হইল, দুঃখী জীবগণের উদ্ধারের জন্য কাহার অন্তরে এত দয়া

হইল? সেই পরিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই সত্ত্বের বিনাশ নাই, নিত্য, ইহার জন্ম জরা মৃত্যু নাই। তবেই পরলোকে বিশ্বাস করা হইল। আর যে অবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ হয়, উহা নিত্য পূর্ণ অনন্তজ্ঞান, চিরশান্তি, পূর্ণ পরিশুদ্ধি। সেই এক সচ্চিদানন্দ পুরুষে মগ্ন ভাব। ফলত সমাধিতত্ত্ব প্রতীতি করিলে নির্বাণসম্বন্ধে সমুদায় ভ্রম বিদূরিত হয়।"

"বুদ্ধদেব তৎকালে যে পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক অসার ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করচার্য্য পর্য্যন্ত মহাত্মা সুগতের নির্ব্বাণতত্ত্ব বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন।"

"এই বুদ্ধনয়নের প্রকৃত তাৎপর্য্য......প্রত্যাদিষ্টত্ব; কিন্তু কাহার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট? সেই এক পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা।" (পৃঃ ৪৩)

"সুতরাং নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে; ইহা চিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা।" (পৃঃ ৪৬)

"নির্ব্বাণ প্রাপ্তিতে তাঁহার সমুদায় দেবভাব স্ফুরিত হইয়া গেল।" "অতএব নির্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, পূর্ণ ধ্বংসও নহে।" (পৃঃ ৪৭)

"নির্ব্বাণ পরমমুক্তি, জীবন্মুক্তি, নবজীবন-লাভ, ভাগবতী তনুপ্রাপ্তি, সশরীরে স্বর্গভোগ।" (পৃঃ ৫০)

"সমাধি আবার চতুর্বিধ; বিবেক, একাতিভাব, উপেক্ষকতা ও স্মৃতিবিশুদ্ধি। ইহার প্রথম অবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূল-পরিদর্শন। ...বিবেক পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষু এবং উহা এক অলৌকিক জ্যোতি। এই ধ্যানে তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয়, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়।

"ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব (Generalization) হইতে একত্বে (Synthesis) অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। তৎকালে ভিন্ন বস্তুর আর জ্ঞান থাকেনা। তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ,

সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য এই সমুদয় বোধের অতীত হয়। তখন আত্মা মধ্যমাবস্থায় অবস্থিতি করে। চতুর্থ সমাধিতে আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়। এই আমিত্ব বা অহংভাব বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মল হয়।"

"অহংকারই পাপের মূল, তাহার বিনাশে পাপের বিনাশ, পুণ্যের উদয়, পাপজীবনের মৃত্যু ও ধর্ম্ম-জীবনের প্রাপ্তি ও জন্ম। এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তিরসের উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরমতত্ত্বের আবির্ভাব, অনন্তজ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়"

"এই নির্ব্বাণে চিত্ত পারমিতার অধিকারী হয়, পারমিতার উপর হৃদয় অবস্থিতি করে। এখানে শীল শব্দের অর্থ সাধুতা, বীর্য্য, সাহস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব, প্রণিধি— নিগূঢ় দর্শন।"

"এই নির্বাণের পর ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, সর্বশেষে বুদ্ধ। এই বুদ্ধ উন্নতির চরম অবস্থা। ইহা কেবল শাক্যসিংহেরই হইয়াছিল।" (পৃঃ ৫১-৩)

"বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিয়া পঞ্চচক্ষুতে চক্ষুষ্মান হইলেন। নির্বাণের সর্বোচ্চ ও পূর্ণাবস্থাতে শারীরিক চক্ষু ব্যতীত অপর চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিকচক্ষু লাভ করা যায়। মাংসচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু, দিব্যচক্ষু বুদ্ধচক্ষু। এই পঞ্চবিধ নয়নের দ্বারা তিনি মানবের অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ৫৬) "ফলত শাক্য যোগে নির্গুণ চিন্ময়বাদী, ব্যবহারিক অবস্থায় ব্রহ্মভূতবাদী অর্থাৎ সগুণেশ্বর সহ অভিন্ন ভাবে স্থিত্যভিমানী ছিলেন। এরূপ হইয়াও তিনি অহংকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পূর্বতন আর্য্য ঋষিগণ হইতে স্বতন্ত্র।" (পৃঃ ১৪৪)

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ অবতরণিকায় কয়েকটী তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তাও এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে লোকের অভিনব দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে,

সন্দেহ নাই। আজ হইবে কি কাল হইবে আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছিনা, কিন্তু হইবেই হইবে এই কথা বলিতেছি।" (পৃঃ /০-৶০)

"ঈশ্বর—শাক্য ঈশ্বর সম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। এ কথা ঠিক, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রতীত হয়। ···তবে কি আমরা মহামতি শাক্যকে নাস্তিক বলিব। না, তাহা বলিতে পারি না। তবে কি তিনি অজ্ঞেয়-বাদী? না তাহাও তাঁহার সম্বন্ধে বলা সাজে না। কেননা তিনি একালের অজ্ঞেয়বাদিগণের ন্যায় বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি অর্থাৎ একত্বলাভবর্জ্জিত নহে। তবে কি তিনি মানব-বাদী? না তাহাও নয়, কেন না মানবধর্ম্ম-বাদিদিগের আদর্শমনুষ্যগণের অস্তিত্ব নাই, তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবল সাধনার্থ মনঃ কল্পনা-সম্ভূত; আর ইহলোক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব, পরলোকের সহিত কোন সংস্রব নাই।" (পৃঃ ৶০)

"তিনি এক অনন্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। এই জ্ঞানবস্তু আকাশস্বরূপ, তাহা শূন্যাকাশ নহে, ধর্ম্মাকাশ। সুতরাং জ্ঞান পুণ্য এই দুয়ের মিলনে তাঁহার প্রাপ্য বস্তু। তবে কি তিনি প্রথম হইতেই এই বস্তু ধরিয়াছিলেন? না তাহা বলিতে পারিনা। তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, অন্তত তাঁহার সাধন-প্রণালী দেখিয়া এই প্রতীত হয় যে, তিনি এই অনন্ত পুণ্যময় জ্ঞানবস্তুকে চরমলভ্য নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতেন, তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞেয়। বস্তু স্বয়ং স্পর্শ না করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এই জন্য উদ্দেশ্যে অজ্ঞেয় বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তিনি এমন পথ ধরিয়াছিলেন, যে পথ দিয়া গেলে চরমে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইবে। সেই পথ এই যে, সিদ্ধমুক্ত পুরুষগণের জীবন আপনাতে প্রতিফলিত করা। সুতরাং এই সকল সিদ্ধমুক্ত পুরুষের চরিত্র তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় ছিল। ···তিনি যে

নির্ব্বাণ সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেন, এ নির্ব্বাণই তাঁহার নিকটে ঈশ্বর পদে অভিসিক্ত। নির্ব্বাণলাভের উপায়রূপে তিনি ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধমহাপুরুষ চরিত্র চিন্তাই প্রথম সোপান। এইরূপ চিন্তাতে তাঁহাদিগের ন্যায় চরিত্রবান্ হইয়া সমুদায় জগৎ ও আত্মাকে চিন্তাযোগে উড়াইয়া দিয়া নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। নির্ব্বাণে প্রবেশ এবং ব্রহ্মতে স্থিতি একই। ...ঋষিগণ জীবকে ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া অহংবস্তু স্থির রাখিয়া ব্রহ্মসহ এক হইয়া যাইতেন, শাক্য ব্রহ্মকে আত্মার ভিতরে ডুবাইয়া অহংকে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মসহ অভিন্ন হইয়াছেন, এ প্রভেদ সামান্য প্রভেদ নয়।" (পৃঃ ।/০)

জগৎ—শাক্যের মতে জগৎ কিছুই নয়। উহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী, সুতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং এই অজ্ঞানমূলক জগৎ সহ সেই জ্ঞানবস্তু অসংস্পৃষ্ট। এই জগৎ 'অস্তি নাস্তি' স্বভাব সম্পন্ন (অনিত্যত্ব)। 'অস্তিনাস্তি' সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সকলের নিকট প্রতিভাত না হইলে, এ মত সাধারণ কর্তৃক পরিগৃহীত হইত না। যাহা আছে অথচ থাকিবেনা, তাহার প্রকৃত স্বভাবই না থাকা। সমুদায় শূন্য, 'কিছুই নয়' পরিগ্রহ করিলে এক অস্তীতি ভাব সমুপস্থিত হয়। এই অস্তি ইতি ভাব অনন্ত জ্ঞানবস্তুর। উহাই ধর্ম্মাকাশ, উহাই নির্ব্বাণ, উহাই ব্রহ্ম।

আত্মা—এ ধর্ম্মে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কেন, এরূপ সর্ব্বশূন্যবাদ কেন? সমস্ত উড়াইয়া না দিলে এক অনন্ত জ্ঞানবস্তুকে আপনাতে বিলীন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? অনন্ত জ্ঞানবস্তু ভিন্ন যদি কিছু থাকে তবে ক্লেশমূল নিহত হইলনা। ...জ্ঞানমাত্র রূপে স্থিতিতেই বোধিসত্ত্ব আখ্যা হয়। জীবে দয়া, জীবের কল্যানার্থ সর্বস্বত্যাগ বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং নীচ আমির তিরোভাব

হইয়া অনন্ত জ্ঞান সহ অভিন্নভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাবস্থায় স্থিতি 'একান্ত অনাত্মবাদের' দোষ অপহরণ করিতেছে।

পরলোক—যাহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস নাই, ব্যাকরণ প্রচলিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহারাই নাস্তিক। বৌদ্ধধর্ম্ম কখন এ দোষ সংস্পৃষ্ট নহে। ইহাতে আত্মার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে দশটী ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। সে ধর্ম্ম কিরূপে নাস্তিক্য-দোষে দূষিত অভিহিত হইবে।

সাধন—বৌদ্ধধর্ম্মে উপাস্য নাই, সুতরাং কাহার উপাসনা হইবে একথা বলা যায় না। যাঁহারা যোগাবলম্বন করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগের জন্য ইহাতে উপাসনাপদ্ধতি বিলক্ষণ আছে। বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বুদ্ধ-বস্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সুতরাং প্রাণিসমূহকে বুদ্ধ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া গন্ধমাল্য বিলেপনাদি দ্বারা পূজা করিবে, চৈত্যাদির সেবা করিবে। ···পিতামাতা গুরুজন প্রভৃতির সেবাও ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই তো গেল বাহিরের পূজা-অর্চ্চনার কথা, আন্তরিক চিন্তাতেও আয়োজনের ক্রটী নাই। প্রথমত পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র-চিন্তন, দ্বিতীয়ত যোগোক্ত উপায় অবলম্বন। ···এ ধর্ম্মে সাধন এমন দৃঢ়তর যে, অপরি-জ্ঞেয়বাদী মানবধর্ম্মবাদী কেহই ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে, কেননা তাহারা সাধনবিহীন, বৈরাগ্যবিহীন, ধর্ম্মাচারবিহীন।

নির্ব্বাণ—ইহা অভাব নহে, অন্য সমুদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া সত্য জ্ঞান প্রেমাদির একান্ত স্থিতি। ···তিনি নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে একই বস্তু ছিল। নির্ব্বাণে অহং তিরোহিত, ব্রহ্ম অহংরূপে বিদ্যমান।

দর্শন—বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পূর্ব্ব দর্শন যথা—জৈমিনি, বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য ও বেদান্ত সকলের অনৈক্য প্রদর্শন সহজ। শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ তাঁহার বিরোধীগণ বলিয়াছেন। শঙ্কর নামমাত্র

ঈশ্বর মানিতেন, কেননা মায়াতে আবৃত ব্রহ্মাংশ ঈশ্বর, মায়ার অপায়ে ঈশ্বরেরও বিনাশ না হউক, তিরোধান। ব্রহ্ম স্রষ্টা নহেন, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই মিথ্যা জগৎ নির্ম্মাণ করে। জীবও এইরূপ মায়াকৃত। সুতরাং শঙ্করের মতে ঈশ্বরও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, এক ব্রহ্মবস্তু আছেন। যদি বুদ্ধ সহ শঙ্করের সকল বিষয়ে ঐক্য হইল তবে প্রভেদ কোথায়? ···শঙ্করমতে মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি, গলে গৃহীতের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ···বৌদ্ধমতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্করমতে অহঙ্কার হেয় বটে, কিন্তু অহম্প্রত্যয় এবং ব্রহ্ম এক সামগ্রী। বৌদ্ধমতে কোনরূপে অহমের গন্ধ নাই। শঙ্কর মতে অহং বা জীবই ব্রহ্ম, বৌদ্ধমতে অহংও নাই, জীবও নাই, এক অনন্ত জ্ঞান-বস্তুই বিদ্যমান। জীবকে শঙ্কর ব্রহ্মে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, অহংকে ব্রহ্মরূপে স্থির রাখিয়াছেন। বুদ্ধ আত্মাকে বা অহংকে তিরোহিত করিয়া সেখানে ব্রহ্মকে আনিয়া বসাইয়াছেন।

৩। 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন'—চিরঞ্জীব শর্ম্মা, ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব প্রভৃতি।

ব্রহ্মসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের নূতন সম্পদ। রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর কয়েকজন সহসাধকও তাঁকে অনুসরণ করে শতাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তখন ব্রহ্মসঙ্গীতের সংখ্যা অল্প ছিল, সুর classical ও ভাষা সংস্কৃতবহুল ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্রেরা ভাবে এবং ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তখন ভাষা বিশুদ্ধ-বাংলা এবং সুর classical ছিল। ব্রহ্মানন্দের যুগে, মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনার প্রচলনের সঙ্গে, ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাষাও ক্রমে সহজ-বাংলা এবং সুর রামপ্রসাদী, বাউল ও ভাটিয়ালি দাড়ায়। ঐ সব ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের অধিকাংশই চিরঞ্জীব শর্ম্মা (সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্য-

নাথ সান্ন্যাল) ও ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব রচিত। তার ভিতর তখনকার সাধনার ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ ব্রহ্মসঙ্গীতকে আরো সম্পদশালী করে তোলেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ঐ সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এবং উপনিষদ্ ও কালিদাসের সম্মিলিত-ভাব-বৈচিত্রে সমৃদ্ধ করে ও মিশ্রসুরের প্রবর্ত্তন করে ব্রহ্মসঙ্গীতকে আরেক পর্য্যায়ে এনে ফেলেন। আধ্যাত্মিকতায় রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গানের সঙ্গে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাধনার খুব সাদৃশ্য দেখা যায়—আরেক শ্রেণীর গান আছে, যা ভাবে ও ভাষায় চিত্তকে মুগ্ধ ও উন্নত করে কিন্তু গভীর ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে চলে না। ব্রহ্মসঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে, প্রথম দিকে বীণা, তানপুরা ও একতারার ব্যবহার ছিল; ইদানীং হার্মোনিয়াম অর্গান, বেহালা, তবলা প্রভৃতি দেখা দিয়েছে। কীর্ত্তনের সঙ্গে খোল ও কর্ত্তালের ব্যবহার বরাবরই দেখা যায়।

শ্রীকেশবচন্দ্রের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সেই ভাবের সঙ্গীত ও কীর্ত্তন রচনা করতেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মানন্দের উপাসনার স্বর্গীয় সুরে পূর্ণ সহস্রাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত, আজও ভক্তমণ্ডলীকে পুলকিত করে, স্বর্গের প্রেরণা দান করে, উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই প্রমথলাল সেন মহাশয় ১৯১১ খৃঃ বার্লিন নগরে 'ধর্ম্মমহাসভায়' এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—'In our hymns a new Bible' ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব ব্রহ্মানন্দের প্রিয় অন্তরঙ্গ সাধক ছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ এবং কুঞ্জবিহারী সমবয়স্ক ছিলেন। কুঞ্জবিহারীও সহস্রাধিক সঙ্গীত ও কীর্ত্তন রচনা করেছিলেন। সাধুসমাগমের পর যে সব ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হয় তার দুটী আগে দেওয়া হয়েছে, এখানে আরো চারটী দেওয়া হল। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। তার ভিতর 'নববৃন্দাবন' অর্থাৎ ধর্ম্মসমন্বয় নাটক (১৮৮২ খৃঃ) বিখ্যাত। এই অভিনয়ের কথা নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব রচিত' নাটকপ্রসঙ্গে পরে আলোচিত হবে।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম অক্টোবর মাসে ১৯৪০ খৃঃ, নবদ্বীপের কাছে চক-পঞ্চানন গ্রামে এবং মৃত্যু ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ খৃঃ কলিকাতায়। প্রথম জীবনে তিনি যাত্রার দলে গান ও কীর্ত্তন ক'রতে আরম্ভ করেন। ভগবানের বিধানে ঐ সময়ে তিনি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে পড়েন এবং বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে ব্রহ্মানন্দের কাছে আনেন। ব্রহ্মানন্দের স্পর্শে ত্রৈলোক্যনাথের জীবনে মহাপরিবর্ত্তন আনে। সামান্য মানুষ ভক্তসঙ্গ লাভ ক'রে ভগবদ্ কৃপায় যে কি হতে পারে ত্রৈলোক্যনাথ তার জীবন্ত উদাহরণ। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি প্রচারক ব্রত গ্রহণ করে, শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন করে যান; জ্ঞানে ও শিক্ষায় উন্নত হয়ে, বহু গ্রন্থ রচনা করে, নবধর্ম্মের প্রচার ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে চিরঞ্জীব শর্ম্মা নাম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, নগরকীর্ত্তন, নাটক, কাব্য, পাঠ্যপুস্তক কতই তিনি রচনা করে গেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে 'শান্তিনিকেতনে' নিমন্ত্রন করে এনে তাঁর উপাসনা ও গানের সমাদর করেছেন। এঁর রচিত 'গীতরত্নাবলী', 'ভক্তিচৈতন্য চন্দ্রিকা', 'নববৃন্দাবন নাটক' ও 'বনমালা' বিখ্যাত। তাঁর তিন কন্যা। শ্রীমতী অরুণা আসফ্ আলী তাঁর দৌহিত্র দৌহিত্রিদের ভিতব একজন।

ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের 'সাধক-রঞ্জন' (সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন) ১ ভাগ ১৩০৪ সন, পৌষ বা ১৮৯৭ খৃঃ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিষয়ে ভাদ্র ১৮২৬ শকের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায়, যা পাওয়া গেল তা এখানে উদ্ধৃত হল—

"মুদিয়ালিস্থ (গার্ডেন রীচ) আমাদের কীর্ত্তনমত্ত ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেব স্বীয় বাসভবনে বিগত ১৮ই ভাদ্র ১৮২৬ শক (১৯০৪ খৃঃ) শনিবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যক্তির নিকটে অপরিচিত নহেন। হিন্দুসমাজেরও অনেকের নিকট পরিচিত। তাঁহার কীর্ত্তনে ও সঙ্গীতে কত লোক ভক্তিস্রোতে

উপকৃত হইবেন। তদ্রচিত সহস্রাধিক সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে। আরও কত সঙ্গীত অমুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক অবস্থা সঙ্গীতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেব একজন আরমানী জমীদারের কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি রোগে যখন পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে অপটু হইয়া পড়েন, তখন সাহেব তাঁহাকে 'পেন্‌সন্‌' দেন, সে পেন্‌সন্‌ তিনি শেষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। (ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবীও তাঁহাকে নিয়মিত অর্থ সাহার্য্য করিতেন এবং 'সাধকরঞ্জন' বইটি ছাপার ব্যয়ভার বহন করেন।

ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেব 'নববৃন্দাবনে' যে (মাতালের) পাঠ অভিনয় করিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর হইবে (১৮৭৪ খৃঃ) উক্ত ভ্রাতা একদিন আচার্য্যদেবের কলুটোলাস্থ পৈত্রিক ভবনে যাইয়া তাঁহার প্রাতঃকালীন উপাসনায় যোগদান পূর্ব্বক একটী সঙ্গীত করেন। (এই তাঁহাদের প্রথম পরিচয়।) কুঞ্জবিহারী বাবুর সঙ্গীত শ্রবণে আচার্য্যের ভক্তির উচ্ছাস হয়, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে থাকে। ...উক্ত ভ্রাতা নব নব সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়া এবং গাহিয়া সর্ব্বদা আচার্য্যদেবের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের সহিত মিলনের পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবন দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিল, মুদিয়ালি ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন প্রাপ্ত হইল। বৎসরে বৎসরে আচার্য্য তথায় উৎসবে গমন করিতেন এবং সেখানে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেগুলি ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিশাস্ত্র হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রায় প্রত্যহ তিনি এক একটী সঙ্গীত রচনা করিতেন। যে সংস্কৃত 'ব্রহ্মস্তোত্র' প্রাত্যহিক উপাসনার সময় পঠিত হয়। আচার্য্যের প্রদত্ত নামগুলি লইয়া কুঞ্জবিহারী দেব প্রথমত তাহা বঙ্গভাষায় সঙ্গীতাকারে রচনা করিয়াছিলেন, কিছুকাল তাহাই সমস্বরে গাওয়া হইয়াছে। পরে উপাধ্যায় তাহা সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

আচার্য্যদেব ভ্রাতা কুঞ্জবিহারীকে 'বিধানের কীর্ত্তনীয়া' নাম দিয়াছিলেন। ···উৎসবের সময় ব্রহ্মমন্দিরে ও নগরের পথে সঙ্কীর্ত্তনে তিনি নিজে প্রমত্ত হইতেন, অন্য সকলকেও প্রমত্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার যেমন বিশাল দেহ ছিল তেমন কণ্ঠস্বর গভীর এবং ভাবোচ্ছাস ও মত্ততা প্রবল ছিল। আচার্য্যদেব মাঘোৎসবের নগর সঙ্কীর্ত্তনের পর কমল কুটীরে নবনৃত্যের সময় তাঁহার স্কন্ধ ধারণ করিয়া নৃত্য করিয়াছেন।

মৃত্যুর প্রাক্কালে কলিকাতা হইতে কোন বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তাঁহার নাম স্মরণে আছে কি?" তখন তাঁহার কণ্ঠশ্বাস ও হিক্কা হইয়াছিল, প্রাণবায়ু প্রয়াণের উপক্রম। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি নামরসে ডুবিয়া আছি।

কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন

বাউলে খ্যামটা

নববিধানের তরী দয়াল হরি, ভাসিয়েছেন ভবসাগরে।
কেউ আর রবেনা বাকি, পাপী তাপী স্বর্গে যাবে সশরীরে।
অকূলের কাণ্ডারী, ভাসিয়ে তরী, লুকিয়ে আছেন
হা'লটী ধরে'
হোক্‌না হাজার ঝড় তুফান, ডাকুক্‌না বান, ডুববেনা
কোন প্রকারে।
আয় কে যাবি পারে, ব'লে মাঝি ডাক্‌ছে সবে মধুর স্বরে;
লাগ্‌বেনা পারের কড়ি, বল্‌লে হরি, অনায়াসে যাবি তরে।
মহম্মদ শাক্য মূশা, গৌর ঈশা টানিছে দাঁড় ভক্তি ভরে;
গেয়ে হরি নামের-সারি, সারি সারি যাচ্ছে জগৎ
আলো ক'রে।
দেখিলে তরীর গঠন, মন উচাটন, হয় ভিতরে যাবার তরে;
কিন্তু থাক্‌তে দ্বেষাদ্বেষ, নিষেধ প্রবেশ, লেখা আছে
স্পষ্ট অক্ষরে।
—কুঞ্জবিহারী দেব

কীর্ত্তনসিন্ধু—একতালা

নববিধানের জয়রে, কর ঘোষণা।
যা'র গুণে হ'ল সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় রে। (কর ঘোষণা)
সত্যে সত্যে ভেদাভেদ, ঘুচিল এবার রে;
প্রেমানলে গলে' সব হ'ল একাকার রে। (কর ঘোষণা)
যোগভক্তি কর্ম্মজ্ঞান, ত্যজিল বিবাদ রে;
বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ গায় একেশ্বর রে। (কর ঘোষণা)
ঈশামোহম্মদে জনক, আলিঙ্গন দেয় রে;
গৌরসিংহ শাক্যসিংহের গলাধরে' নাচে রে। (কর ঘোষণা)
সত্যের বিজয় ডঙ্কা, বাজিল জগতে রে;
উড়িল বিধান নিশান ভারত-আকাশে রে; (কর ঘোষণা)
গাঁথিয়া বিধানসূত্রে, ভক্তরত্ন হার রে;
পরিগলে সবে মিলে, বল জয় জননী রে। (কর ঘোষণা)
ভূত ভবিষ্যৎ কাল, হ'ল বর্ত্তমান রে;
মিশিল নববিধানে প্রাচীন বিধান রে। (কর ঘোষণা)

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা

মূলতান—একতালা
(প্রভাতী)

জয় ঈশা মুসা মহম্মদ, শাক্য গৌর সুন্দর।
জয় ব্রহ্মানন্দ, (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্ব ধর্ম্ম সঙ্কর।
জনক নানক শুক যাজ্ঞবল্ক্য, ধ্রুব শিব যোগিবর;
প্রহ্লাদ নারদ, রাম বাসুদেব, কবীর তুলসী শঙ্কর।
অদ্বৈত নিতাই, জগাই মাধাই, শ্রীবাস গদাধর;
দাস রঘুনাথ, সেন রামপ্রসাদ, যোহন পল লুথর।
রূপ সনাতন, রাজা রামমোহন, হরিদাস সাধু অঘোর;
রায় রামানন্দ, দাউদ দেবেন্দ্র, এব্রাহেম নরেশ্বর।
সাবিত্রী মৈত্রেয়ী, গার্গী সীতা সতী, যত সুরবালা অমর;
রাবেয়া সুজাতা, মনিকা সারদা, হামিদা গুণসাগর।
স্বদেশে-বিদেশে, ইহ-পরলোকে, সাধু সাধ্বী নারী নর;
স্মরিয়া সকলে, উঠ হরি বলে' হবে' নিরমল অন্তর।

—চিরঞ্জীব শর্ম্মা

ঝিঁঝিট—কীর্ত্তন

(খয়রা) চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাবরস লীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ
ডুবিছে উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রূপ ধরি।
মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান
ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে, আমার সকল সাধ মিটে গেল)
এখন আনন্দে মাতিয়া, ছবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

(ঝাঁপতাল) টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি,
দূর ভেল জাতি কুলমান;
কাঁহা হাম্ কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি করি, বঁধুয়া
করিলা পয়ান।
(আমি কেনই বা এলাম রে—প্রেমসিন্ধু তটে)
ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর, নাহি যাত
আপনা পসান;
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগৎবাসী, অ্যায়সাহি
নূতন বিধান
(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই!)
—চিরঞ্জীব শর্ম্মা

৪। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' (বা A Compilation of Theistic Texts) তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৮৬ খৃঃ—

আমরা আগেই দেখেছি যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাধনার ধারায় ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী নূতন আকার ধারণ করে। তখন থেকে উপাসনার শেষ অংশে পৃথিবীর সকলের জন্য প্রার্থনা এবং তার পরেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সঙ্গে সহানুভূতি ও একাত্মতা সাধনের স্থান রাখা হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই 'শ্লোকসংগ্রহ' বইটি সঙ্কলিত হয় এবং উপাসনার শেষভাগে তার থেকেই সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রবচন পাঠ করা হয়। সেই সময়ে কেউ কল্পনায়ও আনতে পারতো না, যে

বেদ বাইবেল ও কোরাণ পুরাণকে সত্যসত্যই একত্র নিবদ্ধ করা যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় ইতিপূর্ব্বে যুক্তি বিচারের সাহায্যে একেশ্বরবাদকে বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রের সাধারণ সত্য বলে প্রকাশ করেছিলেন। আরও, যাতে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে সেই একেশ্বরবাদের ভূমিতে মিলতে পারে, সেই জন্য ১৮৩০ খৃঃ তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' গৃহ নির্ম্মাণ করান। এইভাবে তিনি সকল ধর্ম্মের ঐক্যের পথ রচনা করেন; কিন্তু উপাসনায় বেদউপনিষদের বচন পাঠ করাই ব্যবস্থা ছিল। ৩৬ বছর পরে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় নূতনতম আকারে Comparative Religion দেখা দিল, উপাসনায় স্বজাতীয় ধর্ম্মের শাস্ত্র পাঠের জায়গায় সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রের বচন পাঠ করা আরম্ভ হল। এই জন্য ব্রহ্মানন্দকে তাঁর প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিচ্ছেদ বরণ করে নিতে হয়েছিল।

'শ্লোকসংগ্রহের' প্রথম সংস্করণে (১৮৬৬ খৃঃ) হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টিয়, মোহাম্মদীয় ও পারসিক শাস্ত্রের বচন মাত্র ছিল, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বচন তখন নেওয়া হয়নি। ১৮৭৯ খৃঃ সমন্বয়-অধ্যয়ন আরম্ভ হল, ১৮৮০ খৃঃ শাক্য-সমাগম হয়, ১৮৮১ খৃঃ সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' বইটী প্রকাশিত হল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্টতা দেখা দিল এবং ১৮৮৬ খৃঃ 'শ্লোকসংগ্রহের' তৃতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কৃতশাস্ত্র 'ললিতবিস্তরের' বচন স্থান পেল; ঐ সঙ্গে শিখ ও চীনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনও নেওয়া হল। ক্রমে ১৯০৪ খৃঃ বৌদ্ধধর্ম্মের পালি শাস্ত্র 'মহাপরিনিব্বানসুত্ত' এবং ১৯৫৬ খৃঃ 'ধম্মপদের' বচন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'শ্লোকসংগ্রহ' বইটীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মবন্ধু দেশ বিদেশের বহু মনীষি ও ধর্ম্মযাজকেরা একটী নূতন পথের সন্ধান পান এবং সেই দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৮৭০ খৃঃ তাঁরা ব্রহ্মানন্দকে বিলাতে নিমন্ত্রণ করে তাঁকে নিজেদের মধ্যে এনে দেখলেন, তাঁর সঙ্গে মিশলেন, তাঁর বক্তৃতা ও উপাসনা শুনলেন। তাঁরা কিরকম

ভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন মোক্ষমূলার, মার্টিনো, মিস্ কব, স্পীয়ার্স প্রভৃতির রচিত পুস্তকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলার 'শ্লোকসংগ্রহের' আদর্শে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ একত্রে প্রকাশ করার প্রস্তাব Oxford বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান। তাঁরা সম্মত হন। অধ্যাপক ঐ সংবাদটী ব্রহ্মানন্দকে সঙ্গে সঙ্গে জানান। ব্রহ্মানন্দ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১লা কার্ত্তিক ১৭৯৯ শক (১৮৭৭ খৃঃ) প্রকাশ করেন—

"পণ্ডিত মোক্ষমূলারের প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্ম ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার হইয়াছে। তিনি প্রধান সম্পাদক হইয়া আর কয়েক জনের সাহায্যে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।"

তখনও কিন্তু ইয়োরোপীয় জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত হয়ে, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণকে এক সঙ্গে গ্রথিত করতে রাজী হননি। তাঁরা খৃষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে অন্যান্য শাস্ত্রের উপরে মনে করতেন। কিন্তু দু'একজন ছিলেন যাঁরা এবিষয়ে নূতন বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন যথাঃ—বিলাতে ১৮৭৩ খৃঃ ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মবন্ধু Rev. Moncure D. Conway একটী চমৎকার সঙ্কলন 'The Sacred Anthology : A Book of Ethnical Scriptures' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রকে সমান ভাবে স্বীকার করে অখণ্ড-ধর্ম্মের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আমেরিকায়ও ১৮৭৩ খৃঃ ব্রহ্মানন্দের এক ধর্ম্মবন্ধু Samuel Johnson একটী সুন্দর বই—'The Sympathy of Religions' প্রকাশ করে নববিধানের অখণ্ড ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর 'Prayers of the Ages' ও 'Hymns of the Ages'—Compiled by Caroline S. Whitmarsh, 'The Great Religions' (I & II) by James Freeman Clarke D. D. (on Comparative Theology and Comparison of all Religions) বই ১৮৭১ ও ১৮৮২ খৃঃ প্রকাশিত হয়। Clarke সাহেব ছিলেন Unitarian Church এর একজন

বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক। আমেরিকায় ১৮৮৩ খৃঃ আরেকটী চমৎকার সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। বইটীর নাম 'Sacred Scriptures of World Religion'—Compiled, Retranslated, Adapted and Arranged by Martin Kellog Schermerhorn ; এই বইটীর তিনটী সংস্করণ হয়েছিল।

দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৮৮৬ পর্য্যন্ত এই ভাব ধারা ক্রমশ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। পারস্য দেশেও বাহাই দলের নেতা ব্রহ্মানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে (১৮৮২ খৃঃ) সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করে সকল ধর্ম্মের শাস্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। জাপানের Kagawaও ছিলেন ঐ ভাবের সাধক ও প্রচারক। ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পরেও ভাই প্রতাপচন্দ্র চারবার ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর কাছে নববিধানে অখণ্ড ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করে আসেন।

১৮৮৭ খৃঃ দেখতে পাই Strasbourg-এর Geblois ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লেখেন—

"Does it still exist some exemplary of the first edition of your Brāhmo Dharma Śloka-Saṁgraha and could I have it ?"

এই চিঠি প্রমাণ দিচ্ছে যে প্রথম প্রকাশের ২০ বছর পরেও 'শ্লোকসংগ্রহের' ভাবধারা শুষ্ক হয়ে যায়নি—পৃথিবীর মধ্যে তার প্রভাব কাজ করছিল। Geblois আরেকটী পত্রে প্রতাপচন্দ্রকে জানান যে তিনি কয়েক খণ্ডে, "Les Bibles etc—l' Humanite" নামে একটি ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্কলন প্রকাশ করেছেন এবং তার দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাণী দিয়েছেন।

অধুনাতম কালে 'শ্লোকসংগ্রহের' মতন দুটী বিখ্যাত সঙ্কলনের নাম করা যায়—

'The Worlds Great Scriptures'—Edited by Lewis Browne (1946), New York ও 'The

বৌদ্ধধর্ম্ম পুনরাবিষ্কারের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় বলে এখানে উদ্ধৃত হল—

Each Dispensation has its precursors. Heaven-appointed heralds usher it in. There is an upheaving of the mind, a fermentation, an agitation; preparatory struggles and premonitory symptoms manifest themselves; workers, as if sent in advance clear the way and prepare the public mind. And then, when all is ready the promised Dispensation appears on the stage, not too soon nor too late. All Dispensations recorded in history illustrate this truth, and the New Dispensation forms no exception to the rule. For more than a quarter of a century signs of religious liberalism of a revolutionary character have been witnessed in the world of thought, and various movements have been set on foot, more or less unsectarian and eclectic, with a view to make men's faith more catholic and less narrow. In the West, the Broad Church School and the more advanced Unitarians in the van, and the numerous scientists of the age, whose name is legion, in the rear, have fought successfully with narrow Calvinism, and widened the basis of Christianity so as to include science and philosophy. In India, the Brahmo Somaj and English education have proved chiefly instrumental in liberalizing Hinduism and imbuing it with the spirit of Christ. More direct and special agencies for the synthetic union of all churches and Dispensations have come to operate upon the development of theological science and in more definite shapes has the literature of eclectic religion organized itself. Foremost among these is the Science of Religion, or Comparative Theology, which is the leading fore-runner of the present Dispensation. All honour to that noble Apostle of Theological Science, Professor Max Muller, who uniting in himself the Christian scholar and the Hindu Rishi, has discovered a ground of scientific unity

beneath Eastern and Western faith! Next in importance stand the well-known and popular Series of Works on "Non-Christian Religious Systems", published under the auspices of the Society for Promoting Christian Knowledge. In this series are included Hinduism and Islam, Buddhism and Confucianism. The able writers who have contributed to the series have not only dispassionately analysed those systems, but have boldly pointed out parallelisms between Christian and Non-Christian thought and sentiment. Such a course of theological instructions, coming from a recognised Christian association, cannot fail vastly to influence the age for the reception of the New Gospel of harmony. Another helpful publication put forth in this direction is the "Sacred Anthology—A Book of Ethnical Scriptures" by Mr. M. D. Conway, in which, as the title imports, is collected the wisdom of all ages and all sects, and which may therefore appropriately serve as a sciptural handbook of the present Dispensation. The only other pioneer we shall mention is the cultivation of Oriental Literature, on an extensive scale among Western scholars, a circumstance which has contributed greatly to unite Asia and Europe, and especially India and England in literary and theological confraternity. These are the blessed heralds and harbingers appointed by Providence to clear the way of the New Dispensation, and establish its kingdom in the present age.

—The New Dispensation, Thursday, June 2, 1881

৫। 'The Faith and Progress of the Brahmo Samaj' (1882) ; 'The Lowell Lectures' (1893)

—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে নবধর্ম্মের সাধনায় ও প্রচারে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার ভিতর প্রতাপচন্দ্র অন্যতম। ইনি ব্রহ্মানন্দের বাল্য-সহচর, জীবনীকার ও নবধর্ম্মের

ব্যাখ্যাতারূপে পরিচিত। ১৮৪০ খৃঃ হুগলীর বাঁশবেড়ে গ্রামে এঁর জন্ম এবং ১৯০৫ খৃঃ কলিকাতায় এঁর জীবন অবসান হয়। ১৮৬২ খৃঃ ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ব্রত নেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই ব্রত পূর্ণরূপে পালন করে যান। ইনিও ভগবৎদত্ত অসাধারণ বাগ্মীতাশক্তি, লেখনীশক্তি ও নেতৃত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক যুবকদলের পথ পরিদর্শক, Indian Mirror, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, Theistic Annual, Theistic Quarterly, Interpreter প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক, এবং বিদেশে সকলের অত্যন্ত পরিচিত ধর্ম্মপ্রচারকরূপে, তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের উচ্চতা, পাণ্ডিত্যের গভীরতা, অন্তদৃষ্টির সূক্ষ্মতা সকলকেই স্পর্শ করতো। বাংলা ও ইংরাজী—এই দুই ভাষাতেই তাঁর অপূর্ব্ব অধিকার ছিল, তাঁর 'আশীষ', 'Life and Teachings of Keshub Chunder Sen', 'স্ত্রীচরিত্র', 'Heart Beats', 'Spirit of God' প্রভৃতি গ্রন্থ অমর হয়ে আছে ও থাকবে।

'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশের সময় যে তীব্র বিপক্ষতা উপস্থিত হয়েছিল তার সমাধানে ভাই প্রতাপচন্দ্রের অকাট্য ও প্রাণস্পর্শী যুক্তি বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে অন্য যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তার ভিতর তাঁর সহযোগী দেশনায়ক আনন্দমোহন বসুও ছিলেন। 'শ্লোকসংগ্রহ' সঙ্কলনে প্রতাপচন্দ্র ইহুদীশাস্ত্রের অংশ সঙ্কলন করেছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ অধ্যেতাব্রত সাধনের সময় তাঁকে খৃষ্টধর্ম্মের অধ্যেতাব্রত দেওয়া হয়। ১৮৮৩ খৃঃ আমেরিকার Geo. H. Ellis, Boston তাঁর বিখ্যাত বইটি The Oriental Christ প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদার খৃষ্টিয় জগৎ ঐ বইটিকে খুবই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল বিধানের মিলনভূমি যে ঈশা, এই বার্ত্তা ব্রহ্মানন্দ ১৮৬৬ খৃঃ 'Jesus Christ—Europe and Asia' বক্তৃতায় প্রচার করেছিলেন। সেই কথাই নূতন ভাবে প্রকাশিত হল এই বইটিতে। ১৮৭৪

১৮৮৩, ১৮৯৩ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র চারবার ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়ে নববিধানের নূতন আলোকের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১৮৮০ খৃঃ 'নববিধান' ঘোষণা করেন। সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল 'নববিধান কি ?' তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নির্দ্দেশে ভাই প্রতাপচন্দ্র 'The Faith and Progress of the Brahmo Somaj' বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটির শেষ ভাগে দুই অধ্যায়ে মহাজনগণ ও সাধুসমাগম বিষয়ে, তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ১৮৯৩ খৃঃ ভাই প্রতাপচন্দ্রকে সদস্যরূপে Chicago Parliament of Religions আমন্ত্রণ করেন। ঐ সভায় যে তাঁর শ্রেষ্ঠস্থান ছিল, তা' কার্য্য-বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায়। ঐ সভার কাজ শেষ হলে, তাঁকে Lowell Institute, Boston ঐ বৎসরের Lowell Lectures দেবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন। Lowell Institute ১৮৩৯ খৃঃ Boston সহরে John Lowell এর (১৭৯৯-১৮৩৬ খৃঃ) দানে স্থাপনা করা হয়। সমস্ত পৃথিবীর ইংরাজী ভাষাভাষীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে বক্তৃতা করার জন্য ঐ Institute আহ্বান করে থাকেন। ১৮৯৩ খৃঃ ভাই প্রতাপচন্দ্রকে সেই সম্মান তাঁরা দেন। তাঁর বক্তৃতা এবং delivery এত চিত্তাকর্ষক ও প্রেরণাময়ী হয়েছিল যে, তাঁর বক্তৃতায় বহু জনসমাগম হতে থাকে এবং সেইজন্য এবেলা ও ওবেলা, দুবার করে তাঁকে একই বক্তৃতা দিতে হয়। Lowell Lectures গুলি যেমন সারগর্ভ, তেমনি পাণ্ডিত্যের ও বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দেয়। ঐ বক্তৃতামালায় তিনি ভারতের ধর্ম্মের ইতিহাস ও তার ভিতর বৌদ্ধধর্ম্মের স্থান চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেন। তার কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

DECLINE OF HINDUISM

There seems to be a fatality in all human progress and after centuries of sovereignty Hinduism declined. The first reason was the prevalence of ceremonialism. I

have said there is no spirit without form, no form without spirit; but if the spirit should depart from the form, and if you still persevere to retain that form, it will be tied to your back as when a corpse is tied to the back of a living man. The corpse of a dead form, of a lifeless bygone monasticism, of a ritualism, of a worthless ecclesiasticism is a dead weight, and will carry down the souls of those who bear them to death. Whatever the forms of the Vedic ceremonialism then, in the course of time the spirit fled from them. But still the forms were there. Worldliness overcame the inspiration of religion. They had not courage to speak the plain words of life to those that sat at their feet to learn; and form after form degraded the instincts of the people and the principles of religion. So great were the sacrifices that six hundred and nine horses were killed on a single day. People every day became disgusted; and then there slowly arose a man whose heroic protest made India tremble from one end to the other, —Gautama, Sakya-Muni, Buddha, Siddhartha. Single-handed and singlevoiced he uttered a protest which, like a mighty trumpet, rang through the still and contented air of the India of those days.

The religion of Buddha, from one point of view, is a protest It is a protest against quarrelsome theology, a protest against priestcraft. On the other hand it is a sublime affirmation of humanity, an affirmation of the knowledge of causes and consequences in human happiness. The overcoming of all desires and temptations of life is its morality, and its aim. These three—philosophical insight, sublime humanity, and absolute self-conquest—end in a state of repose or blessedness of Supreme Joy, and the sense of unity called *Nirvana*.

RISE OF BUDDHISM

Strange to say that, though not even the name of God is once taken in these teachings, yet Buddhism

grew and grew until the whole land was overshadowed by its influence. One great man flourished in Buddhistic times, like unto Constantine in Christian times, but a much better and sincerer man. His name was Asoka : he was the Emperor of India. So well did he carry out the precepts of his great master that in the end he renounced his kingdom, and became a mendicant, and sent his son to preach religion in Ceylon, and sent his daughter to Ceylon to establish a religious order of nuns. I will give you the edicts of Asoka, which were inscribed all over the country. From this you will know the spirit of Buddhism.

FOURTEEN EDICTS OF ASOKA, 260 B. C.

1. Prohibition of the slaughter of animals for food or for slaughter.

2. Provision of medical aid for men and animals, and on plantations and wells on the roadside.

3. Order of humiliation every five years, and re-publication of the moral precepts of Buddhistic faith.

4. Comparison between former state of things and those under Asoka.

5. Appointment of missionaries for foreign countries, to convert the people and foreigners.

6. Appointment of inspectors and guardians of public morality.

7. Expression of desire that there may be uniformity of religion and equality of rank.

8. Contrast of carnal pleasures under other reigns; and pious enjoyments under Asoka.

9. Inculcation of the precept that true happiness is in virtue, which surely brings heaven.

10. Contrast of the vain glory of the world with the reward which Asoka looks beyond.

11. Inculcation of the precept that the greatest

charity is the giving of virtuous principles.

12. Address to all unbelievers.
13. Rather unintelligible.
14. Summing up of the whole.

DECLINE OF BUDDHISM

Thus Buddhism, without God, without soul, without prayer, without worship, conquered India. As a protest against inhumanity, its humanity conquered. As a protest against self-indulgence, its sublime morality conquered. As a protest against false theology, its simple teachings gained the day. But in the course of time the spiritual instincts of the people outgrew all that. They hungered for God, but Buddhism gave them no God. They hungered after spiritual things, but Buddhism did not furnish them. They hungered after worship and prayer, but there was none in Buddhism. And, after Buddhism had conquered Hinduism and reigned for fifteen hundred years, what happened to it? By a strange economy of Providence, Buddhism was turned out of the whole country. And now, if you travel over Northern India and if you go to the wonderful tree under which Buddha received his enlightenment, you will see not a single Buddhistic devotee, not a single disciple of Gautama bending his knee. The temple is silent, the courts are deserted, the colossal image of the prophet is unhonoured and alone.

Such is the end of every system that ignores God. Such is the end of mere ethical culture For fifteen centuries Buddhism reigned in India and did it immeasurable good; but at last its Nemesis came, then Hinduism arose once more like a giant refreshed, like a mountain upheaval, like the waters of the sea Hinduism arose, and from every one of its strong-

holds Buddhism was dislodged, until in the twelfth-century there was no more Buddhism left: Hinduism was in the ascendant again.

BUDDHISM AND HINDUISM

Three periods are important in the development of modern religious life in India. The first is from the ninth to the thirteenth century of the Christian era. During this period Hinduism revived after the Buddhistic predominance. The second is from the thirteenth to the sixteenth century of that era, when Hinduism was gradually modified by the influence of Islam. And the third is from the sixteenth to the nineteenth century, when Hinduism came in indirect and direct contact with Christianity. The last time I spoke, I said that the great protest made against the religion of Sakya-Muni was in the ninth century, but it took nearly four hundred years for Buddhism to die and disappear from India. During these four hundred years Buddhism and Brahmanism were in daily conflict, Buddhism perpetually losing ground, and Brahmanism perpetually gaining ground. The feeling between the two religions will be clear to you, when I quote a well-known Hindu proverb of Gaya:

> "If a mad bull pursue you, rather die than take refuge in these three places,—in a grog shop, in a courtesan's house, and in a Buddhistic temple."

But during the four hundred years that these religions lay alongside of each other, and the fourteen hundred years preceding, when Buddhism had grown and flourished, it exercised no doubt considerable influence in the formation of new Hindu life. Buddhism owed everything to the pre-existing Hindu religion. Its philosophy was Hindu philosophy, slightly recast. Its doctrine of Nirvana was well-known in the ancient systems of Hindu thought. The theory of the transmi-

gration of souls notoriously existed as an indispensable article of faith among the sects of Hinduism. And Buddhist discipline, retirement, renunciation, monasticism—all its chief moral precepts, were derived mainly from Hindu teaching. But, if Buddhism owed much to Brahmanism, that debt was amply repaid by the obligations which Sakya-Muni threw upon the recrudescence of the Hindu faith. Buddhism humanised the Hindu religion. At one of the great sacrifices of the Hindu times, six hundred and nine beasts used to be sacrificed. To all these sacrifices Buddhism put an end for good and all. Then the toleration which characterised the Buddhist in their dealings with the Brahmins could not but influence the mild instincts of the Hindu nature. Siladitya, one of the Buddhist kings, gave alms to Brahmin priests and Buddhist Sramans indiscriminately, and treated both with the same reverence. Then, again, all the unspirituality and priestcraft which had slowly entered into the constitution of the Hindu religion and into Hindu society in the course of many centuries were purged away by the sublime system of ethics and personal character, which, if anything, was the speciality of Sakya-Muni's system.

Then, again, Buddhism gave to women an eminence, an education, a part in the share of the affairs of its churches which could not but tell upon the future of womankind in India. For the first time in history an order of female devotees was established by the Buddhists. In these various ways Buddhism influenced Hinduism.

BUDDHISM AND IMAGE-WORSHIP

But one great harm it did, not generally known, but very seldom pointed out, yet still there. A singular feature of the Neo-Hinduism that followed

the Buddhistic propaganda was its image-worship. How did image-worship first enter into the Hindu religious system? Not one of the four Vedas ever makes the slightest mention of image-worship. Not one of the Upanishads has the least allusion of it. And even so late as the fifth century after Christ, when the great law book called the Institutes of Manu was compiled, there was not only no image-worship, but this legislator, the greatest of all Hindu Legislators, emphatically forbade the worship of images in any form. How, then, does it happen that in modern times there is not one, there are not two dieties but thirty-three millions of deities, in the Hindu pantheon? Whence did it come? So far as my study and observation have gone, in my mind there is not the slightest doubt that this error emanated from Buddhism. Without the idea of a personal God, without any public worship, without any recognition of the soul as a free agent, without any prayers or invocations in which the Hindu heart has always found expression, how could Buddhism teach image-worship? Can there be a greater anomaly? Yet that very principle which forbade the recognition of God's existence and worship was mainly instrumental in producing the greatest idolatry. I will show you how. Though Buddha courted no personal worship, yet, as soon as he died, his millions of followers, in order that they might fully realise his benignant influence and glorious personality, began to make little images, hundreds of them, thousands of them, millions of them, and offered these to the temples. And if you dig into the soil anywhere near the great Buddhistic temple where Sakya-Muni had arrived at his enlightenment, or even in other Indian provinces, you will bring up images of Buddha by the cartload. Go to Burmah, to Thibet, to Ceylon, to China, to Tartary—go to every Buddhistic country, and

you will see the roadside, the homestead, the temple, the bazar, the place of worship, all crowded with images of Sakya-Muni in various stages and postures of his life. Whether as teaching, or as immersed in contemplation, or as making his missionary travels, or as lying on the bed of death, the various conditions of Sakya-Muni's life are portrayed in these numberless images. In the absence of a God, in the absence of a personal centre for reverence, the millions of Buddhist men and women substituted these images, and enshrined them, worshipped them, honored them, loved them, treasured them from age to age.

Not only was that so, but every relic of Buddha, a toe-nail, or a tooth, or a stray hair from his head, a thread from his garment, whatever could be got hold of, was reverently preserved by the Buddhist worshippers. The Hindus saw the great purpose which this practice served, and were not slow to imitate it But how? Why. I told you the other day the various forces and personalities that the Hindus worshipped in nature and in history. These gave them a fertile ground out of which to collect their deities, and embody them in images and forms, which the Buddhist taught them could be worshipped with such advantage. Such to my mind is the genesis of the Hindu idolatry of the day

"Faith and Progress" বইটির অধ্যায় দুটিও এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

PROPHETS

Strange that men, apparently earnest in the search of spiritual blessedness, should fail to behold the marvellous significance of the great lights of human character. Strange that men seeking God should be blind to his amazing self-revelation in the highest humanity. We never held that prophets were other than human. Their supreme humanity, their spiritual heroism, their un-

earthly sanctity, their unexampled love, forgiveness, and wisdom constitute their claims to our revering faith. Divinity is in them visible in the mighty virtues which beam and burst out of their character. It is impossible for any free earnest devout spirit striving and crying for the inner light not to pause before the examples and ideals left behind by them, and find in them the fragments of the full effulgence. It is unnatural not to feel an ardent yearning after the beautiful excellence of their character. The world shows no other lights but these towards the attainment of the unattainable. And who can there be so dull and dead in spirit as not to recognize these great characters as elder brothers of the human family? But this recognition may be intellectual or spiritual. It has very little to do with religion if a man rests content with perceiving that Socrates abounded in wisdom, and Luther was undaunted in the service of truth. There are only a very few in these days who can be blind to the lofty spiritual genius of a Paul, or a Sakya Muni. We do not mean to inculcate this sort of intellectual recognition. When we speak of prophets we mean spiritual assimilation. In these prophets we see unmistakably what God wants not merely to know, but *to be*. To be devotional is to be like Jesus when he went up to the mountains to pray. To be spiritual is to be like Paul, dying to the flesh absolutely, and living in God. It necessitates that continued, whole-souled life-devoted discipline which may convert a man to the nature of Jesus or Paul. Yet Jesus and Paul can be realized in the genuine spirituality of their character only when the Holy Spirit of God hath revealed them in the heart of the devout seeker. The spiritual recognition of our relations with the prophets is only possible by Divine grace, as the result of much prayer and devout aspiration. To us it is not the prophet who reveals God, but

God who reveals the prophet. When our supplications for salvation and sanctity to the Eternal throne have been ceaseless and earnest, it is then that the vision is vouchsafed to us to discern the great Prophetic lights whereby we are to walk to the far country of our pilgrimage. This is different from the cold shallow intellectual discernment which rests satisfied with stating that the true calendar of saints is more encyclopedic than is commonly held. The significance of prophetic lives is not merely biographical or theological, but personal and practical. Spiritual life would be a trackless ocean, full of insidious dangers without the loadstar and compass of prophetic guidance. We have to cultivate every-day relations with the prophets, receive every-day help from them, make constant communion with them in our daily devotions. All genuine spiritual life is the resurrection of the prophets. Prophetic character never dies, but is perpetually reproduced in the character of the faithful servants of God. The Spirit of spirits lives in each soul as the essence and embodiment of every form of spirituality which his messiahs lives to establish. The prophets can never be comprehended apart from God, and God can never be comprehended apart from his prophets. He makes his abode with the mysterious circle of his kindered spirits. Every prophet is a spiritual phase. Every prophet is a stage in the onward path to the Eternal. Every prophet is an everlasting consolation, an attained home, a sure promise of eternal life. Each prophet is different from the rest, yet not one of them can be disregarded with impunity. All of them together make up to heaven in which the human soul lives here, and hopes to live hereafter.

The doctrine of prophets has been long prevalent in the Brahmo Somaj. So early as the year 1866 Keshub gave his lecture on "Great Men" to supplement what he had said on 'Jesus Christ—Europe and Asia.' The

true prophet he said 'is a God-man.' He is an 'incarnation' of God. . . . True incarnation is not, as popular theology defines it, the absolute perfection of the divine nature, embodied in mortal form; it is not the God of the universe putting on a human body—the infinite becoming finite in space and time, in intelligence and power. It simply means God manifest in humanity; —not God made man, but God *in* man."

For the last eighteen years this doctrine has influenced the faith and conduct of the Indian community. During the great Bhakti revival, of which we have spoken, it became fuller and more practically applicate to devotional as well as daily life. But since the introduction of the New Dispensation, it has become one of the few regulating principles of our spiritual life. Communion with the prophets has formed one department of our devotional culture; it has found the way to our hymns. It has given vividness and compactness to our faith in Immortal Life. It has regulated our personal and domestic habits. It has defined the attitude of our religion to all foregone dispensations. The prophets are to us invaluable realities upon which our daily lives are nourished. They interpret to us pure primitive spirituality before it was contaminated with the shallow hypocritical refinements of modern civilization and formalism. The original, strong, unmixed currents of devotional ecstacy to which we may resort amidst all the clamorous carnality of the age, lie hidden in the depths of prophetic lives.

THE DOCTRINE OF PILGRIMAGES

What has been said of prophets will facilitate our idea of pilgrimages. Much needless misunderstanding has been fomented on this subject. The doctrine of pilgrimages embodies nothing more than an order of

spiritual culture. The pilgrimages were instituted in February, 1880, and completed in October.

The first pilgrimage was made to Moses. The second was to Socrates. The third to Sakya Muni. The fourth was to the Yogis and Munis of India. The fifth was to Jesus. The sixth was to Mahomet. The seventh was to Chaitanya. The eighth was to the great scientific geniuses of the world. Moses represents the direct guidance of God in all the great and minor emergencies of life. Socrates represents self-knowledge. Sakya Muni is the emblem of self-denial, humanity, and peace. The *Yogis* and *Munis* of this country represent the devotional habits of communion and meditation. Jesus exemplifies spirituality, faith, love of man, and obedience to the will of God. Mahomet signalized himself by his rigid monotheism, and the enthusiastic propagation of his faith. Chaitanya, the prophet of Nuddea, was the incarnation of the rapturous love of God. The scientific geniuses of the world are the priests of nature who have disclosed unto us the deep purposes and wonderful intelligence of the Creator. All these names, it will be plain, stand for the profound and essential principles of religious life, which the Brahmo Samaj has, for long years, studied, cultivated, and earnestly laboured to realize and carry out. Nowhere can these principles, in any abstract form of sermon, or thought, or precept, be viewed in that concentrated and concrete light which the great exemplars themselves present. And no culture of religious ideal can be real and effective until it incorporates us with the genius of the man whose special vocation has been to set forth that ideal in life and death. Hence the loyalty of religious sectaries to the respective founders of their sects is so well accounted for. It is an inevitable necessity. In going to adopt and assimilate the great spiritual ideals enumerated in the names of the prophets men-

tioned above, the leading spirits in the Brahmo Somaj found they must set apart stated periods of time in which to devote themselves exclusively to prayer and communion in order that they may be inspired to imbibe the distinctive principles at the fountain-head of prophetic personalities in and by whom those principles were first revealed. The process aims as it were at the transformation of a lower character into a higher. Such devotion, prayer, spiritual discipline necessary for this definite and exclusive object, has been, by a justifiable metaphor, called "Pilgrimage." It is like travelling away from our immediate surroundings of time, teaching, and influence to the calmness of prophetic antiquity, and there, far from the petty disturbances of the present, to sit at the feet of colossal souls, and learn from them, under the guidance of the Spirit who presides over all time and all aspirations, the sublime truths sent to mankind from behind the centuries, and by us so soon, so unwisely forgotten. Why so much objection should be taken to such a simple process of spiritual exercise is more than we can explain, unless it be that the use of the word "Pilgrimage" sounds old-fashioned and misleading to some refined ears. If there be any harm in these pilgrimages, that harm belongs equally well to the whole system of our religion which honors all prophets and all scriptures, and aims at that spiritual synthesis which is another name for the reconciliation of the opposing faiths of mankind. But such harm is unavoidable by the constitution of the Brahmo Somaj.

The very first pilgrimage to Moses was started by the utterance of the following benedictions :—

Blessed are they who honor and love the prophets and seers of ancient times.

Blessed are they who believe that though these prophets have departed and are now in heaven, true believers in the world may commune with them in spirit.

Blessed are they who do not ascribe omnipresence or omniscience to these prophets, yet can cultivate their fellowship in their own hearts.

Blessed are they who love to associate with the prophets of all religions, and seek to gather at the feet of each the peculiar ideas he has to teach.

Blessed are they who do not deify prophets, but treat them as their elders in heaven.

Blessed are they who do not care to see prophets clothed in flesh, in dreams and visions, or with the eye of imagination, but realize them as disembodied spirits in their own souls.

Blessed are they who, instead of seeing God through prophets, behold prophets and saints through the Lord their mediator.

Blessed are they who realize the nearness of heaven's saints, not in space, but in spiritual kinship and affinity of faith and character.

In explanation of the pilgrimage to Moses we subjoin what we wrote at the time:—Not by moving from land to land in quest of a sacred stream or mount does a man perform the real act of pilgrimage. Not by walking many miles, or by bathing, or by the offering of flowers or gold does a man fulfil the object of real pilgrimage. He is a true pilgrim who travels in spirit, and in search of the spirit-land; who seeks for the promised country within the heart, where the true *Brindaban* is, and to which Christ pointed as the Kingdom of Heaven. There is an Egypt inside the breast where the children of the chosen people are bondsmen still, bound in slavery to a despot worse and more ungodly than Pharaoh himself. The name of this despot is Self. There are taskmasters, more cruel than those who worked the Hebrews of old, who make us labor hard all day and night, and oblige us to make bricks without straw, and reward us with stripes after the work is done. The names of those taskmasters are a legion; we may in short call them falsehoods, passions, doubts, and despair. From the land of self, from usages, habits, associations, friends and relations that enslave us more and more

to the inhuman Pharaoh, who knoweth not the Lord, and doth not want to obey Him, from evil taskmasters who reward us with stripes for a life-long service, the men and women of the chosen people are to make a pilgrimage to the holy and promised land, the spiritual Canaan that overfloweth with milk and honey. Yea, the pilgrimage has already commenced. These many years have we walked through the dreary desert with our wives and children, with our furnitures and cattle. We have often rebelled and often disobeyed, we have often clamoured for meat, drink, and comfort, and found grievous fault with our leaders.

Now the Lord hath shown us marvels, and taken us safely through sand and sea; the Lord hath fed us with manna, and, like a pillar of cloud and fire, hath gone before us day and night. Who among us can deny the bounties of the Lord? Now the holy mountain of Sinai, the elevated region of living communion and vision, covered with the glory of God, like a devouring fire, stands before us. In our onward pilgrimage we must ascend it in spirit, we must stand there and wait for forty days and nights if need be, and receive the commands and communications without which further journey seems wellnigh impracticable. On that holy mountain the spirit of Moses must carry us, carry us to the inspiration which that great prophet himself enjoyed, to that favour and that presence which shone upon him, and upon those whom he led. To us the Lord must cry, as he cried to Moses: 'My presence shall go forth with thee, and I will give thee rest.' We must have in our onward pilgrimage those commandments, those laws, those directions, that detailed and every-day guidance in evrything without which we cannot be the people of God, nor live in the holy land of promise. We must be prepared to change everything, even our modes of eating, drinking, and dress, our abodes, and our neigh-

bourhoods for the sake of our glorious Lord's pleasure. We must consent to have new relations, new institutions, new usages, new forms, new ideas, new images, new sacrifices—in fact, we must be prepared for a New Dispensation altogether. But will the New Dispensation un-hinduize us? Will it defeat and bring to nought older dispensations? No. On the contrary, all old things will be revived in the new. From the Pisgah of our festival, this land appears in its brightness, as a land overflowing with all that is good and handsome. Our pilgrimage is to that land. Let all of us be pilgrims there, with our wives and children, let us seek that guidance which Moses obtained, let us have the faith and patience which he taught his people to have.

Similar explanations and similar processes were adopted in succession in the cases of all those to whom pilgrimages were afterwards made. It is impossible to urge against the practice any reasonable objection. The whole thing is an archaic method of spiritual culture of ideals on the subject of religious and moral excellence presented by the greatest geniuses of the world. The form of culture is now no longer retained, but the spirit is retained in daily devotions and occasions of festival. The New Dispensation by this process takes the utmost advantage of prophetic life and teaching as contained by every scripture, without running into all the extravagance and superstition which the worship of the dead inculcates.

৬। 'ধর্ম্মবিজ্ঞান-বীজ'—চারিখণ্ড (১৮৭৫—৯০খৃঃ)

—কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস

বইটী জনসাধারণে বিশেষ পরিচিত না হলেও, ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে এমন সুন্দর বই বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। কি তরুণ, কি বয়স্ক, সকলের পক্ষেই বইটী কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডার নয়, সুখপাঠ্যও। বইটীর প্রথম খণ্ডে জগৎ ও ঈশ্বর; দ্বিতীয় খণ্ডে

'উপাসনা'; তৃতীয় খণ্ডে 'মনুষ্যত্বেই ভগবানের প্রকাশ'; চতুর্থ খণ্ডে 'বিধানসমূহের সম্বন্ধ ও নববিধানে সকল বিধানের সম্মিলন' বিষয় আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থকার * ১৮৪৩ খৃঃ টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৯ খৃঃ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি বাল্যকালে দশ বৎসর গুরুগৃহে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, পরে ঢাকায় বৈদ্যশাস্ত্র পাঠ করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হন। তিনি রঙপুরে ও কাকিনায় জমিদার বাড়ীতে কিছু দিন পণ্ডিতের কাজ করেন। কাকিনায় ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বড় ভাই কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কালীশঙ্কর বাল্যাবধি ধর্ম্মভাবাপন্ন ছিলেন। এখন এঁর কাছে ব্রাহ্মদের উচ্চ চরিত্রের কথা শুনে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হন। ঐ সময়ে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু তাতে তাঁর কাছে বাধা হয়নি। কেবল ব্রাহ্মসঙ্গ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। ব্রাহ্মদের নৈতিক সাহস, ব্রাহ্মসমাজের নীতি, নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি নিজের ও পরিবারের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। একবার তিনি একটী অসহায় মুসলমান বালিকাকে গৃহে আশ্রয় দেন, সে জন্য তাঁকে স্থানীয় লোকদের বিরাগভাজন হতে হয়। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করে নিজের বালবিধবা ভগিনীকে তিনি ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়েছিলেন। এই ধরণের তেজস্বিতা তাঁর ভিতর ফুটে উঠেছিল। তিনি ১৮৭২ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, ১৮৭৮ খৃঃ কলিকাতায় এসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন এবং ১৮৮১ খৃঃ নবধর্ম্মের প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন করে যান। তাঁর জীবনে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে বিশ্বাস ও ভক্তি একটি প্রেমস্বরূপ ধারণ করেছিল। সাংসারিক ধনমানের প্রতি তাঁর আদৌ দৃষ্টি ছিলনা; তিনি জ্ঞান চর্চ্চা, ধর্ম্ম-চর্চ্চা,

* 'কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস'—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত

সাধন ও ভজনে ও সাধুসঙ্গে ব্যস্ত থাকতেন। 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ' ও 'নববিধান অপরিহার্য্য' তাঁর দুটি বিখ্যাত বই। তাঁর রচিত কয়েকটী সুন্দর ও মিষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত আছে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় তাঁর লেখা চমৎকার প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮০৫ শকে (১৮৮৩ খৃঃ) তাঁর লেখা 'শাক্য ও গৌরাঙ্গ' বিষয়ে প্রবন্ধটী তার মধ্যে একটী। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 'হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম' বক্তৃতা করায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে 'ব্রাহ্মধর্ম্মই সকল ধর্মের সার' নাম দিয়ে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ' বইটীর প্রথম ভাগ, ১ম সংস্করণ (১৪৪ পৃঃ) ১৭৯৭ শকে বা ১৮৭৫ খৃঃ; দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংস্করণ (১০০পৃঃ) ১৮৭৭ খৃঃ; তৃতীয় ভাগ, ১ম সংস্করণ (১৪৪পৃঃ) ১৮৮৭ খৃঃ; চতুর্থ ভাগ, ১ম সংস্করণ (১৯৯ পৃঃ) ১৮৯০ খৃঃ প্রকাশিত হয়। বইটীর রচনায় একাধারে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, ভাই প্রতাপচন্দ্রের দুরূহ বিষয়কে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার শক্তি, সাধু অঘোরনাথের যোগদৃষ্টি ও সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথের কবিত্বশক্তির একত্র সমাবেশ দেখা যায়। তিনি ইংরাজী জানতেন না, কিন্তু সেই সকল বিষয়ে বাংলা বই ও প্রবন্ধ পাঠ করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই সকলের মূলে ছিল আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অলৌকিক প্রভাব। সেমিটীক্ ধর্ম্মে এব্রাহাম ও মুসার নীতি, ঈশার যোগ, মহম্মদের অংশিবাদখণ্ডন, পরপর বিধানের এই ক্রম ও পূর্ণতা দেখিয়েছেন। ভাই প্রতাপচন্দ্র 'ঈশাতত্ত্ব' এবং ভাই গিরিশচন্দ্র 'ইস্‌লামের তত্ত্ব' বিষয়ে যে সকল কথা প্রকাশ করেছিলেন, সেই অধ্যয়নের চুম্বক ও তার আলোকের শিখা কালীশঙ্করের বইটীর ভিতর দেখতে পাওয়া যায়। ঋষি জনকে আর্য্যধর্ম্মের জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের সমুচ্চয়বাদ ও অনাসক্ত বৈরাগ্য, শ্রীকৃষ্ণে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের সমন্বয়-বাদ বা সমুদয় তত্ত্ব একত্র সমাবিষ্ট। কিন্তু এঁরা দুজনেই অহংবাদী যোগী। গৌতমে অহংশূন্য বৈরাগ্য পবিত্রতা ও

গৌরাঙ্গে অহংশূন্য ভক্তিপ্রেম পর পর বিধানের পূর্ণতা সাধন করেছে। এই অধ্যায়ে উপাধ্যায়ের হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের অধ্যয়নের আলোক, সাধু অঘোরনাথের বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বের আলোক, ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথের (চিরঞ্জীব শর্ম্মার) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও ভাই মহেন্দ্র-নাথের নানকপ্রকাশের আলোক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। উপসংহারে তাঁর অন্তরের আলোকের উৎস, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব জীবনে সকলের মিলন দেখিয়ে ধন্য হয়েছেন। 'নববিধান অপরিহার্য্য' পুস্তিকাটী এই উপ-সংহারেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। বইটীর বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক আলোচনায় কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হল—

"ঐশীশক্তি অবতারিত হইয়া কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এই সকল যোগ-বিয়োগ-ঘটিত গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিল।" "ঈশ্বরের ইচ্ছায় অধীন হইয়া তাঁহার কর্ম্মশীল হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া নূতন ভাবে গঠিত হওয়া।" "পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ঐশ্বরিক বলের উপর আত্মবিসর্জ্জন করিয়া তিনি নবজীবন লাভ করিয়া ছিলেন।"

"গৌতম পূর্ব্ববর্ত্তী যোগতত্ত্ব ও মৌলিক প্রণালী সকল গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ ও দেবদেবীর অপ্রতিষ্ঠা দর্শন করিলেন। এই জন্য তাঁহার যোগতত্ত্ব এক নূতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হইল। ...নির্ব্বাণ ব্যতীত, নৈর্ম্মাল্য সাধন ব্যতীত, এক কথায় চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভক্তি প্রেমের অভ্যুদয় হইতে পারেনা।"

"একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূলে (ক্রিয়াকলাপ ব্যভিচারের বিরুদ্ধে) জন্মগ্রহণ করিল, অন্যদিকে পুণ্য পবিত্রতা দ্বারা তাহার সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপন করিল।" "এমন এক প্রণালী বাহির করিলেন, যাহা সম্পূর্ণ নূতন।"

"ঈশ্বর বাক্যমনের অগোচর; সুতরাং দুর্ব্বল মানুষ তাঁহাকে ধরিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হয় এবং কল্পনা-বলে মনে যাহা উদিত হয়, তাহা লিখে ও প্রকাশ করে।"

"অতএব ইষ্টলাভের প্রতিবন্ধক কি? কত প্রকার? তাহা আলোচনা করিলেন। এবং দেখিলেন অহংকারই মূল। 'অহংকার' থাকিতে 'দেবসত্তা' উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু 'অহংকারকে' তাহার পূর্ব্বোক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বিদায় করিয়া দিতে পারিলেই দেবরাজ্য স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এইজন্ম মহামুনি শাক্য একটী বিয়োগ-প্রণালী অবলম্বন করিলেন। অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত সমুদয় ক্রমে উড়াইয়া দিলেন, রহিল কেবল শূন্য। এই শূন্য শূন্য নহে, কিন্তু চিন্ময় সত্তা। এই সত্তা আর উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কেননা এই শূন্য সত্তাই সমুদায় জগতের মূল কারণ। এই চিন্ময় সত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শাক্যমুনি 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। কেননা 'বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমং।' তিনি জানিতেন যে, ঈশ্বরসহ মনুষ্য যুক্ত, কিন্তু প্রবৃত্তির প্রতিকূলতা বশত: ভোগাসক্তির আকর্ষণে পড়িয়া সেই যোগ অনুভব করিতে পারে না। এই বিষয়-কামনা বিদুরিত হইয়া চিত্তের প্রবৃত্তিরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তখন সেই নিত্য-যোগ আপনি উপলব্ধ হইবে।" ..."সুতরাং ঈশ্বরের নাম না করিলেও তাঁহাকে সাধনবলে নিশ্চয় লাভ করা যাইবে।" "হিন্দুগণ 'এ নয়, এ নয়' বলিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছেন। গৌতমও 'এ নয়' 'এ নয়'-কে মূল মন্ত্র করিয়া সাধন করিয়াছেন। হিন্দুগণ সকল উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু 'সোঽহং' এই অভিমানাত্মক জ্ঞানে গিয়া আবদ্ধ হইলেন। বুদ্ধ এই অহংকারাত্মক মতকে অবিদ্যাসম্ভূত জানিয়া অহংকারকেও উড়াইয়া দিলেন।"

"এই সত্তা অবিতর্ক্য, অবিশেষ্য, সুতরাং বাক্য দ্বারা বচনীয় নহে। সত্তাকে বাক্যের বিষয় করিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল হইতে বিমুক্ত থাকা যাইবে না।"

"শূন্যরূপ সত্তা ভোগ্য বস্তু, তাহা ভোগ করিবার জন্য, কিন্তু বলিবার জন্য নহে।" "মূল বস্তুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিলে, এই ভাবময় তরঙ্গ সংসার আনিয়া উপস্থিত

করে এবং এই স্থান হইতে পতনের কারণ উপস্থিত হয়। অজ্ঞাতসারে পাপকেও অঙ্গীকার করিতে হয়।” “…গৌতম দৌর্ব্বল্য-জনিত এই পতনের সংবাদ জানিতেন বলিয়া, অপ্রত্যক্ষ ও অপ্রমাণিত কোন বিষয়ে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। তিনি এমন সাধন করিলেন, এমন সিদ্ধিলাভ করিলেন, যাহা চিরদিন অক্ষুন্ন আছে ও থাকিবে।”

“বৌদ্ধধর্ম্মের এই গূঢ় রহস্য মধ্যে সাধারণ লোকদিগকে প্রবিষ্ট করিবার জন্যই, ভক্তবৎসল ভগবান্ লোকাতীত দুর্জ্ঞেয় দুষ্প্রবেশ্য বস্তুকেও অগ্নিজলের ন্যায় সামান্য ভাবে পরিণত করিয়াছেন।”

৭। ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়’ (Religious Sects of the Hindus) ১ম ভাগ, ১৮৭০ খৃঃ (১০৬+২১৪ পৃঃ); ২য় ভাগ, ১৮৮৩ খৃঃ (২৮২+৩৩৪ পৃঃ)।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত * মহাশয়ের এই বইটী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থকার কেবল সুসাহিত্যিক ছিলেন না, জীবনের আদর্শ বিষয়ে তাঁর একটি নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর জন্ম ১৫ই জুলাই, ১৮২০ খৃঃ ও মৃত্যু ২৮মে, ১৮৮৬ খৃঃ। তিনি Oriental Seminary তে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি গ্রীক্, হিব্রু, ল্যাটিন্ ও জর্ম্মন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তার আগেই তিনি পার্সী, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এক বছর মাত্র বাকী থাকলেও, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁর Senior পরীক্ষা দেওয়া হল না। ১৮৪৫ খৃঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সম্পাদনার জন্য, অনেক খুঁজে, তাঁকে সম্পাদকরূপে নির্ব্বাচন করলেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদনায় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আলোচনায় তাঁর মনীষা ও রচনা-শক্তির খ্যাতি চারিদিকে

* ‘অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত’—মহেন্দ্রনাথ রায় (আর্য্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক)

ছড়িয়ে পড়লো। সে সময়ের চিন্তা-জগতে অক্ষয়কুমারের দান নূতন ধরণের। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' বক্তৃতাটী দেন। এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা।

তারপরে তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও বিবিধ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করতে থাকেন। সবগুলিতেই নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। বইগুলি বহুদিন বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়েছিল। তার ভিতর 'চারুপাঠ' ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ; 'ভূগোল'; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ১ম ভাগ (২৯১ পৃঃ) ১৮৫১ খৃঃ ও ২য় ভাগ (২৮৯ পৃঃ) ১৮৫৩ খৃঃ; 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৬৫ খৃঃ); 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার' (২০৯ পৃঃ) ১৯০১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' বইটীতে তিনি ১০৮টি হিন্দুসম্প্রদায়ের মত, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই বইটীতে তাঁর Statistical ও Historical approach যা প্রকাশ পেয়েছে, তা সেই সময়ের পক্ষে অসামান্য। Asiatic Societyর Wilson সাহেবের পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি বইটী রচনা করতে আরম্ভ করেন। তারপরে নিজের পথ ধরে বইটী সম্পূর্ণ করেন। সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি তাঁর একটি বৈশিষ্ট। এ বিষয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠ হলেও তাঁর সঙ্গে এঁর একভাব ছিল। তাই যখন কেশবচন্দ্রের 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রণয়ন নিয়ে মত-বিরোধ দেখা দিল, তখন অক্ষয়কুমার তাঁর উদার বৈজ্ঞানিক ও Historical দৃষ্টিতে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। বইটীর দ্বিতীয় ভাগে 'বুদ্ধাবতার' বিষয়ে ৪০ পৃঃ তথ্য দেওয়া হয়েছে। তার কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

"এখন হিন্দুসমাজে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় সবিশেষ প্রচারিত নাই। অতএব হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধাবতারের প্রস্তাব

লিখিতে হইলে প্রথমে উল্লিখিত বিষয় কিছু অবগত করা আবশ্যক।”

“ভারতবর্ষীয় আর্য্য বংশীয়দের ইতিহাস দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত; হিন্দু ও বৌদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম আবহমানকাল প্রচলিত ছিল। ইতিমধ্যে একটি মহার্থকারী মহীয়সী ঘটনা উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে ধর্ম্ম বিষয়ের একটি বিষম বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলিলে হয়। সেইটি বেদ ও বর্ণাভিমানের মস্তকোপরি পদাঘাতকারী বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ বই আর কিছু নয়। অসাধারণ মানসিক বীর্য্য কেবল ইউরোপেই উৎপন্ন হয়, এমন নয়; এককালে ভারত-ভূমিতেও আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় মানবীয় মতের অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি সতেজে বিনির্গম পূর্ব্বক চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়াছিল। বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধচৈত্য, বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধতীর্থ, বুদ্ধাদির প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। সংসার দুঃখময় ও এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ সাধন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এবং উদাসীনদিগের শান্তভাব ও বিষয়-বৈরাগ্য দৃষ্টি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। ···তিনি পরম পুরুষার্থ সাধনাকাঙ্ক্ষী একরূপ উদাসীন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন।”

“বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি করে। ইহাদের বাসগৃহের নাম বিহার। কিন্তু বৎসরে কয়েক মাস বনবাস করিয়া ইহাদের বৃক্ষতলে কাল যাপন করিতে হয়। ইহারা স্বহস্তে স্যূত চীরপুঞ্জ পরিধান করিয়া তাহার আবরণ-স্বরূপ একটী পীতবর্ণ আলখেল্লা ব্যবহার করে। শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডণ করিয়া রাখে। স্ত্রী-সহবাস ও নৃত্যগীতাদি অন্য যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সুখব্যাপার পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হয়। ইহারা একাহারী, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপর্য্যটন-পূর্ব্বক আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ কালেই একস্থানে একত্র ভোজন করে ও একত্র উপবিষ্ট হইয়াই নিদ্রা যায়।

গৃহস্থ লোককে উপদেশ দান এবং মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করে। ...দান, ধ্যান, শীল, তিতিক্ষা, বীর্য্য, প্রজ্ঞা এই কয়েকটী পরমোৎকৃষ্ট প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান করা ইহাদের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অন্য দুইটী নাম শ্রমণ ও শ্রাবক। গৃহীদের নাম উপাসক ও উপাসিকা। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মব্রত পালন উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুসারে গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষ-সংসর্গে নিবৃত্ত থাকে। তাহাদিগকে ভিক্ষুণী ও শ্রমণা বলে। ...শাক্যমুনির সময়েই ঐ শ্রমণা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রমণারা সর্ব্বতোভাবেই শ্রমণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহা-দিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও তাহাদের উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ পালন করা শ্রমণাদের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। ...তাহাদিগকে উপদেশ গ্রহণ বা ধ্যানাদি সাধনার্থ কুত্রাপি গমন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

"জৈনেরা যত অহিংসাপরায়ণ, বৌদ্ধেরা তত নয়। চীন-দেশীয় বৌদ্ধেরা সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন।"

"বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদায় প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও পশ্চাৎ ভোট ভাষায় অনুবাদিত হয়। ঐ ভোট শাস্ত্রের নাম 'কহ্-গ্যুর' ও 'তন্-গ্যুর'। এই উভয়ই অতি প্রকাণ্ড। প্রথমটীতে ১০৮৩ খানি গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট আছে। ...দ্বিতীয়টী ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় এবং পালি, সিংহলীয় ভাষায় দক্ষিণে অনুবাদ করেন। পরে তাহা ব্রহ্মদেশাদির ভাষাতে অনুবাদিত হয়।"

"প্রাচীনতম বৌদ্ধসম্প্রদায়ীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। জড়পদার্থ নিত্য এবং তাহার শক্তির প্রভাবেই সমুদায় সৃষ্ট হয় এবং মধ্যে মধ্যে প্রলয় ঘটিলেও ঐ শক্তির প্রভাবেই পুনরায় সৃষ্টি হয়।"

"উত্তর কালে নেপাল প্রদেশে এই ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষ উৎপন্ন হয়। সেই সম্প্রদায়ীরা একটী আদিবুদ্ধের

অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ নানান মত প্রচলিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবী, তন্ত্র মন্ত্রও প্রবেশ করে।"

"বৌদ্ধ-মতানুযায়ী চারিটী প্রধানতত্ত্ব বৌদ্ধসমাজে ধর্ম্মচক্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ...বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করুন, আর অন্য অন্য নানা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রকাশ করুন, কিন্তু অনেকানেক নিকৃষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায়, পৌত্তলিক হইয়া রহিয়াছেন। প্রতিমা-পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থিদন্তাদির অর্চ্চনা এবং নানাবিধ সত্র মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে। কেবল হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধদের ঋত্বিক বা পুরোহিত নাই। প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনিই আপনার যজমান।"

"ভারতবর্ষের বুদ্ধগয়ায়, বৈশালীতে, নালন্দবিহারে ঐ সব মূর্ত্তি এখনো দেখা যায়। সিংহল দ্বীপের মহারাজ বিহারে পঞ্চাশৎ অধিক বিগ্রহ দেখা যায়। চীন-দেশীয় জ্ঞানাপন্ন বৌদ্ধেরা প্রতিমা-পূজা ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন স্বীকার করেন না। 'চুহি' এসব স্পষ্ট অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বুদ্ধ দেবাদির অস্থি, কেশ, দন্ত, বস্ত্র, যষ্টি, প্রভৃতি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর পূর্ণগর্ভ ঘণ্টাকার বস্তু নির্ম্মাণ করে ও অর্চ্চনা করে। তীর্থ-যাত্রীরা সেই সমস্তকে পবিত্র তীর্থভূমি জ্ঞান করিয়া দর্শন করিতে যায়। প্রয়াগে সপ্তম শতাব্দীতে এক উৎসব হয়, আড়াই মাস ধরিয়া বুদ্ধ, বিষ্ণু, শিব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; হিন্দু বৌদ্ধে সদ্ভাব দেখা যায়। দান, ভোজন, আনন্দ, সাজসজ্জা সমস্ত উৎসবকে জমকাইয়া তুলে। সিংহলের উৎসবে তিন মাস পালি ভাষায় গ্রন্থ বিশেষ অবিচ্ছেদে পাঠ হয়। 'পারিত্ত' বা 'পিরিত' নামে ক্রোধ-শান্তির জন্য এক উৎসব হয়। তাহাতেও 'বনপাঠ' হয়। ভোট দেশে তিনটী উৎসব হয়। একটী গ্রীষ্মারম্ভে, অন্যটী শরতের আরম্ভে, শেষটী শীতান্তে। প্রথমটী শাক্যমুনির জন্মের একপক্ষ ধরিয়া হয়।"

"বৌদ্ধদের সকল তীর্থ এবং সকল আচার হিন্দুসমাজ পরে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে। দক্ষিণ পথস্থ বিঠলভক্ত-সম্প্রদায় এই দুই ধর্ম্মের মিশ্রণ। জগন্নাথক্ষেত্র, বুদ্ধ-গয়া ও গয়ার বৌদ্ধতীর্থ হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়েছে। এবং বুদ্ধাবতার ব'লে বুদ্ধকে অবতার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।"

বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের এক গ্রামে সামান্য কয়েক ঘর বৌদ্ধ দেখা যায়। তাছাড়া সীমান্ত প্রদেশে, নেপাল, ভুটান, সিকিম, আসাম, লাডাক প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধদের প্রাধান্য দেখা যায়।

৮। 'Controversy with Dr. K. S. Macdonald on Buddha and Buddhism' (1885) ;

'বুদ্ধচরিত' (১৮৯১—৯২) ;

'অশোকচরিত' (১৮৯১) ;

'নববিধান কি ?' (১৮৯৬)

—কৃষ্ণবিহারী সেন এম, এ,

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের প্রথম কলায় প্রত্নতত্ত্বের জন্ম হয়, তার দ্বিতীয় কলায় সদ্য সংগৃহীত উপকরণে নূতন ক'রে ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। কৃষ্ণবিহারী সেন সেই সময়ের মানুষ। তখন রমেশচন্দ্র দত্ত, Vincent Smith প্রভৃতির রচিত ভারতের ইতিহাস প্রকাশিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি দেখা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের তরুণ প্রতিভার রক্তিমরাগ সবে মাত্র দিগন্তে দেখা দিয়েছে। আর একাধারে ঐতিহাসিক, শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সাংবাদিক, সমালোচক, নববিধানের একানষ্ঠ সাধক কৃষ্ণবিহারী তাঁর Liberal পত্রিকায় ঐ সব নূতন নূতন সৃষ্টির পরিচয় ও সমালোচনায় শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে আমোদিত করছেন। 'আনন্দমঠের' পুরোভাগে ঐ রকমই একটী সমালোচনা সন্নিবিষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণবিহারীর প্রাপ্যমর্য্যাদার স্মৃতি-সৌধ রচনা করে গেছেন। কলুটোলায় ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৪৭ খৃঃ তাঁর জন্ম। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৬৫ খৃঃ তিনি সগৌরবে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অল্প বয়সেই অনেকগুলি ভাষা, শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁর তিরোধানের পর 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদার-বুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাধনার পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বীপুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।"

—সাধনা, আষাঢ়, ১৩০২

তিনি কিছুদিন জয়পুর কলেজের ও পরে কলিকাতা এলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। এমনই বিশুদ্ধ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল যে, তাঁর ছাত্রদের ভিতর এখনও যাঁরা জীবিত, তাঁরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) প্রথম পরি-কল্পনা হয়েছিল তাঁরই বৈটকখানায়—ঐ সভার অগ্রণীরা তখন ঐখানেই একত্র হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম, প্রতাপচন্দ্র, কৃষ্ণবিহারী Indian National Congress এর সঙ্গে নিয়মিত যোগ রক্ষা করে চলতেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি বহুদিন Indian Mirror পত্রিকা, Liberal, Liberal and the New Dispensation পত্রিকার সম্পাদনা করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের শ্রদ্ধা করতেন। ১৮৭৬ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আবগারী কমিশনের সদস্য করেন এবং তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ উচ্চদৃষ্টিতে দেশের নীতিরক্ষা ও গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা রক্ষার সমস্যা আলোচনা করে একটী রিপোর্ট দেন। সেটী দেশের জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয়েই সমান আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃদেবীর আত্মজীবনীতে * দেখা যায় যে, তিনি তাঁর অগ্রজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগত ছিলেন—ঐ দুই ভাই যেন একমন একপ্রাণ ছিলেন।

* 'কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা'—যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির প্রকাশিত।

তাঁর পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা। তাঁর বহু রচনা ও বক্তৃতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভিতর কয়েকটী বই এবং কয়েকটী পুস্তিকা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। Will India be Free? (৪২ পৃঃ), Romance of Language (৩৬ পৃঃ), Political Education of India (১৬ পৃঃ), Idea of a Personal God (১৭ পৃঃ) ও সম্প্রতি নববিধান পাব্‌লিকেশন কমিটী পুনঃ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'সাধনা' পত্রিকায় একটী কবিতা প্রকাশিত হয়। সেটী এখানে দেওয়া গেল—সম্ভবত: এটী তাঁর সুহৃদ্‌ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা—

"সখা ওহে কে বলিল নাহি তুমি আর।
রোগ তাপ জর্জ্জরিত ফেলি দেহভার
অজর অমর রূপে হয়ে জ্যোতির্ম্ময়
নবাকাশে নববেশে হয়েছ উদয়
সে চিত্র তুলিতে নারে চিত্রকর বটে,
ওঠেনা সে দেহছায়া ভানুচিত্র-পটে,
কিন্তু সেই সূক্ষ্ম ছবি চিন্ময় কায়া
চিদাকাশে সদা ভাসে—দিবা তার ছায়া।
সেই তব চিরস্ফুর সুমধুর হাস
যন্ত্রণারো মাঝে যাহা হইত বিকাশ;
অপ্রতিম ধৈর্য্য তব—আত্মার সে বল—
রোগ তাপ মাঝে তাহা থাকিত অটল
অনন্ত সে জ্ঞানস্পৃহা—ভেদিয়া আকাশ
সুদূর নক্ষত্র মাঝে হত না প্রকাশ;
একনিষ্ঠ প্রেম সেই এক পত্নী ব্রত
সখা সনে যার কথা হইত নিয়ত;
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব মিলি এক সাথে
জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম তনু রচিয়া তাহাতে
কোন দিব্য পথে কোন্‌ সমুন্নত লোকে
গেছ চলি—এড়াইয়া রোগ-তাপ-শোকে।

এবার তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে রচনাগুলির পরিচয় দেওয়া যাক্—

(ক) ১৮৮৫ খৃঃ Liberal পত্রিকায় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটী মূল্যবান প্রবন্ধ দেখা যায়। 'Assimilation' শীর্ষক ছয়টী প্রবন্ধের ভিতর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর প্রবন্ধটী ছিল Buddhism বিষয়ে। তার সামান্য এক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"Brahmoism is a protest against caste, idolatry and superstitions, and a rise and progress of rationalism in the east. It started with the spirit of Buddhism, whose higher developments it assimilated to it, as it proceeded towards its fulfilment in the New Dispensation. It did not present itself as a mere protest but a higher culture of morals appeared in it from the first. . . . Their regard for the world ceased in the struggle for gaining a moral ascendency over and above its received standard. . . . They did not look upon what they saw as phantoms, but their hearts, panting after something which was real and attractive pierced through the veil and went direct to the Fountain of Peace. This however, did not lead them to quietism, but increased in them an activity which gave birth to moral reforms."

ঐ বৎসরের শেষ ভাগে বিখ্যাত পাদ্রী Rev. Dr. K. S. Macdonald বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করে একটী বক্তৃতা দেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিষ্ঠাবান সদস্য, ইংরাজীর অধ্যাপক ও ভারতহিতৈষণাকর কর্ম্মে অগ্রণী ছিলেন। Vernacular Press Act আন্দোলনে তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি যুক্তিতর্কের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়ে, বুদ্ধের মতবাদকে annihilation, তাঁর ধর্ম্মকে নাস্তিকতা, তাঁর ব্যবহারকে নিজ শিক্ষাবিরুদ্ধ মনে করে, ঐ বক্তৃতায় সেই কথাই ঘোষণা করেন।

তার উত্তরে ১লা নবেম্বর Liberal পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী লেখেন—

"One test of eclectic faith we lately experienced. It was when we read Mr. Macdonald's strictures upon Buddha. His groundless charges deeply pained us and struck us almost as a personal attack. The New Dispensation has made Christ, Sakya and Chaitanya all our own, and we feel deeply insulted when they are reviled in our presence."

ঐ মন্তব্যের উত্তরে Dr. Macdonald বৌদ্ধশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে, যুক্তি দেখিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণবিহারী সেন তার বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ করেন এবং Liberal পত্রিকায় ২২শে ও ২৯শে নবেম্বর সংখ্যায় তার বিস্তৃত উত্তর দেন। অতি উপাদেয় বোধে তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"Mr. Macdonald fears that increased appreciation of Buddhism will lead to the spread of theosophy and atheism; we think a careful study of Sakya's life will lead to better morality and an increased faith in the providence of God. Witness his extraordinary life, his extraordinary conversion, his extraordinary influence. Could an atheist preach religion and turn millions of his countrymen to purer ways?

He came to preach true, absolute morality. He had no faith in relative methods, ... in superficial modes of salvation. . . . when he found lust, inspite of ritual and empty religious practices, he asked people to enter within their beings, and taught them to consider the heart as the root of all evil. Unless a man be born again, that is to say, unless he be absolutely rid of his desires, there could be no salvation for him. The vices incident to empty ceremonialism were the vices prevalent then. Sakya gave them the death blow by explaining the source and springs of moral actions.

The doctrine of *Nirvana* has been variously explained. The most widely accepted theory represents it as

meaning annihilation, in which sense Buddha becomes an odious atheist. We indignantly repudiate any such charge against our national hero and prophet. We challenge the whole world of critics to prove that any atheist has ever given laws to so many millions and kept them in purity and progress for so many centuries. . . . . That Buddha stood against all sorts of theological speculations is true enough. The reason for this has been clearly explained by our own Sadhu Aghorenath in his life of that prophet. India was full of theological schools in those days, given to hair-splitting definitions of Brahma. Ontology and logic served to obscure whatever was clear in men's institutions, and it was found that though men professed to know all about God, the lives which they led were as impure as ever. The false theology and bad ethics of the time led to a reaction which it was reserved for Buddha to lead . . .

He came to give them *Nirvana*, and *Nirvana* only. He told them nothing about Brahma; but he held out the pictures of absolute Truth, Chastity and Love. Mr. Macdonald holds that his views about morality were only relative and utilitarian. No. When he spoke, he spoke authoritatively; when he gave them laws, he made them final. . . . Could an atheist speak so absolutely and authoritatively about moral laws, about the duty of chastity? . . . . When he appeared on the scene he found that the onething needful was the re-birth of the heart, . . extinguish their desires. Could that be done by mere human efforts? . . . He had tried various methods of salvation and failed; it was only by a flash of holy light, inspiration as we call it, that he became freed from the reign of desires. His heart at once became filled with noble emotions; he was strong with the strength of holiness; truth, wisdom and righteousness became his. From that moment he began to speak unmistakably; he felt for the world

and craved for a holy mission. Such is the law of God, such is the work of grace. The moment the self goes, God comes and fills the soul. From that time, it is not man that speaketh, but God. . . . In his life he bore witness to the working of a supernatural influence, and he told men that they might also go and do likewise."

তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধে যা লেখেন, তার মূল কথা হল—নারীদের বিষয়ে বুদ্ধদেবের ব্যবস্থা।

"Mr. Macdonald says that if Christian Missionaries were to go to the houses of courtesans in the same way that Sakya had done, they would lose their position in the estimation of their fellow beings."

তার উত্তরে কৃষ্ণবিহারী বলছেন—

"That is quite true. For it is not all men that become devoid of sin. But Buddha was not sinful; he had *nirvaned* or extinguished desires. Is there any instance to be found within the whole range of Buddhistic scriptures where he is shown to have betrayed any existence of carnality in him? The logic seems simply to be this: If Buddha did patronise immorality, he must have been an immoral person But as he was not carnally-minded, after what had transpired in his sublime renunciation and from the evidences supplied by his whole life, we must say that the charge vanished into thin air."

তারপরে তিনি Dr. Macdonald এর দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে লেখেন—

"So much may be conceded that in his preachings to women, his theory might have been wrong; we come now, therefore, to consider his views on the fairer sex."

"Observe that his theory of women was based upon his peculiar idea of purity, which again was based

upon a pessimism which reached its culminating point in the doctrine of the transmigration of souls. It was certainly not the revelation which heaven sent him to communicate. His real doctrine was *Nirvana* for which alone he was responsible. If Sakya had flourished in Europe, he would, we are almost sure, have fitted it to the doctrine of eternal hell.

It was evident to the Indian intellect that salvation from evil meant escape from *transmigration*, and to destroy the very essence of desire. Thus purity became the corner-stone of his whole theological edifice. With a most skilful dialectics he availed himself of the current belief of the people and persuaded them that their belief in the result of *Karma* was itself the main argument for the thesis, that purity was the end and aim of all existence. This naturally brought on the whole woman question."

তারপর নারীকুলের মর্য্যাদায় খৃষ্টীয় প্রভাবের কথাপ্রসঙ্গে বলেন—

"Those that believe that the present status and position of women in Europe is due to Christianity, commit a natural and pardonable mistake. As a matter of fact, the direct tendency of the teachings of Christ, the Apostles and the Father's was towards asceticism. Christ was unmarried, so probably was St. Paul, so was St. James, so were the Fathers, so are the Catholic priests, so the Cowley Fathers. Asceticism and purity propose to go hand in hand, and hence we see that during all the first centuries purity and asceticism became the watchwords of Christendom. Some of the views expressed by the Fathers on the other sex were as decisive and trenchant as those which Mr. Macdonald has quoted from Buddha."

"Europe owes its present female society to two causes,—to the Teutonic barbarians who were famous

for the respect paid to the female sex and those barbarians were not yet Christians; and to the rise of chivalry which was by no means a very moral institution at its beginning. The rise of Protestantism, let it be said, led also to the immediate marriage of the priests.

It is wrong, therefore, to say that woman owes her present position to Christianity. If the circumstances we have enumerated above had not taken place, the number of Christian monasteries, would have equalled that of the Buddhist, and woman in Europe would have occupied a place only a little higher than that which she occupies in India."

"That Buddha respected women, at the same time that he discouraged the commerce of the sexes, is proved by the place he gave to women in his system. For the first time in the history of India, he associated them with work and prescribed for them the rules and modes necessarily connected with the monastic life."

"It will not do to judge him by the modern English standard. We should consider what India was in his day, what were her needs and requirements, what was the bent of the national genius, and, how, considering him to be a representative man, he utilised it to serve his noble purposes."

"That he gave himself the most signal example of it (extinction of desires) by his renunciation of a kingdom, that he eschewed home and pleasures to devote himself to the amelioration of the race, that he got, what he sought for, namely the blessing of the *Nirvana*, that he created a mighty revival which was followed by a revival of letters, arts and civilization are facts which may be weighed as sterling gold against any number of blemishes, the captious critic might put forward and will be found to out-weigh them all."

১৮৯০ খৃঃ কৃষ্ণবিহারী Liberal and the New Dispensation পত্রিকায় Catechism of the New Dispensation শীর্ষক ১১টী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে বিধানবাদের দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম বিষয় যে আলোচনা করেছেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল—

"He came from God and though he never spoke of Him, he dealt with nothing but the Absolute. Duty was his watchword—duty to which there were no exceptions . . . An atheist never deals with the Absolute—the agnostic's philosophy is that of relativity. . . . Sakya never confined himself to this life like your modern utilitarian philosopher. He speaks of *Yugus* or epochs, of the next world, of rewards and punishments." "Buddha came to the world to tell men neither of God nor of the distant future. His mission lay in the declaration of the immutable conditions of true morality. The world heard for the first time of how men could be good and virtuous. They could not be so by externalism of any kind, but by the reformation of the heart, the extinction of the passions and the consequent attainment of true knowledge. Buddha told his disciples that as soon as they got rid of their passions, they were enlightened and could know of the future."

(খ) 'বুদ্ধ-চরিত'—কৃষ্ণবিহারী সেনের এই প্রবন্ধগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের পুরাতন পত্রিকা পড়তে পড়তে চোখে পড়ে। এগুলি 'সাধনা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ১৯ অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়না। পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীনির্ম্মলকুমার বসুর উৎসাহ দেখে প্রবন্ধগুলি বইএর আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। অধ্যায়গুলি এইরকম পাওয়া যায়—(১) সূচনা; শাক্যজাতি ও কপিলবস্তু, (২) কপিলবস্তুর স্থান-নির্ণয় এবং শাক্যবংশাবলী, (৩) বিদেশ সকলের অবস্থা, (৪) স্বদেশের অবস্থা, (৫) পূর্ব্বজন্ম, (৬) বুদ্ধের অলৌকিক

জন্ম, (৭) জন্ম, (৮) বাল্যকাল, (৯) বিবাহ, (১০) বিবাহের পর, (১১) বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটী ঘটনা, (১২) বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস, (১৩) মহাভিনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত, (১৪) বুদ্ধদেবের পর্য্যটন এবং শিক্ষারম্ভ, (১৫) বুদ্ধের মনের ইতিহাস, (১৬) মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন, (১৭) বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ, (১৮) নীতির ধর্ম্ম, (১৯) ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন। শেষ প্রবন্ধ প্রকাশের পরেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হন ও ইহধাম ত্যাগ করেন। মনে হয়, আরো লেখবার ছিল।

তিনি দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধের 'নির্ব্বাণবাদ' দুঃখবাদ বা আত্মনিগ্রহ নয়। বুদ্ধ প্রথম দিকে দেশের প্রচলিত উপায় অবলম্বন করে শরীরকে পীড়ন করেছিলেন, যেহেতু শরীরই সকল পাপ ও বাসনার মূল। পরে দেখলেন, শরীরের ভিতর দিয়ে মনে যাওয়া যায়না, মনই মনের শত্রুতা করে। তখন মনের সঙ্গে মনের সংগ্রাম চল্ল। কিন্তু সংসার-ভাবনা তাড়িয়েও বতি, রাগ ও তৃষ্ণার (মারের তিন কন্যা) জ্বালাতন রইলো। তখন তিনি এই জ্ঞান পেলেন যে, যে অবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান হয়, সেই অবস্থা লাভ করতে হবে। তখন নিষ্কামভাবে শরীর পীড়ন, মানসিক সংগ্রাম ও অনুরূপ চিত্তের ভাব, তখন দুঃখও চাই না, সুখও চাইনা, অর্থাৎ প্রকৃতির পক্ষী প্রকৃতির আকাশে, সংসারের অতীত রাজ্যে, অনন্তের ভিতর বাস করে। তখনই পাপশূন্য অবস্থা লাভ হয়—এই অবস্থা কথায় বলা যায়না, উপলব্ধি করতে হয়। ঐ প্রবন্ধের কয়েকটী অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"সিদ্ধার্থ এখন নিষ্পাপ হইলেন, ছয় বৎসর ঘোর তপস্যা সাধন করিয়া শরীর মনের শৃঙ্খল একটী একটী করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আর শরীর পাপের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইবে না। আর মন কামনা-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না। আত্মারূপ মন্দিরে আপনার বলিয়া আর কেহ রহিল না। যাহা কিছু তাহার মধ্যে দূষিত ও দুর্গন্ধ ছিল, সকলই দূরীভূত হইল। আত্মা এবং অনন্তজগৎ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না।

আত্মারূপ পক্ষী অনন্ত আকাশে উড়িল। জীবনের যতগুলি দুরূহ প্রশ্ন তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল, এক এক করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। (তখন কার্য্যকারণ শৃঙ্খল ও অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবার উপায় দেখতে পেলেন) সকল প্রতিবন্ধক এখন বিনষ্ট হইল। সিদ্ধার্থ এখন তাঁহার মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন।"

"যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ এই চিন্তায় উপস্থিত হইলেন, যে, বিশুদ্ধনীতি অবলম্বনই দুঃখ-বিনাশের এবং নির্ব্বাণের একমাত্র উপায়, তাঁহার চক্ষু হঠাৎ উন্মীলিত হইল। আর তিনি অন্ধকারে রহিলেন না; তাঁহার দৃষ্টি আলোকে পূর্ণ হইল। আর তাঁহার কোন ভয় রহিল না। এই সেই নির্ব্বাণ, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীবন্মুক্ত হয়, যাহার প্রশংসা কবিগণ সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা পাইলে দেবতারা পুলকিত হন এবং যাহার আগমনে সমস্ত পৃথিবী আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। এই সেই নির্ব্বাণ, যাহার প্রভাবে সমুদয় চরাচর বুদ্ধের অধীনস্থ হয় এবং যাহার নির্দ্দেশে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। সিদ্ধার্থ সহসা এই আলোক পাইলেন। ইহা প্রকৃত প্রত্যাদেশ —সচরাচর ইহা লোকে পায় না। ...নীতিধর্ম্ম দুই প্রকার —এক প্রকার সামান্য ধর্ম্ম, আর এক প্রকার উচ্চ ধর্ম্ম। ...দুই ধর্ম্মই পুণ্য লইয়া গঠিত, দুইয়েতেই পাপের সহিত সংগ্রামের ব্যবস্থা। কিন্তু একটীতে কেবল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম চলিতে থাকে। অথচ পাপ চলিয়া নাও যাইতে পারে। আরেকটীতে পাপ একেবারে চলিয়া যায় এবং তাহার পর সংগ্রাম আর থাকেনা। ...ইহাই বৌদ্ধধর্ম্ম। বুদ্ধ পাপকে বৃক্ষ বলিয়া রূপক না করিয়া অগ্নির সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন। তৃষ্ণারূপ অগ্নি মনকে সদা দহন করিতেছে। তাহাকে নাশ করার নামই নির্ব্বাণ। ...ইহাই বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, ইহাই মুক্তি। এই নির্ব্বাণ বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

"বুদ্ধ যে নিরীশ্বর ছিলেন না, তাহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান ছিলনা, একথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়েন নাই, এ কথাও সত্য। তিনি প্রত্যাদেশের দ্বারা চালিত হইতেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সমুদয় ইতিহাস এই কথার পরিচয় দিতেছে। এই যে তাঁহার মনে নিরাশা ও নিরুদ্যম ভাব আসিয়াছিল, এই যে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করিতে পারিবেনা– এবং সেইজন্য তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজের ধর্ম্ম নিজের কাছে রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন— এই যে তাঁহার মনের ভাব কি উপায়ে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করিলেন, ব্রহ্মার কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মন দয়াতে পূর্ণ হইল। বাস্তবিক এই ঘটনাটি ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য নিয়মকে প্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, মন শূন্য হইলেই তাহাতে তৎক্ষণাৎ দেবভাবের আবির্ভাব হয়। যখনই বুদ্ধ কামনা নির্ব্বাণ করিলেন, তখনই কি হইল? তাঁহার মন হইতে পাপ চিন্তা গেল। এবং পাপ চিন্তা গিয়া কি আসিল? দয়া। অর্থাৎ কিনা একটি মন্দ গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ভাল আসিল। দয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। জীবে দয়া—কেবল মানবদিগের প্রতি দয়া নহে, সমুদয় জীবের প্রতি দয়া—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যাহাদিগের জীবন আছে, তাহাদিগের প্রতি দয়া করা বৌদ্ধদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর অন্য সকল পুণ্য আসিবে। সে দয়া তিনি কোথা হইতে পাইলেন? আপনা হইতে পান নাই। স্বর্গ হইতে সে কথা আসিয়াছিল। …ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলা যায়, এবং ইহা দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

(গ) 'অশোক-চরিত' (১৮৯২)—এই বইটী বাংলা ভাষায় সম্রাট অশোক সম্বন্ধে প্রথম বই। এই বইটীর তিনটী সংস্করণ হয়েছিল। Vincent Smith এর 'Asoka the Buddhist Emperor of India' বইটী এই বইটীর প্রথম প্রকাশের দশ

বৎসর পরে ১৯০১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। চারুচন্দ্র বসু মহাশয় Vincent Smith এর বই অবলম্বন করে আরো অনেক বছর পরে তাঁর 'অশোক' বইটী প্রকাশ করেছিলেন।

কৃষ্ণবিহারীর 'অশোক-চরিত' প্রকাশিত হলে 'ভারতী' পত্রিকা লেখেন—

"এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় সম্রাট অশোকের সম্বন্ধে এ রকম ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়নি। বইটীর প্রতি ছত্র পাণ্ডিত্যে পূর্ণ অথচ নিরাড়ম্বর সরলতা-ভূষিত।" অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন—'অশোক-চরিত' বাংলা সাহিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ জীবনী। 'সাধনা' পত্রিকায়ও বইটীর একটী চমৎকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্রাট অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম্মকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। খৃঃ পূঃ ২৬০ সনে ভারতের জাতীয় জীবনের উপর তখনকার বৌদ্ধধর্ম্ম কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা এই বইটীতে সুন্দর করে চিত্রিত করা হয়েছে। সেই সময়ে পাশ্চাত্য জগতে Burnouf, Wilson, Bigandet, Cunningham, Princep প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরাতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিকদের গবেষণা প্রকাশিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ে নূতন আলোক পাওয়া গেল, ২২০০ বৎসরের পুরাতন সেই ইতিহাস, সম্রাট অশোকের শিলালিপি, স্তূপ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নির্দ্ধারণ করার সুযোগ এল। বৌদ্ধধর্ম্ম কতভাবে দেশকে উন্নত করেছিল, আবার পরবর্ত্তী কালে কি ভাবে ও কেন সেই ধর্ম্ম অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাতে ভারত থেকে লুপ্ত হয়েছিল, সে সকল ঐতিহাসিক কাহিনী কৃষ্ণবিহারী প্রকাশ করেছেন। প্রাচীন বিষয়কে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য কৃষ্ণবিহারী 'অশোক-চরিত' নাটক প্রণয়ন করেছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে দেখা যায় যে, এলবার্ট কলেজের ছাত্রেরা ঐ নাটক অভিনয় করেন ও সেটী খুব প্রীতিকর হয়েছিল। অগ্রজ কেশবচন্দ্রের মত কৃষ্ণবিহারীও অভিনয়ে বিশেষজ্ঞ

ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন 'সারস্বত সমাজ' গঠন করেন, তার সভাপতি হন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র; সহযোগী সভাপতি হন—বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সৌরীন্দ্রমোহন; সম্পাদক হন কৃষ্ণবিহারী ও রবীন্দ্রনাথ। (ভারতী জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯) 'অশোক-চরিতের' একটী অধ্যায় এখানে উদ্ধৃত হল—

স্তূপ এবং বিহার-নির্ম্মাণ

গোরকপুরের নিকট কুশিনগর নামে এক নগর ছিল। সেই স্থানে শাক্য বুদ্ধের মৃত্যু হয়। কুশিনগর তখন মল্লজাতিদিগের রাজধানী ছিল। যখন শাক্যের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দ এবং অন্য কতিপয় বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যু হইলে পর আনন্দ মল্লদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সংবাদ দেন। তাঁহারা সদলে আসিয়া একটি শবশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর ভগবতের মৃতদেহ স্থাপন করিলেন এবং উহা স্কন্ধে লইয়া নানাবিধ বাদ্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে কুশিনগরের যেখানে মল্লদিগের রাজসভা এবং উৎসব হইত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইতে না হইতেই বুদ্ধের মৃত্যু-সংবাদ নানা দেশে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রু, তাহার পর ক্রমান্বয়ে বৈশালীর রাজপুরুষেরা, কপিলাবস্তুর শাক্যেরা, রামগ্রাম এবং পাবনগরের নৃপতিদ্বয় এবং বিশ্বদ্বীপের রাজপুরুষেরা সেই স্থানে আসিয়া মৃত দেহের অবশেষগুলি পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মল্লরাজপুরুষেরা তাহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কেন? আমরা শবের অবশেষ তোমাদিগকে দিব কেন? আমাদিগের রাজ্যে ভগবৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব অস্থি এবং ভস্ম সমূহ আমাদিগেরই প্রাপ্য।" অন্যান্য রাজপুরুষেরা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন— "আমরা ক্ষত্রিয়। আমাদিগের সঙ্গে ভগবতের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অবশেষগুলি আমাদিগেরই প্রাপ্য। যদি আমরা তাহা না পাই তাহা হইলে আমরা

যুদ্ধ করিব।" এইরূপ ঘোর বিবাদ হইতে হইতে যুদ্ধ হইবার বিলক্ষণ উপক্রম হইল। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিয়া সকলকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "যিনি শান্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অবশেষ লইয়া অশান্তি আনয়ন করা উচিত নহে। আমার বিবেচনায় আপনারা সকলেই ভস্ম এবং অস্থিগুলি ভাগ করিয়া লউন।" সকলে এই কথায় সম্মত হইলে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের উপর ভাগ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ সমুদয় অবশেষগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহার মধ্যে চারিটী সম্মুখস্থ দন্ত এবং দুইটি স্কন্ধের অস্থি ছিল। ভাগ হইয়া যাইবার পর কতকগুলি মৌর্য্য বংশের রাজপুরুষেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে, মল্লেরা বলিলেন—"দেখুন, সকলই ভাগ হইয়া গিয়াছে। আপনারা এই ভস্মগুলি লইয়া যান।"

রাজপুরুষেরা আপন আপন ভাগ লইয়া আপনাদিগের রাজধানীর মধ্যে একটি একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন। আটটি স্থানে চৈত্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদিগের নাম—রাজগৃহ, কুশিনগর, বৈশালী, কপিলাবস্তু, মল্লকপোত, রামগ্রাম, পাব এবং বিশ্বদ্বীপক।

অনেক বৎসর পরে মহাকাশ্যপ মনে করিলেন যে, ভগবতের দেহাবশেষ আটটি স্থানে গচ্ছিত আছে এবং এই আট দেশেরই রাজপুরুষেরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ এবং বিবাদ করিয়া উৎসন্ন যাইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের রাজ্য, রাজধানী এবং এই সকল স্তূপই বা কোথায় থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজ অজাতশত্রুর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন যে, এই সকল দেহাবশেষ এক স্থানে স্থাপিত করা উচিত। তৎপরে তিনি মহারাজের সম্মতি পাইয়া উক্ত রাজপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা দেহাবশেষের যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সকল কাশ্যপকে প্রদান করিলেন। কেবল রামগ্রামের স্তূপ যেমন তেমনি রহিল।

অনেক বৎসর পরে এখানকার অস্থিগুলি সিংহল দেশে প্রেরিত হয়।

মহাকাশ্যপ দেহাবশেষগুলি লইয়া রাজগৃহ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অজাতশত্রুর আজ্ঞায় ৮০ হাত গভীর একটি কূপ খনন করান হইল। সেই গহ্বর মধ্যে একটি মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশেষে ছয়টি স্বর্ণ নির্ম্মিত কোষের মধ্যে দেহাবশেষগুলি সঞ্চিত করিয়া সেইখানে রাখাইয়া দিলেন। প্রত্যেক কোষ এক একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত কোষের মধ্যে নিহিত, এবং এই রৌপ্য-নির্ম্মিত কোষ আবার এক একটি বহুমূল্য প্রস্তর-নির্ম্মিত কোষের মধ্যে রক্ষিত। এইরূপে আটটি কোষ একটির ভিতর আর একটি ছিল। বহু সংখ্যক বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং বুদ্ধের শিষ্যদিগের এবং তাঁহার পিতা ও মাতার প্রতিমূর্ত্তি সকলও ক্রমান্বয়ে সেইস্থানে স্থাপিত হইল। সেই মন্দিরে পাঁচ শত দীপ সর্ব্বদাই জ্বলিত। কাশ্যপ একটি স্বর্ণ পাত্রের উপর এই কয়েকটি কথা লিখিয়া তথায় রাখিয়া দিলেন, "ভবিষ্যতে প্রিয়দর্শী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জম্বুদ্বীপে বিতরণ করিবেন।" তাহার পর দ্বারগুলি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া মন্দিরের চারিদিকে ছয়টি প্রস্তর এবং ইষ্টকের প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর কাশ্যপ অজাতশত্রুর আজ্ঞায় এই সমস্ত ভূগর্ভে নিহিত করিয়া তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বাহিরের কোন লোক হঠাৎ দেখিয়া বুঝিতে পারিত না যে, ইহার ভিতরে এত কাণ্ড আছে।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, একজন রাজার পর আর একজন রাজা আসিলেন, এবং এক রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায় আর এক রাজবংশ আসিল। অবশেষে অশোক জম্বুদ্বীপের রাজাধিরাজ হইলেন। বৌদ্ধদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার

ভিতর ভগবতের দেহাবশেষ রক্ষিত করিব। কিন্তু দেহাবশেষ পাই কোথা?" এই ভাবিয়া তিনি সকলকে দেহাবশেষ অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। বৈশালী, কপিলাবস্তু প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্তূপ নির্ম্মিত ছিল, তাহা সকলই তিনি ভূমিসাৎ করিলেন। কিন্তু কোথাও দেহাবশেষ পাওয়া গেলনা। সেই সকল স্তূপ পুনঃ নির্ম্মিত করাইয়া তিনি রাজগৃহে আসিলেন। তথায় যত ভিক্ষু ছিল, সকলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"আমার বয়স এখন এক শত বৎসরের অধিক। আমার যখন সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল, তখন একদিন আমার গুরু ফুল এবং সুগন্ধি লতা সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে এক স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় আমাকে একটি ক্ষুদ্র স্তূপ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এইখানে প্রণাম কর এবং এস্থান কখনও ভুলিও না। সেই স্তূপটি কি এবং তাহা কাহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, সে বিষয়ে তিনি আমাকে কিছুই জ্ঞাত করাইলেন না।" অশোক এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই স্থানই আমি অনুসন্ধান করিতেছি।" সকলে এই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। ভূমি খনন করিতে করিতে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সকলেই দেখিলেন, তাহার ভিতর তখনও দীপ জ্বলিতেছে, ফুলগুলি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং চারিদিকে সুগন্ধ বহিতেছে। অশোক একটি স্বর্ণ-পাত্র উঠাইয়া দেখিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত আছে—"ভবিষ্যতে প্রিয়দর্শী নামে একজন রাজা এই সকল দেহাবশেষ জম্বুদ্বীপে বিতরণ করিবেন।" তখন তিনি উৎফুল্লহৃদয়ে দেহাবশেষগুলি লইয়া, মন্দিরটি যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক নগরেই স্তূপ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। সেইসকল স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ বৎসর লাগিল। অবশেষে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠার দিন আগত হইল। অশোক সকল স্থানেই এই আদেশ পাঠাইলেন যে, সেই দিবসে

শাক্যপুত্রেরা সর্ব্ব প্রকার নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবেন। অশ্ব, রথ ও হস্তী কাতারে কাতারে গমন করিবে এবং তন্মধ্যে এক বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে দেহাবশেষ আরোপিত হইবে। এতদ্ব্যতীত পুষ্পমালা এবং দীপমালাদ্বারা নগর সকল সুশোভিত হইবে এবং লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্রাহ্মণ শ্রমণদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। সেই দিন জম্বুদ্বীপের পক্ষে এক বৃহৎ দিন হইয়া গিয়াছে। অশোক এই আদেশ পর্ব্বত, পৃষ্ঠে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত এবং পুলকিত হই।"

নববিধান কি? (১৮৯৭)—এই বইটী কৃষ্ণবিহারীর শেষ রচনা। অর্থাভাবে নিজে বইটী ছাপিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর পিতার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে পুত্র কুমুদবিহারী সেন বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটিতে নববিধানের মূলতত্ত্বগুলি মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাসের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির ভাষা চমৎকার। বইটিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন— (১) ঈশ্বরের স্বরূপ, (২) ঈশ্বরের প্রকাশ, (৩) সমন্বয় ধর্ম্ম, (৪) নববিধানের আবশ্যকতা কি?

যথাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের কথাও আলোচিত হয়েছে। তাঁর প্রতিপাদ্য হ'ল যে, একদিকে যেমন 'নেতির' ভিতরঅস্তিইতি' আছে, সেইরকম বাসনার নির্ব্বাণে প্রত্যাদেশ ও যোগের রাজ্য, বুদ্ধত্ব প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ "যে রাজ্য চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায় না", "যে রাজ্য অন্যকে ভাষায় বুঝান যায় না" বুদ্ধদেব সেই দিকেই মানুষের চিন্তাকে ফিরাবার আয়োজন করেছিলেন।

৯। 'বুদ্ধদেব-চরিত ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' (১৮৮৩)
—কৃষ্ণকুমার মিত্র

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 'সাধুসমাগম' দেশকাল-নির্ব্বিশেষে সাধুদের সঙ্গে নূতন অধ্যাত্মযোগের সূচনা করে। বাংলা সাহিত্যে তার ক্রিয়ার নিত্য নূতন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার সমন্বয়-অধ্যয়নের ফলে যখন এক একটী সাধুর জীবন-রহস্য অধ্যেতারা প্রকাশ করতে থাকেন, তার ক্রিয়াও অতি

অপূর্ব্ব দাঁড়ায়। তার ভিতর সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্ব্বাণ-তত্ত্ব' বইটী বুদ্ধদেবের শিক্ষার নানান্ দিক আধুনিক প্রয়োজনের দিক থেকে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বইটী তার একটি দৃষ্টান্ত। ছাত্র বয়সে কৃষ্ণকুমারের উপর ব্রহ্মানন্দের প্রভাব পড়েছিল, আবার তাঁর সাধনার এই সকল ফলের ক্রিয়াও তাঁর উপর বিশেষ কাজ করেছিল।

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বাঘিল গ্রামে ১৮৫২খৃঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮৪ বৎসর বয়সে ১৯৩৬খৃঃ কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। তিনি বাল্যকালে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সাধকদের সংস্পর্শে আসেন, তার ভিতর শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, বিহারীলাল সেন, ঈশানচন্দ্র সেন ও শ্রীনাথ চন্দের নাম করা যায়। সে সময়ের অধিকাংশ শিক্ষক হয় ব্রাহ্ম, নয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সেই রকম শিক্ষকদের কাছেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ ময়মনসিংহে একটী কৃষিপ্রদর্শনী হয়। সেখানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ও বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় কৃষ্ণকুমারের মনে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় একটা স্পষ্ট ধারণা হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হন। দু এক বছর পরে কলিকাতা থেকে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোর-নাথ গুপ্ত, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং ঢাকা থেকে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, কালীনারায়ণ রায় প্রভৃতি ময়মনসিংহে আসেন। ময়মনসিংহের একদল যুবক তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের ভিতর কৃষ্ণকুমার মিত্র, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রাধানাথ ঘোষ, কালীশঙ্কর দাস, গোবিন্দচন্দ্র গুহ, রজনীকান্ত গুহ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ছিলেন। কৃষ্ণকুমার 'আত্মচরিতে' * লিখেছেন যে, তখন তাঁদের ভিতর ধর্ম্মের জন্যে খুব ব্যাকুলতা ছিল। তাঁরা সঙ্গীতাচার্য্য

* কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত' (১৯৩৬ খৃঃ), কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ত্রৈলোক্যনাথের রচিত এই গানটী খুব গাইতেন ও তার থেকে খুব প্রেরণা পেতেন—

বিভাস একতালা

ওহে দীননাথ, কর আশীর্ব্বাদ, এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে।
তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চিরভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী;
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপটে হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব;
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে
নিত্য সত্যব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন;
ভয় বিপদ্‌কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥

কৃষ্ণকুমার ১৮৭০ খৃঃ এন্ট্রান্‌স পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতায় আসেন ও পরে জেনারেল এসেমব্লীজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ থেকে বি, এ, পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর আইনশাস্ত্র পড়েন, কিন্তু পরীক্ষা দেন নি। ছাত্রাবস্থায় তিনি কলিকাতার ৫৬নং পঞ্চানন তলায়, পরে ৪৬নং মির্জাপুরের ব্রাহ্ম মেসে থাকতেন। সে সময়ে মির্জাপুর ষ্ট্রিটে 'ভারত আশ্রম' ছিল। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়েরা থাকতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন সবে বিলাত ভ্রমণ করে ফিরে এসে, বহু নূতন আন্দোলনে দেশকে মাতিয়ে তুলছেন। তার ফলে সে সময় আর লোকে ব্রাহ্মদের বিদ্রূপ করতে সাহস পেতেন না। তাতে তাঁরা খুব বল পেয়েছিলেন। ঐ সময় বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় প্রায়ই তাঁদের ব্রাহ্মমেসে এসে উন্মত্ত উপাসনা করতেন। মেসের ছেলেরা, প্রায় সবাই, প্রতি রবিবারে প্রাতে, ব্রহ্মানন্দের কলুটোলা বাড়ীতে ও সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গিয়ে ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। এই আবহাওয়ায় কৃষ্ণকুমারের ছাত্রজীবন গড়ে ওঠে। কলেজের পড়া শেষ করে দেশে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণকুমার একটী পাঠশালা খোলেন। কিছুদিন পরে ১৮৭৪খৃঃ তিনি বন্ধুদের আহ্বানে কলিকাতায়

আবার ফিরে এসে, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করার কাজে লাগেন। ১৮৭৬ খৃঃ তাঁরা Indian Association প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর, প্রজাসত্ব আইন, খোলাভাটি প্রথা, লবনের শুল্ক বৃদ্ধি, দেশী ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র দলন আইন, মিউনিসিপ্যালিটীতে বেসরকারী সভ্য নিয়োগ, ইলবার্ট বিল, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস, সিবিল সার্বিস অন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বরিশাল কনফারেন্স, অরবিন্দ ঘোষের জন্য বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি এক একটী উপলক্ষ্য করে রাজনৈতিক আন্দোলন বাড়িয়ে তুলতে থাকেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন কৃষ্ণকুমারের আত্মীয়। তাঁর জন্য, বিচারের ব্যবস্থা করার অভিযোগে, তাঁকে বিনা দোষে ১৯০৮ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর ১৪ মাসের জন্য দেশান্তর শাস্তি দেওয়া হয়। ঐ মিথ্যা নির্য্যাতনে তাঁর ভিতর সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বিশ্বাস আরো প্রবল হয়ে উঠলো। মুক্তি লাভ করে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন বাড়িয়ে তোলার কাজে নিজেকে ব্যপৃত না রেখে, দেশহিতৈষী কাজকর্ম্মের সঙ্গেই বেশী যুক্ত হলেন। তবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছাড়েন নি। তাঁর 'আত্মচরিতে' দেখা যায় তিনি বলেছেন—

"এই সময় শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। ইঁহাদের বিশ্বাস ভক্তি নাই, সর্ব্বদা এই কথা শুনিতাম। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।" (পৃঃ ১৪৩)

কিন্তু রাজনৈতিক কর্ম্মসূত্রে তাঁকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতান্ত্রিকতার আন্দোলনের ভিতরেই এনে ফেল্লো। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় নানা দেশ-হিতৈষী কাজ, সঞ্জীবনী পত্রিকা, সিটি স্কুল ও সিটি কলেজের পরিচালনা, গ্রন্থ রচনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে চিরদিন পরিশ্রম করে গেছেন। ব্রহ্মানন্দের সাধু-সমাগমের প্রভাবও তাঁর উপর খুব কাজ করেছিল। বিভিন্ন মহাপুরুষদের বিষয় নানাস্থানে

বক্তৃতা দান ও তাঁদের জীবনী রচনা তার প্রমাণ। তাঁর 'বুদ্ধদেব-চরিত' (১৮৮৩ খৃঃ) *, 'মহম্মদ-চরিত' (১৮৮৬খৃঃ) বই দুটী পাঠ্যপুস্তক হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'চৈতন্য-চরিত' ও 'নানক-চরিত' বিষয়ে তিনি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেছেন এবং দুটী বইও লিখেছিলেন জানা যায়, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি।

'বুদ্ধদেব-চরিত' বইটী তিনি Sacred Books of the East অবলম্বনে রচনা করেছিলেন। বইটীতে Alabaster, Beal, Upham, St.Hilaire, Father Berry, Hardy Bigandet, Bournouf, Princep, Cunningham প্রভৃতির মতামতও উপস্থিত করেছেন। তিনি নীতিমান সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধদের ভিতরের ও বাহিরের কথা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মমত, নারীদের স্থান, ক্রীতদাসদের স্থান, সাধারণ লোকদের ভিক্ষুসংঘে স্থান ও বুদ্ধদেবের প্রচার-প্রণালীর কথা বইটীতে লিখেছেন। তিনি দুটী জিনিষ এই বইটীতে বিশেষ করে দেখিয়েছেন, যে বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না ও খৃষ্ট-জগৎ বৌদ্ধদের কাছে অনেক বিষয় ঋণী। ঐ বইটীর কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পর যখন বুদ্ধ স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবেন কিনা, এ বিষয়ে নানা তর্ক তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতেছিল, তখন তাঁহার মনে হইল— 'এই জন-সমূহ প্রসন্ন, আমি ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইব। আমার এধর্ম্ম সকলেরই গ্রাহ্য হইবে। আমি ব্রহ্মসহ অভিন্ন, আমার চরণে প্রণত হইয়া সকলেই ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট প্রার্থনা করিবে। জ্ঞাণিগণ ইহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন।' * এই উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, বুদ্ধ ব্রহ্মে বিশ্বাস করিতেন এবং অদ্বৈতবাদী ছিলেন।" (পৃঃ ১৫৭)

"অনেকে বলিয়া থাকেন, যদি বুদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, তবে তাঁহার উপদেশের মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের নাম

* 'তত্ত্বকৌমুদী' ১৮০৪ শক ফাল্গুন, সমালোচনা

* 'ললিত বিস্তর' ৫১০—৫১১ পৃষ্ঠা।

নাই কেন? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধ নির্গুণ নিশ্চেষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যিনি নির্গুণ, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। মানব পাপ ও দুঃখভারে পীড়িত হইয়া সহস্র ক্রন্দন করিলেও তাঁহার মহা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারে না। সুতরাং মানবের পরিত্রাণের পক্ষে এমন ঈশ্বর সহায় হইতে পারেন না। …ব্রহ্মই এ জগতে একমাত্র সৎ, আর সব অসার। মানব অজ্ঞানতার বশীভূত হইয়া মোহজালে জড়িত হইয়া 'আমার আমার', 'সংসার সংসার' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অজ্ঞানতা নিজের বলে বিনাশ করিতে হইবে।" (পৃঃ ১৬১—২) "এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল। পরিত্রাণ পাইতে ঈশ্বর-প্রসাদের কোন প্রয়োজনীয়তা না দেখিয়া, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়াছিল।" (পৃঃ ১৬২)

"বুদ্ধ ধর্ম্মসাধনের ক্রমোন্নত উপায়পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নূতন শিষ্যদিগকে তিনি সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে বলিতেন; তৎপর সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিতেন। সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা উপলব্ধি না হইলে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সমুদয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।" (পৃঃ ১৬৫) "ধ্যান ও সমাধি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার ধ্যান প্রচলিত ছিল। প্রথমাবস্থায় যখন সাংসারিক বিষয়সমূহের অসারতা প্রতীতি হইত, তখন প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে মন নিবিষ্ট করিতেন। দ্বিতীয় অবস্থায় মন কেবল এক পরম পদার্থে মগ্ন হইয়া যাইত। তৃতীয় অবস্থায় আত্মা সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইত। চতুর্থ অবস্থায় আমিত্ব-ভাব বিদূরিত হইয়া যাইত। অবশেষে সমাধির অবস্থা। এই অবস্থায় বাহ্যিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হওয়াতে অপার শান্তির উদয় হয়—মন নিবাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া গণ্য হইত। …এই অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বৌদ্ধ যোগিগণ ধ্যেয়-বস্তুর চিন্তায় বহুকাল অবস্থিতি করিতে

পারিতেন। এই যোগবলে বৌদ্ধগণ হস্তস্পর্শে দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইতেন।" (পৃঃ ১৬৯)

"সে সময়ে সামাজিক, কি ধর্ম্ম বিষয়ে স্ত্রীজাতির কোন অধিকার ছিলনা। স্ত্রীগণ আহার করিতেন, গৃহে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন ও পুরুষের ক্রীড়াপুত্তুল ছিলেন। সংসারের নীচ কার্য্যগুলি তাঁহাদিগের জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত ছিল। যখন নারীজাতি সম্বন্ধে এই ভাব, তখন রমণীদিগকে সংঘ-মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দিয়া ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা দিবেন কিনা, এবিষয়ে দোদুল্যমানচিত্ত হওয়া বিচিত্র কি? অবশেষে আনন্দের পরামর্শ অনুসারে যুগযুগান্তের কুসংস্কার ছিন্ন করিলেন। দেশের চিরপ্রচলিত প্রথার বিপর্য্যস্ত করিয়া ধর্ম্মের দ্বার রমণীদিগের নিকট অবারিত করিলেন—রমণীগণ এই সময় হইতে স্বাধীন-ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ১১৫-৬)

১০। 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃঃ প্রথম অভিনীত ও ১২৯৪ সন, ১৮৮৭ খৃঃ প্রকাশিত

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক বিস্ময়ের উৎপাদন করে। তার আগে ঐ বিষয়ে নাট্য হয়নি, তারপরেও হয়নি! সে সময়ে এদেশের একটা সংস্কারই ছিল যে, বুদ্ধের নাম করলে অমঙ্গল হয়। তখন একমাত্র কেশবচন্দ্র ও তাঁর দলের সাধক ও অধ্যেতারা বুদ্ধের বিষয় নিয়ে সমন্বয়ের সন্ধানে জীবনের আঙ্গিনায় ঘোরাফেরা করতেন। আর যাঁরা বুদ্ধ-বিষয়ে আলোচনা করতেন, সমস্তই গবেষণা কিম্বা একটী System এর চর্চ্চা হিসাবেই করতেন।

নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র কলিকাতার বাগবাজারের বসুপাড়া পল্লীর সম্ভ্রান্ত নীলকমল ঘোষ (বুককিপার) মহাশয়ের অষ্টম সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর জন্ম ১২৫০ সনে (১৮৪৩ খৃঃ)। তিনি বাল্যে প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও পরে হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৪ বৎসর বয়সের ভিতর পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হারিয়ে তিনি

যেন দিশাহারা হন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে আর পড়াশুনায় অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিজে বাড়ীতে পড়ার চর্চ্চা রেখেছিলেন। বিশেষতঃ ইংরাজী কাব্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। 'কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী', 'এশিয়াটিক সোসাইটী' ও 'সায়েন্স এসোসিয়েসনের' সভ্য হয়ে, তিনি চিরদিন উচ্চবিদ্যার সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন। ছেলেবেলায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতির পাঠে, কথকতা ও ভিখারীদের গানে তাঁর খুব আনন্দ দেখা যেত। বয়সের সঙ্গে তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার দিকে আকৃষ্ট হন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি কিছুদিন পিতৃ-ব্যবসায় বুককিপারের কাজ করেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর টান ছিলনা। নাট্যরুচি অনুসারে ১৮৬৭ খৃঃ ২৪ বৎসর বয়সে তিনি বাগবাজারে একটী অবৈতনিক যাত্রার দল গড়ে, যাত্রা আরম্ভ করেন। সব প্রথমে তাঁরা মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় করেন। তখন বাধ্য হয়ে তার উপযোগী কয়েকটী গান তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল। সেই তাঁর প্রথম রচনা। ক্রমে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'লীলাবতী', 'নীলদর্পণ'; মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', 'মেঘনাদবধ'; বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিণী', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ'; কবিবর নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'; রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ' প্রভৃতি সমসাময়িক জনপ্রিয় উপন্যাস, কাব্যপ্রভৃতিকে নাট্যাকারে পরিণত করে অভিনয় করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবে যশস্বী হয়ে উঠলেন। এছাড়া, দেশের চিরপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে তিনি বহু গীতিনাট্য রচনা করে অভিনয় করেন। তার ভিতর আগমনী, অকালবোধন, দোললীলা, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী, রাবণবধ, রামের বনবাস প্রভৃতির নাম করা যায়।

১৮৮৩ খৃঃ তিনি 'ষ্টার থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে তাঁর নাট্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তার পিছনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ডাঃ রমাপ্রসাদ

চন্দ মহাশয় এক জায়গায় বলেছিলেন যে, সে সময় এদেশে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের এমন প্রভাব হয়েছিল যে, মনে হত, সমস্ত দেশই তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করবে। দেশ-বরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন—যে ব্রহ্মানন্দ সমস্ত যুবকসম্প্রদায়কে আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি এদেশকে বাগ্মিতার শক্তি ও ব্যবহার শিখিয়েছিলেন *। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন যে তিনি বাংলা শেখার জন্য কেশবচন্দ্রের উপাসনাদিতে যেতেন। কেবল নিভৃত সাধন নয়, দেশের উন্নতির জন্য যতরকম শক্তি প্রয়োগ করা যায়, যথা—পুস্তিকা-রচনা, Poster মারা, পত্রিকা-সম্পাদনা, দেশভ্রমণ, নগরের পথে কীর্ত্তন, সাধারণ উপাসনা, বক্তৃতা, আলোচনা—কেশবচন্দ্র নিজে প্রয়োগ করেছিলেন এবং অন্যদের প্রয়োগ করতে শিখিয়েছিলেন। যেমন জীবনের উপর, তেমনি সাহিত্যের উপরেও তাঁর অশেষ প্রভাব পড়েছিল। এমনকি, যাত্রা, কথকতা ও অভিনয়েও তাঁর অশেষ দান। তখনকার দিনে ভাল রঙ্গালয় ছিলনা। † গণ্যমান্য লোকদের বাড়ীতে আমোদের জন্যই নাট্য হত। তখন চড়ক, যাত্রা, কথকতা, কবির লড়াই-এর চলন ছিল। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত অশ্লীলতা-পূর্ণ ছিল। নাট্যাভিনয়ের ভিতরেও সেই অশ্লীলতা-দোষ ঢুকেছিল, অভিনেতাদেরও সুনাম ছিলনা। সেজন্য ব্রহ্মানন্দ ১৮৭৮ খৃঃ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব মহাশয়কে সভাপতি করে একটী সমিতি গঠন করেন ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নের জন্য সরকারকে চাপ দেন। সুরুচি ও সুশিক্ষাপ্রদ নাটক প্রচলনের জন্য নিজে মাঝে মাঝে অভিনয়ও করেছেন। তাঁর প্রথম অভিনয় Hamlet (১৮৫৭) ; সেক্সপীয়রের এই অভিনয়টি তিনি খুব ভালবাসতেন ও মাঝে মাঝে করতেন। পঁচিশ বছর পরেও Liberal and the New Dispensation পত্রিকায় (15. 1. 1882) লেখেন—

"Herr Bandman deserves the thanks of the Native Public for having brought Shakespeare's Hamlet on the

* 'A Nation in Making'—S. N Banerjea

† 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

stage. It is a rare intellectual treat not only here, but even in England. Seventh rate comedies, coarse farce and vulgar love stories have degraded the stage. All honour, therefore, to him, who is trying not only reviving Shakesperian plays but is doing so with remarkable ability and success. It would be a good thing if the advanced students of the various schools and colleges in the metropolis could be helped to witness and profit by this most instructive dramatic performance. Is there no wealthy admirer of Shakespeare among the Calcutta aristrocracy who could engage the seats at the Corinthian for the benefit of poor students and have a special night for them?"

বিখ্যাত সেক্সপীয়র-অভিনেতা Herr Bandmanও কেশবচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন *।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে ১৮৫৯খৃঃ তিনি 'বিধবা-বিবাহ নাটক' অভিনয় করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর এই হৃদয়ের যোগ চিরদিন ছিল এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকার সংবাদ থেকে দেখা যায় যে সময়ে সময়ে অর্থাভাব বশতঃ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রকাশিত না হলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিনামূল্যে, নিজ মুদ্রাযন্ত্রে তা ছাপিয়ে দিয়েছেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শেষ অভিনয় হল 'নববৃন্দাবন' বা ধর্ম্মসমন্বয় নাটক। নাটকটি ১৮৮২ খৃঃ মে মাসে প্রকাশিত হয়।

Administrative Report of Bengal 1882-83 লেখেন—

"Of the 56 original dramas received during the year, only three deserve special notice. *Naba Brindaban,* by Babu Trailokya Nath Sanyal, reflecting the spirit and principles of Babu Keshub Chunder Sen's New Dispensation, etc."

ঐ নাটকে 'Young Bengal-এর' একটা ছবি পাওয়া যায়। ইংরাজদের আগমনের পর, এদেশে যে সব নূতন

* 'Brahmananda Keshub Chunder Sen : Testimonies in memorium' (Vol. II. P. 91)—Compiled by G. C. Banerji

সামাজিক অভাব ও অবনতি প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিল, সেগুলি নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন, আর তার প্রতিকারের উপায়-রূপে মাদকতা-নিবারণ ও সমাজ-সংস্কার, বিবেক ও সমন্বয়-ধর্ম্মের পথ দেখিয়েছেন। এই নাটকটী জাতির জীবনে যুগান্তর এনে দেয়। এই অভিনয়ে ব্রহ্মানন্দ নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সহসাধকেরাও গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পরে 'কলিসংহার' নামে আরেকটী নাট্যাভিনয় হয়েছিল এবং এই জাতীয় অভিনয়ের ধারা সমানে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত চলে এসেছে দেখা যায়।

কৃষ্ণবিহারী সেন Liberal পত্রিকায় (১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খৃঃ) কলিকাতার রঙ্গালয় বিষয়ে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন, তাতে বলেন—

"Evidently the drama needs reform. When far from being used as an agency of social elevation, and moral purity, it is brought down to contaminate the very sources of society, and train up the young in fornication and libertinism, it is time that the guardians of public morals should think of some remedy."

"And hence the Brahmo Samaj which has identified itself with every manner of good to the people has found it necessary to give its principles a dramatic representation. With a drama written by a pure-minded devotee, with a staff of actors who in ordinary life observe the strictest rules of asceticism and intense piety, the New Dispensation introduced into the stage last night the *Nava Brindaban.* It marks a new departure in the history of the Brahmo Somaj. It is meant to be the ideal of dramatic morality. It is meant to popularize the highest religious and moral truths. It is meant to expose evil in its native deformity. . . .

This theatre will prove that our religion is not composed merely of moody devotions, bitter asceticism, furious dancing, and vociferous sermonizing, but there enters into it the element of a pure rational amusement

which finds the spirit of religion pervading the house of worship as well as the house of play."

'নববৃন্দাবন' অভিনয় 'কমলকুটীরে' কয়েকবার হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে, খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতেও এর অভিনয় হয়েছিল। তখনকার ধনী জমিদার ও রাজারাও যে কত Progressive ছিলেন তা এর থেকে প্রমাণিত হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' দেখা যায় যে এজন্য শিক্ষামন্দিররূপে একটী উচ্চ শ্রেণীর 'জাতীয় নাট্যমঞ্চ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও হয়েছিল এবং 'এলবার্টহলে' তার কাজ কিছুদিন চলেছিল। বর্ত্তমান বৎসরে 'ভিক্টোরিয়া কলেজে' যে নূতন 'কেশব মেমোরিয়াল হল' নির্ম্মিত হয়েছে, সেটী তার স্থান অংশত পূর্ণ করবে আশা করা যায়। পুরাতন পত্রিকার সংবাদ-স্তম্ভ থেকে কয়েকটি সংবাদ এখানে উদ্ধৃত হল—

"The *Naba Brindaban* was performed at the *Lily Cottage* on Saturday the 2nd instant. It was not entirely a public occasion; about 200 gentlemen, mostly friends, were invited to witness the Rehearsal. . . . The first public performance will be given on Saturday next."

—*Liberal*, Sept. 10, 1882.

"First performance was given on the 9th inst. at the *Lily Cottage*." —*Liberal*, Sept. 17, 1882.

"The second performance of the New Dispensation Drama at the Lily Cottage on Saturday the 16th instant was a decided success. The audience was much larger than had been expected.

Those who have not seen the performance are apt to imagine that the representation of religious subjects on the stage must be fraught with technicalities and abstruse doctrines and arguments. But no. The object of the promoters is to represent the views which they hold of religion in a popular way and to bring them home to men's bosom and business. Theatres are generally regarded in this country and in other countries, as

pandering to the lower propensities of nature, just as songs and dances are generally regarded. The high moral tone which they originally possessed has lost its character in the hands of mercenery and unprincipled actors and of irreputable pleasure seekers.—*Liberal*, Oct. 1st, 1882.

"The assembly at the second public performance of the *Nava Brindaban* (on 16th September) was just as crowded as that on the opening might. The demand for seats has steadily increased, and applications are still pouring in. The popularity of the drama has surpassed our most sanguine expectations. Among the audience were many distinguished gentlemen, holding high positions in Native Society and representing different sections of the educated community. Among others we noticed the Maharajah of Kuch Behar, Maharajah Sir Jotendra Mohun Tagore, Hon'ble Kristo Das Pal, Rai Kannye Lall Dey Bahadur, Pandit Mohesh Chunder Nayaratna, Doctor Mohendra Lall Sircar, Kumar Surendra Mullick, B. L. Gupta, Esq., Abdur Rahman, Esq. There is a general complaint that the drama is a little too long. It is proposed to curtail it so as to bring the representation on the stage within three or four hours." —*Liberal*, Oct. 1, 1882

"The drama of the New Dispensation (*Nava-Brindaban*) was performed at the Pathuriaghata Rajbati at the special request of Maharajah Sir Jotendra Mohan Tagore and Raja Sourendra Mohan Tagore. The elite of the Calcutta community was present on the occasion. From what we saw on the occasion the reception accorded to the drama was all that could be desired. The courtsey of the two brothers and other friends was specially appreciated. What struck the audience was the sacred character of the performance and the catholicity of the doctrines preached. In the temptation scene conscience presented a sword from Rishi Christ to

the hero; yet this did not strike the audience as strange or outlandish. The whole thing was presented in a purely national garb. The highest Christian ethics was combined with the deepest spirituality belonging to India, and the result was a combination as grand as it was natural and simple. God be praised; may His holy dispensation prosper." —*Liberal*, Dec. 10, 1882.

"The actors were believers in the New Dispensation, many of them were apostles, and included the Minister, Bhai Protap Chunder, Bhai Mahendra Nath, Bhai Wooma Nath, Bhai Rama Chunder, Bhai Kedarnath, Bhai Gour Govind, and latterly Bhai Trailokya Nath and Bhai Dina Nath."

—*The New Dispensation*, Feb. 11, 1883.

"The *Nava Brindaban* was again acted this afternoon January 25th, 1883, in connection with the 53rd Anniversary of the Brahmo Samaj and among those present we noticed the Venerable Paramhansa of Dakshineswar." —*The New Dispensation*, Feb. 18, 1883.

"The Drama of the New Dispensation (*Nava Brindaban*) was enacted on Monday last (March 12th, 1883) at the mansion of the late Sir Rajah Radhakant Deb, at Sobhabazar. Nearly 4,000 persons were present. The piece was repeated last night (March 17th, 1883), at the house of the late Khelut Chunder Ghosh at Pathuriaghata." —*Liberal*, March 18, 1883.

"There was another performance of the *Nava Brindaban* drama on Thursday last (March 22nd 1883). Nearly five hundred persons assembled at the Great Eastern Circus Pavilion to witness it. All were evidently impressed with the solemn scenes of a sinner's conversion as well as the more humourous incidents of the plot."

—*The New Dispensation*, March 25, 1883

যেখানে দেশের গণ্যমান্য লোকেরা, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, ধর্ম্মপ্রচারক, সাধুসজ্জন, অভিনেতা, গায়ক,

ইংরাজ রাজপুরুষেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, সেখানে নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন। আর নীতি ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাটক যে রঙ্গালয়ের এত উপযুক্ত হতে পারে এবং আদরলাভ করতে পারে, তাতে অনেকেরই চোখ খুলে যায়। গিরিশচন্দ্র তার পরেই 'ষ্টার থিয়েটার' স্থাপনা করলেন (১৮৮৩ খৃঃ) এবং সেখানে একে একে 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব-চরিত' ও 'রূপসনাতন' অভিনয় করলেন।

'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয় ২রা আগষ্ট, ১৮৮৪ খৃঃ। অনেকেই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, তার ভিতর পরমহংসদেবও এসেছিলেন। শোনা যায় তাঁকে প্রথমে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। পরমহংসদেবের পক্ষে এই ভাবে একটী রঙ্গালয়ে আসার মূলেও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। পরমহংসদেব * ১৮৭৫ খৃঃ, ১৫ই মার্চ্চ ব্রহ্মানন্দকে দেখবার জন্য 'বেলঘোরিয়া তপোবনে' যান। তারপর তাঁদের ঘনিষ্টতা খুব বেড়ে ওঠে। ব্রহ্মানন্দ নিজ পত্রিকায় পরমহংসের কথা সাধারণকে জানান। তিনিই পরমহংসদেবকে দূরে না থেকে, সাধারণের ভিতর এসে, ধর্ম্মভাব ছড়াবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং নিজে ব্যবস্থা করে অনেক স্থানে এরূপ সভার আয়োজন করে দেন। সে সংবাদ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও New Dispensation পত্রিকায় পাওয়া যায়। পরমহংসদেব তখন ব্রহ্মমন্দিরে, ব্রহ্মানন্দের বাড়ীতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এমনকি 'নববৃন্দাবন' অভিনয়েও উপস্থিত ছিলেন, দেখতে পাই।

এখন দেখা যাক্ 'বুদ্ধদেব-চরিত' অভিনয় করার প্রেরণা তিনি পেলেন কোথায়? আগেই বলেছি যে, গিরিশচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের বক্তৃতাদি বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যেতেন ও যোগ দিতেন। ব্রহ্মানন্দের অনুগামী ও প্রচারক ভাই অমৃতলাল বসু বাগবাজারের ছেলে ও এঁদের বন্ধু ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, তখন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর বন্ধু নববিধান-প্রচারক ভাই প্রিয়নাথ

* 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী'—ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত।

মল্লিকের সঙ্গে 'নববৃন্দাবন' অভিনয়ে একবার ঋত্বিকের অংশ অভিনয় করেছিলেন *। 'সাধু-সমাগম' অনুষ্ঠানের কথা আগে বলা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ দুজনেই সম্ভবতঃ উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠান উপাসনা, প্রার্থনা ও অভিনয়ের আকারে হয়েছিল। সাধু-সমাগমের তৃতীয় অনুষ্ঠান 'শাক্য-সমাগম'। শাক্য-সমাগমের পূর্ব্বদিনে প্রস্তুতি হিসাবে বাগবাজারের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের বাটীতে ব্রহ্মানন্দ 'আত্মাপক্ষী' বিষয়ে একটী উপদেশ দেন।

"শাক্য-সমাগমের পূর্ব্বদিন ১লা চৈত্র ১৮০১ শক শনিবার বাগবাজারস্থ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বাটীতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র 'আত্মাপক্ষী' বিষয়ে উপদেশ দেন। উহা তৎকালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।" **

এই বক্তৃতায় গিরিশচন্দ্র যে উপস্থিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজেই পরদিন 'শাক্য-সমাগম' অনুষ্ঠানেও তাঁর যোগদান খুবই সম্ভব বলে মনে হয়। সাধু-সমাগমের কথা সংবাদপত্রাদিতে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, দেখা যায়। এই 'সাধু-সমাগম' অনুষ্ঠানটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবিবর নবীনচন্দ্র ও নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

Edwin Arnold (১৮৩২—১৯০৪) ভারতীয় বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর 'Light of Asia' বইটী (১৮৭৯ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। বইটী এদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ঐটীকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র 'বুদ্ধদেব-চরিত' নাটক রচনা করেন ও ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ † তার প্রথম অভিনয় হয়। ঐ অভিনয়ে Edwin Arnold স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ‡। এবং পরে যখন নাটকটী পুস্তকাকারে

* 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১৮৩৮ খৃঃ দেখুন।
** 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১৮০২ শক, ১লা বৈশাখ।
† 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ'—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত।
‡ 'India Revisited' (1886)—Sir Edwin Arnold, M. A., C.S.I.

প্রকাশিত হয় তখন গ্রন্থকার আরণল্ড সাহেবকেই বইটী উৎসর্গ করেন।

অভিনয়টি ব্রহ্মানন্দের 'শাক্যসমাগমের' ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধার্থের প্রেরণা লাভ, পত্নী ও পুত্রের মায়া কাটিয়ে মনকে আত্মবশে আনা, পত্নীর পতিপ্রাণতা; প্রব্রজ্যা ও প্রথমে দেশাচরিত কঠোর সাধনা, তারপর মধ্যপথ ধরে নির্ব্বাণ লাভ। পুত্রশোকে কাতর মাতাকে উপদেশ দান, ছাগবলি-দানের প্রতিবাদে আত্মদান, দস্যুকে সদ্জ্ঞান দানে জয় করা প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করে। তখন ব্রহ্মানন্দ ইহলোকে নেই; কিন্তু তাঁর প্রভাব দেশ ও বিদেশে প্রবল ভাবে কাজ করছে। ঐ অভিনয়ে বহু স্ত্রী ও পুরুষে ঘর পূর্ণ হল, রঙ্গালয় পবিত্র হল ও সেই পবিত্রতার বাতাসে ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের নূতন বৈরাগ্য ও পরসেবার প্রবর্ত্তনার সহায়তা করলো। ঐ অভিনয় দেখেই বাগবাজারের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সেই বছর থেকে তাঁর বাড়ীর পূজায় বলিদান বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই যে 'বুদ্ধদেব চরিত নাটক' রচিত হয়েছিল তারপর আজ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে আর কোন নাটক রচিত হয়নি। অবদান গ্রন্থ অবলম্বনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' প্রভৃতি এবং নববিধান-মণ্ডলীর বালক বালিকাদের নীতিবিদ্যালয়ে বিনয়ভূষণ সরকার মহাশয়ের রচিত 'সিদ্ধার্থ' প্রভৃতি নাটক দেখা যায়।

গিরিশচন্দ্রের হাতে বাংলা-নাট্যে ছন্দের আরম্ভ ; এবং বিষয় অনুরূপ ঐ ছন্দকে তিনি কি অপূর্ব্ব রূপ দান করেছেন তা দেখা যায় এই নাটকটীতে।

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের কয়েকটি অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—

ভিক্ষু দর্শনে

সিদ্ধার্থ। কোথা ব্রহ্ম ? —কোথা তাঁর স্থান ?
শুনি, ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা
দুঃখের আগার ধরা ?

মৃত্যু কেন এজীবনের পরিণাম ?
জীবকুল কিবা অপরাধী—
নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে!
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ শোকে করে আর্ত্তনাদ—
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?
কিম্বা ব্রহ্ম
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার ;
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সকলি অসার
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে !
সর্ব্বশক্তিমান যদি ভগবান—
দয়াবান কভু সেত নয় !
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে ;
লইব বিদায়—ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,—
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি ;
আর গৃহে রহিতে না পারি ;
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব !
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার ;
অলসে না হরিব জীবন ;
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য করেছি উদ্যম।

বিদায় কালে ঃ

বুদ্ধ (স্বগত)

এই গৃহে প্রেয়সী আমার—
অঙ্ক'পরে কুমারে লইয়ে!
যাই—দেখে যাই—
কি জানি এ জন্মে যদি দেখা নাহি হয়।
দেখি নাই—দেখে যাই তনয়ের মুখ।
কাঁপে বুক বাতে পত্র যেন!
আহা! প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে।
ধিক্। ধিক্। আরে মূঢ়মন—
বুঝেও বোঝনা প্রলোভন?
বন্ধনের উপর বন্ধন
কি হেতু করিতে চাও?
যাও—চলে যাও—
উচ্চ কার্য্য সম্মুখে তোমার!
মমতায় মহাব্রত ভুল'না—ভুল'না!
জাননা—জাননা—
অতি শঠ প্রলোভন!
জগৎ-প্রেম
করিয়ে আশ্রয়—
দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
কেবা কার ধরা মাঝে—মৃত্যু যথা ফেরে?
দেখ—দেখ মানস-নয়নে,
জীবকুল ব্যাকুল সন্তাপে।
পরকার্য্যে করে যেই আত্ম-সমর্পণ,
সেইক্ষণে হয় মৃত্যুঞ্জয়।
কেন দুর্ব্বলতা—কেন এ মমতা
মহাব্রত কেন কর হেলা?

সন্ন্যাসিনী বেশে গোপার বেগে প্রবেশ

রাজা- দেখ রাণি! প্রাণ ফেটে যায়
স্বর্ণলতা বধূমাতা সন্ন্যাসিনী বেশে!

গোপা- দাও—দাও—ছন্দক, আমায়
পতির বসনভূষা—মম অধিকার!
স্থাপি' সিংহাসনে
নিত্য আমি পূজিব বিরলে।
গৌতমী- ও মা! ও মা!
কেন গো এ কাঙ্গালিনী বেশে?
হেরে তোরে প্রাণ ধরে কেমনে রহিব?
ভাবি মনে
তব চাঁদ মুখ দরশনে
ভুলিব এ নিদারুণ জ্বালা।
গোপা- মাগো!
দীনবেশে দেশে দেশে ভ্রমে পতি মোর—
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার;
তাই আমি সন্ন্যাসিনী।
আমি সহধর্ম্মিণী তাঁহার
অন্য ধর্ম্ম কেন আচরিব?
ওমা! যার আদরে আমি আদরিণী
রাজরাণী যার পদ সেবি'
যার তরে ফুল-অলঙ্কারে
বাঁধিতাম কবরী যতনে—
বসনভূষণ যার তরে প্রয়োজন—
সে নেই আমার!
প্রমোদ-আগার, হের মা আঁধার;
হেরি শূন্যাকার দশদিশি!
নিবিড় তামসী নিশি
আর না পোহাবে,
প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে নিশাকালে!
দেখ মা! দেখ মা!
অঙ্গে মম বিভূতি সেজেছে ভাল।
মাগো! আমি সন্ন্যাসীর নারী;
কপালে সিন্দুর

দেখ, মাতা, করি নাই দূর।
এই মম উজ্জ্বল ভূষণ!
নাথের স্মরণ
জীবনে আশ্রয় মম।

রাজা। (উন্মত্ত ভাবে)
ওই দেখ, বাজায় দুন্দুভি
শত রবি বদনের আভা!
দেখ—দেখ—উজ্জ্বল পতাকা
ভাতিছে গগনে!
নৃত্য করে কত কোটি নর!
দেখ—দেখ কুমার আমার
শ্রেষ্ঠ সবাকার;
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম।
ওই—ওই! —চল, দেখি—দেখি।

(বেগে প্রস্থান)
পশ্চাতে সকলের প্রস্থান

মৃত্যুশোকের ঔষধ

সিদ্ধার্থ- মৃত্যুহস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায়
অতএব ধৈর্য্যমাত্র মহৌষধি শোকে।

উ- পিতঃ তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
আসি নাই পুত্র আশে
আসিয়াছি তব দরশনে।
কিন্তু নয়ন আনন্দ ছিল
নন্দন আমার।

বিম্বিসার রাজার পূজাগৃহে

সিদ্ধার্থ- করি পুত্রের কামনা,
কর জগৎ মাতা উপাসনা;
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
জগৎ মাতা—
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি!

দেখ—নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি, নৃপ, কৃপা নাই কর--
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দ্দয় যে জন—
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি!
কেন প্রাণী নাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন—
দুর্ব্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়;
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ!"
মহারাজ!
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে।
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়?
মহাশয়! জানহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে
কাতর প্রাণের তরে—মানব যেমতি!
মানবের প্রায়
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,
বেদনা জানাতে নারে!
বধি' তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন
না হয় কখন—

বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হ'ন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান;
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ—
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ! কল্যাণ হইবে
পুত্র কোলে পাবে—
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়;
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি—
বসুমতী কলুষিত ক'রনা, ভূপাল!
স্বার্থ হেতু
ক'রনা হে কোটি প্রাণী বধ!
কোথায় ঘাতক! রাজ-কার্য্যে বধ মোরে।

বিম্বিসার। মতিমান্
আমি অতীব অজ্ঞান—
নিজগুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্‌গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে!
নাহি আর পুত্রের কামনা—

নাহি রাজ্যধন-আশ ;
ত্যজি' বাস, যাব সাথে সাথে
সেবিতে চরণ দুটী।
কে তুমি হে, দেহ পরিচয়।
জ্ঞান হয়—কভু তুমি নহ সাধারণ ;
বঞ্চনা ক'রনা, দেব, দেহ পরিচয়।

ডাকাতগণের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থ। বৎস। আপনি এসেছি—
কোন্ কার্য্যে বাঁধিবে আমারে ?
যদি তব হয় প্রয়োজন,
করহ বন্ধন—তাহে নাহি মম মানা ;
কিন্তু পূর্ণ কর মনের কামনা—
লহ, বৎস এনেছি যে ধন।

* * *

বন্য পশু প্রায়—
কি হেতু কাননে কর বাস ?
পলে পলে পরমায়ু কাল করে গ্রাস।
কিনিতে নৈরাশ,
কি হেতু আয়াস এত ?

* * *

এস নব রাজ্যে,
চিরশান্তি করিছে বিরাজ—
রোগ-শোক-মৃত্যুভয় নাই—
আনন্দ সদাই—
নাহি প্রলোভন—
হিংসাকীট করেনা দংশন—
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে—
পরম পুলকে, নির্ব্বাণ-আলোকে,
অমৃত জীবন হয় লাভ!

মুক্তপ্রাণ—ভয় কোথা তার?
নাহি পাশ, নাহি ত্রাস, আনন্দ-আগার
নিত্যসুখ-ধাম পূর্ণ সর্ব্ব কাম—
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস—

*   *   *

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হৃদে দেহ স্থান—
কেহ নাহি হিংসিবে তোমায় আর;
ত্যজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়—
ভব-ভয় নাহি রবে!

ডাকাত। প্রভু! প্রভু! আমি তোমার দাস—তোমার কৃপায় আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম।

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে

নিয়ত এ শক্তি বহে—হ্রাসবৃদ্ধিহীন।
এস, সত্য, হৃদয়ে আমার—
কর মোরে অধিকার।
যাও, যাও, নশ্বর নয়ন;
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।

*   *   *

(যোগবলে শূন্যে উত্থান)

অবিদ্যা-জনিত ছল যেই জন জানে—
টুটে তার জীবন-মমতা;—

*   *   *

নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,—
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,—
কর্ম্ম-ধ্বংশে পবিত্রতা করে অধিকার
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,—
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়,—
দেবের দুর্ল্লভ—অতুল বৈভব—

জরা-মৃত্যু-হীন
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ!
জেনেছি—জেনেছি—
পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্ব বংশোদ্ভব আমি—
নাহি মম নাম—নাহি জন্মভূমি—
গোত্র—জাতি—বর্ণ বা জীবন!
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক—
তিমির নাহিক আর!

(সিদ্ধচারণগণ এবং দেবদেবীগণের প্রবেশ ও গীত)

গিরিশচন্দ্র শেষদিন পর্য্যন্ত নাট্যজগতে নেতৃত্ব করে, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ খৃঃ ইহধাম থেকে বিদায় নেন।

১১। 'অমিতাভ' (কাব্য) ১৮৯৫ খৃঃ

—কবি নবীনচন্দ্র সেন

কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বাংলা সাহিত্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা করে লেখেন—"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান্ এই মহাবাক্য প্রচারকল্পে যে বাঙ্গালী কবি মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কবি নবীনচন্দ্র কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মানন্দের 'সাধু-সমাগম' অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা মুছে ফেলে জগতের সকল সাধু মহাজনকে কত আপনার ও নিকটতর করে দেয়, তার প্রমাণ—কবিবর নবীনচন্দ্রের, 'রৈবতক' (১২৯৩); 'কুরুক্ষেত্র' (১৩০০); 'প্রভাস' (১৮৯৬ খৃঃ); 'খৃষ্ট' (১২৯৭); 'অমিতাভ' (১৩০২); 'অমৃতাভ' (১৩১৬)।

'খৃষ্ট' কাব্যের সূচনায় তিনি লেখেন—

"কৃষ্ণ এবং খৃষ্ট উভয়ের মতে যখন যেখানে ধর্ম্মের অধঃপতন এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে (গীতা ৪।৭-৮ ও মেথু ২৪ অঃ ৭-২৭), তখন সেখানে ঈশ্বরের অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মগুরু সকল—কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ভারতে,

মুক্তপ্রাণ—ভয় কোথা তার ?
নাহি পাশ, নাহি ত্রাস, আনন্দ-আগার
নিত্যসুখ-ধাম পূর্ণ সর্ব্ব কাম—
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস—

* * *

"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হৃদে দেহ স্থান—
কেহ নাহি হিংসিবে তোমায় আর ;
ত্যজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়—
ভব-ভয় নাহি রবে !

ডাকাত। প্রভু ! প্রভু ! আমি তোমার দাস—তোমার কৃপায় আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম।

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে

নিয়ত এ শক্তি বহে—হ্রাসবৃদ্ধিহীন।
এস, সত্য, হৃদয়ে আমার—
কর মোরে অধিকার।
যাও, যাও, নশ্বর নয়ন ;
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর।

* * *

(যোগবলে শূন্যে উত্থান)

অবিদ্যা-জনিত ছল যেই জন জানে—
টুটে তার জীবন-মমতা ; —

* * *

নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,—
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,—
কর্ম্ম-ধ্বংশে পবিত্রতা করে অধিকার
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,—
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়,—
দেবের দুর্ল্লভ—অতুল বৈভব—

জরা-মৃত্যু-হীন
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ!
জেনেছি—জেনেছি—
পূর্ব্বতন বোধিসত্ব বংশোদ্ভব আমি—
নাহি মম নাম—নাহি জন্মভূমি—
গোত্র—জাতি—বর্ণ বা জীবন!
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক—
তিমির নাহিক আর!

(সিদ্ধচারণগণ এবং দেবদেবীগণের প্রবেশ ও গীত)

গিরিশচন্দ্র শেষদিন পর্য্যন্ত নাট্যজগতে নেতৃত্ব করে, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২ খৃঃ ইহধাম থেকে বিদায় নেন।

১১। 'অমিতাভ' (কাব্য) ১৮৯৫ খৃঃ

—কবি নবীনচন্দ্র সেন

কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বাংলা সাহিত্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাব বর্ণনা করে লেখেন—"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান্ এই মহাবাক্য প্রচারকল্পে যে বাঙ্গালী কবি মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই কবি নবীনচন্দ্র কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মানন্দের 'সাধু-সমাগম' অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা মুছে ফেলে জগতের সকল সাধু মহাজনকে কত আপনার ও নিকটতর করে দেয়, তার প্রমাণ—কবিবর নবীনচন্দ্রের, 'রৈবতক' (১২৯৩); 'কুরুক্ষেত্র' (১৩০০); 'প্রভাস' (১৮৯৬ খৃঃ); 'খৃষ্ট' (১২৯৭); 'অমিতাভ' (১৩০২); 'অমৃতাভ' (১৩১৬)।

'খৃষ্ট' কাব্যের সূচনায় তিনি লেখেন—

"কৃষ্ণ এবং খৃষ্ট উভয়ের মতে যখন যেখানে ধর্ম্মের অধঃপতন এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে (গীতা ৪।৭-৮ ও মেথু ২৪ অঃ ৭-২৭), তখন সেখানে ঈশ্বরের অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই বর্ত্তমান জগতের ধর্ম্মগুরু সকল—কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ভারতে,

খৃষ্ট ইহুদি দেশে, মহম্মদ আরবে এবং চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা যে কেন এই মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবেন না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অল্প, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের এই এক ভ্রান্তিতেই জগৎ আজি পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এই এক ভ্রান্তি নিবন্ধনই পৃথিবী কতবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে এবং ধর্ম্ম কি ঘোরতর অধর্ম্মে পরিণত হইতেছে। হায়! ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কি, মানুষ কি তাহা কখনই বুঝিবে না? * * অতএব তাঁহাদের ধর্ম্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত নাম মানবধর্ম্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্বই ইহার লক্ষ্য। মনস্বী মানব মাত্রেই ইহার শিক্ষক, সর্ব্ব অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই মনুষ্যত্ব পথে অগ্রসর হইবার জন্য অবস্থানুযায়ী সোপানশ্রেণী নিয়োজিত রহিয়াছে। কৃষ্ণোক্ত অবতারতত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য—সকলেই আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাছে অবতার-স্বরূপ পূজনীয়।"

ঐ সূচনায় দেখা যায় যে, মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা কাব্যে রচনা করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তা সম্ভব হয়নি।

'অমিতাভ' কাব্যের সমাপ্তিতেও কবিবর লিখেছেন—

"যাও দেব! লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর।
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু 'জর্দ্দানের' তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।

আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম-অশ্রু-জলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময়! এই আশা করিও পূরণ।

কবিবর ১৮৪৭ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী ইহধাম ত্যাগ করেন। বাল্যে স্থানীয় পাঠশালায়, পরে চট্টগ্রাম স্কুলে পড়েন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্, এ, ও জেনারেল এসেম্ব্লীজ্ ইন্ষ্টিটিউসন থেকে বি, এ, পাশ করেন। বি, এ, পাশ করে তিনি কিছুদিন হেয়ার স্কুলে সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন। তারপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষায় মনোনীত হন ও দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর কাল ঐ সরকারী কাজে নিযুক্ত থেকে উন্নতি করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা করে যশস্বী হন।

নবীনচন্দ্র ছিলেন জন্মকবি। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্যেরাও ছিলেন সুকবি। নবীনচন্দ্র বাল্যকালে ও ছাত্রাবস্থায় যে সকল কবিতা রচনা করেছিলেন, তা' তাঁর অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ করতেন। তাঁর 'অবকাশ রঙ্গিনী', 'পলাশির যুদ্ধ' 'রঙ্গমতী' 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' ও পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলি, দেশ ভ্রমণ বিষয়ক 'প্রবাসের পত্র' ও 'আমার জীবন' সকলেরই পরিচিত। ১৮৭৫ খৃঃ প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডোয়ার্ড যখন এদেশে আসেন, তখন বিলাতের Crown Perfumary তাঁর সম্বর্দ্ধনা-সূচক কাব্য রচনা করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। নবীনচন্দ্র 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতাটী লিখে তাঁদের পঞ্চাশ

গিনির প্রথম পুরস্কার পান। 'অমিতাভ' কাব্যের অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল—

প্রব্রজ্যা

সিদ্ধার্থ একক,—ঊর্দ্ধে নীরব আকাশ
বসন্তের নিরুপম সুনীল বিস্তৃত;
নিম্নে হিমালয়সুতা নির্ম্মল-সলিলা
'অনামা' সুনীলা ধারা নীরবে বাহিতা।
নীরব আম্রকাননে অনামার কূলে
সিদ্ধার্থ একক,—দাসদাসী অনুচর
ছিল শত সংখ্যাতীত বেষ্টিয়া যাহারে,—
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া শশী; ছিল অট্টালিকা
সুখ-সম্ভোগে পূরিত,—আজি সে একক!

*　　　*　　　*

পুরবদক্ষিণ-মুখে নবীন সন্ন্যাসী
চলিলেন, নাহি জ্ঞান কোথায়, কেমনে।
পদে পদে পদতল রক্ত-শতদল
হইতেছে ক্ষত তৃণে, মৃত্তিকায় দৃঢ়,
নাহি জ্ঞান; বহিতেছে স্বেদ দরদর।

সাধনা

একদিন চিন্তাকুল ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে
　নীল নৈরঞ্জনা-তীরে শারদ ঊষায়
আসিলেন রম্য-বনে; নিবিড় পাদপশ্রেণী
　আচ্ছাদিয়া বনভূমি ধ্যানমগ্নপ্রায়।

*　　　*　　　*

এই শান্তিময় বনে, শান্তিময়ী নদীতীরে,
　শান্তি-ছায়া-তরুতলে পাতি তৃণাসন,
হইলেন ধ্যানমগ্ন ছয় বৎসরের তরে,
　কঠোর তপস্যা ব্রত করিতে সাধন।

এ সময় এক দিন দেখিলেন শাক্যসিংহ
দিব্যরূপা নারী এক, বর্ষি অশ্রুজল
কহিছে—"হা পুত্র! তব ফলিল না আশা-লতা,
অসিত ঋষির বাক্য হইল নিষ্ফল।
না তুমি হইলে বুদ্ধ, না করিলে রাজ্যভোগ,
করিলে জীবন ক্ষয় অকরুণ মনে;
শোকে বিদরিছে বুক, বনের কুসুম মত
বনে জন্মি পুত্র! তুমি শুকাইলে বনে!"
জিজ্ঞাসিলা শাক্যসিংহ—"রমণী? কে তুমি কহ
কাতরা বিবশা শোকে, সিক্ত দুনয়ন,
কবরী আলুলায়িত, দেহ ধূলা-বিলুণ্ঠিত,
পুত্র পুত্র বলি মাতঃ! করিছ রোদন?"
কাতরা রমণী কহে—"তোমার জননী আমি,
আমি মায়া দেবী, আমি ত্রিদিব ছাড়িয়া
আসিনু আকুলা শোকে, তোমার নিষ্ফল ব্রত,
তোমার জীবন শূন্য মূরতি দেখিয়া।"
আশ্বাসি মায়েরে যোগী—কহিলা দয়ার্দ্র স্বরে—
"ভয় নাহি, তব গর্ভে জনম আমার
হবে না নিষ্ফল, নাহি হইবে নিষ্ফল বাক্য
অসিত ঋষির,—শোক কর পরিহার!
হব আমি বুদ্ধ মাতঃ! হয় যদি ধরাতল
বিদীর্ণ শতধা, হয় সুমেরু প্লাবিত,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা হয় যদি ভূপতিত,
মরিব না, নাহি ব্রত করি উদ্‌যাপিত।"
জননী গেলেন চলি স্বপনের ছায়া মত;
হইলেন শাক্যসিংহ যোগে দৃঢ়তর।

সিদ্ধি

ধীরে ধীরে মহানিশি হইল প্রভাত।
অরুণ-উদয় সহ উঠিল ভাসিয়া
অরুণের মত এই নির্ব্বাণের জ্ঞান

যোগীর হৃদয়াকাশে। এতকাল পরে,
ছয় দীর্ঘ বৎসরের তপস্যার পরে,
পূর্ণ আজি মনোরথ।

প্রচার

সপ্ত দিবা সপ্ত নিশি বোধিতরুমূলে
রহিলেন বুদ্ধদেব পূর্ণ নিমজ্জিত
নির্ব্বাণের মহানন্দে অনন্ত অসীম,—
অনন্ত আলোক-গর্ভে শান্ত সুশীতল।

দিন যায়, রাত্রি যায়। বসিয়া একাকী
তারায়ণ তরু-তলে ভাবিলেন মনে—
এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি আমার?

দেখিলেন বুদ্ধদেব, বহিতেছে বেগে
করাল কালের স্রোতঃ অনন্ত অসীম।
অনন্ত অসংখ্য জীব ডুবিয়া ভাসিয়া,
ভাসিয়া ডুবিয়া পুনঃ, শত শত বার,
সহিয়া অশেষ দুঃখ জরা-ব্যাধি করে,
জ্বলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-কামনা-অনলে,
করিতেছে হাহাকার।
চাহিয়া চাহিয়া
কৃতাঞ্জলি তাঁর পানে করুণ-নয়নে
মাগিছে করুণা ভিক্ষা; কহিছে কাঁদিয়া,

ভগবন্! দয়াময়! কর দয়া জীবে!
মায়াসুত! কর দয়া মায়াসুতগণে!
দুঃখের নির্ব্বাণ-বুদ্ধি লভিয়া জগতে
তুমি বুদ্ধদেব; জীব করিতে উদ্ধার
আসিয়াছ যথাকালে, তুমি তথাগত;
জীবের উদ্ধার-পথে গতি তব শুভ,
সুগত তোমার নাম। কর দয়া জীবে!
তোমার নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম করিয়া প্রচার,

করিয়া উদ্ধার জীব, কর সিদ্ধ তুমি
জীবের সর্ব্বার্থ, দেব! হউক সফল
তোমার সিদ্ধার্থ নাম। যাউক ভাসিয়া
কালগর্ভে তব নাম, করি বিতরণ
নির্ব্বাণ-অমৃত জীবে যুগ যুগান্তর।

এই হাহাকার, এই ভিক্ষা করুণার
দ্রবিল হৃদয়; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন
করিল শিথিল; বুদ্ধ করিলেন স্থির
করিবেন নবধর্ম্ম জগতে প্রচার।

হয় নাই ইহলোকে যে ধর্ম্ম প্রচার,
করিব সেখানে সেই প্রবর্ত্তিত,
দুঃখের নির্ব্বাণ-দ্বার করি উদ্ঘাটিত।

১২। 'Intellectual Ideal' (Being three lectures on the Vedanta delivered in 1900 and published in 1902);

'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯০১ খৃঃ বিবৃত);

'নবব্রহ্মবিদ্যা' (১৯১০ খৃঃ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত ও ১৯১৪ খৃঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত)

—অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ

এ পর্য্যন্ত যাঁদের পরিচয় দিয়েছি, তাঁরা ব্রহ্মানন্দের সমসাময়িক, সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাধন-ধারার সাক্ষাৎ প্রভাব পেয়েছিলেন। এবার পরবর্ত্তী কয়েক জনের কথা উল্লেখ করবো, যাঁরা ব্রহ্মানন্দকে দেখেছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁর সঙ্গ লাভ করেন নি। তবে এঁদের জীবন আরেক বিষয়ে ধন্য। ব্রহ্মানন্দের সদ্য তৈয়ারী নূতন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার এবং নবঅধ্যয়নের ভিতর এঁদের জন্ম এবং তার ভিতরেই তাঁরা বর্দ্ধিত। এক হিসাবে সেই সময়কে পরম স্বাস্থ্যকর সময় বলা যায়। নীতিতে, জ্ঞানে, উৎকর্ষে ও

আধ্যাত্মিক জীবনে তখন একটা সাড়া পড়েছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—

"It is undeniable that everything great, whether for good or evil, begins with the earnestness of a group of students. One mature mind and many disciples, or many young minds struggling together; these are the groups through which power is developed. For proof of this we might look at the movements which have grown up in Calcutta itself, as the result of ferment amongst the students in the time of Keshub Chunder Sen—

(i) The whole of the *Nababidhan* with its indisputable powers of moral education,

(ii) The whole of the *Sadharan Brahmo Somaj*, with its fearless and unselfish advocacy of every progressive movement,

(iii) The whole of the work of the *Order of Ramkrishna* to name only three definite associations as our inheritance from the students of that time."

ব্রহ্মানন্দের সমসাময়িক মানুষদের জীবনে শাস্ত্রের এবং জাতীয় tradition ও convention এর সঙ্গে সঙ্গে, নিজেদের ব্যক্তিগত সাধনের ও নূতন আলোকের প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ক্রমে তার ভিতর পরিবর্ত্তন আনে। আরো পরে, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনের অপূর্ব্ব প্রসারতা সৃষ্টি করে। তখন Comparative Religion ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তিতে সবে গড়ে উঠ্‌ছে। বিনয়েন্দ্রনাথ এই সময়ের মানুষ। বেদান্ত, খৃষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে-উজ্জ্বল পাণ্ডিত্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরবোধ তাঁর সকল চিন্তায় প্রকাশিত। তাই আমরা তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনায় বেদান্তের, খৃষ্টধর্ম্মের ও আধুনিকতার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখতে পাই।

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ একদিন প্রসঙ্গক্রমে লেখককে বলেছিলেন যে, "বিনয়েন্দ্রবাবু ছিলেন অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ,

* 'Civic and National Ideals'—Sister Nivedita

হীরেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গুরু। তিনি নিজেকে এমন লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, সে কথা কেউ জানেই না। ১৯০৫ খৃঃ যে সময়ে বাংলাদেশে স্বদেশিকতার নামে সাম্প্রদায়িকতার ও পুরাতনের দিকে ফিরে চলার রব উঠেছিল, তখন তিনি অতীত ও বর্ত্তমানের সমন্বয়ের কথা এমন শক্তির সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন, যে তা' পেয়ে দেশ বেঁচে গেল। ঐ সব মনীষীরাও তার ভিতর দিয়ে নূতন নূতন তত্ত্বে উপস্থিত হয়ে তা প্রকাশ করে জগদ্বরেণ্য হলেন।"

বিনয়েন্দ্রনাথের 'Intellectual Ideal' বইটী পেয়ে রবীন্দ্রনাথ একটী চিঠি লিখেছিলেন। তার এক অংশে দেখতে পাই--

"শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কঠোর তপস্যা চাই, তাহাও আপনার আছে এবং সেই শাস্ত্রকে নিজের করিয়া লইবার যে সহজ প্রতিভা, তাহারও অভাব আপনাতে নাই, এবং যাহা লাভ করিলেন, তাহাকে আলোকের ন্যায় বিকীর্ণ করিবার শক্তিও আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আপনার সঙ্গ আমার কাছে বড় লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ...অত্যন্ত লুব্ধ ক্ষুধিতের মত আমি আপনাদিগকে (বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র ও প্রমথলাল সেন) চাহিতেছি।" *

মনস্বী গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রায়ই বলতেন যে, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ যদি রাজনীতিতে যোগ দিতেন, তবে রাজনীতি ও দেশ, দুই-ই উপকৃত হত।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ছাত্রাবস্থায় তাঁর অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথকে বিলাতে একটী চিঠি † লেখেন—

D, Eden Hindu Hostel,
November 30, 1905.

Dear Sir,

This is the first time that I make bold to approach you with a few lines. I do not know how to give ex-

* বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৩৫৮।

† চিঠিটী তাঁর সহধর্ম্মিণী, 'আমার মামীমা' শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত। সেটী সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল।

pression to the overwhelming feeling of gratitude to you. Your kindness to me when you were here and even when you are away has made me tongueless, and I shall be content to say that words can not always adequately express feelings. I am very much ashamed that I did not write before this. But this has been due to no other cause except my diffidence and I hope you will not mind it and will not attribute it to ungratefulness on my part.

There is a great agitation going on around us and in this time of excitement, we feel the want of one whose wise guidance would have been of invaluable help to us. We can not at this time decide what we ought to do and what not. Your presence in our midst would not only have cheered us up in our struggle but over and above giving stimulus to our actions, guided them and controlled them. It is indeed true that we do not fully realise the importance of a personage so long as he is in our midst. The union has been going on fully well through the great interest that the Principal takes in it. But unfortunately owing to the great excitement and agitation here, we could not manage to arrange a steamer trip this time. We hope you will be soon coming back to give that life to all our movements which they lack so much and all that we as your students can say is that we never had, nor perhaps shall we have a professor, a guardian and above all a friend like you. We can not express our feelings of gratitude, we only hope that whereever you be, we shall always be allowed a corner of your heart.
With my best respects, I remains,

Yours ever obediently,
Rajendra

বিনয়েন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় Convocation Address-এ বলেন—

"Our grief is intensified in a manifold degree when we are reminded of the loss we have sustained by the premature death of Babu Binoyendra Nath Sen, who has been cut off in the prime of life by a fell disease, while still in the full vigour of manhood, in the plenitude of beneficient activity and with prospect of many years of useful work before him. The solidity of his learning, the soundness of his judgment, the nobility of his character, the unselfishness of his devotion to his lifelong mission made him the ideal teacher, the guide, friend and philosopher of his students who held him in the highest reverence and deepest affection. He commanded the genuine respect of all who came in contact with him in whatever sphere he worked, whether as an instructor of youth, as a Member of the Senate, as a Member of the Board of Studies, as a Member of the Board of Examiners, as an Inspector of Colleges or as the Secretary of that useful institution, the Calcutta University Institute, of which he was for many years the chief guiding spirit. He has passed away, his life-work unfinished, but his memory will be lovingly cherished by future generations of students and educationists."

বিনয়েন্দ্রনাথ ১৮৬৮ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯১৩ খৃঃ ১২ই এপ্রিল কলিকাতায়ই দেহত্যাগ করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এলবার্ট বিদ্যালয় থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তখন শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় তার রেক্‌টর ছিলেন। পরে জেনেরেল এসেম্‌ব্লীজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে এফ্‌. এ, বি এ, এম্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এম্‌ এ-তে একবার দর্শনে ও আরেকবার ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এখানেই তিনি বিলাতি

negative side, he brought his powerful dialectic into play to expose the fallacies of several false theories of life and the universe that had sprung up, and particularly those that had arisen through the misinterpretation of Revelation in several essential points by the *Sankhya* and the denial of *Revelation* by Buddhistic Philosophy . . . . .

But when he proceeded to expound his Doctrine of Liberation, it seems he could not shake off the glamour which certain of the ideas peculiar to the *Samkhya* and Buddhistic systems had cast upon his mind. . . .

Somehow or other his mind grew into the thought of an escape from *Samsara*, of life itself as identified with the source of all evil, conceived as the end of philosophy and of all cultures, as taught in the *Samkhya* and Buddhistic *systems*." (P. 67).

"But Liberation is not something to be produced or generated. If you say that in its present condition of the soul, it is in a state of bondage—be it the bondage of senses as 'Plato' thought, or the bondage of Passions as 'Spinoza' thought, or the bondage of spurions connection with Prakriti as the 'Samkhya' thought, or the bondage of sin, as the 'Bhakta' thinks and *Moksha* means the destruction of the fetters of this bondage—be it by the power of *Nous* or *Amor intellectualis Die* or *Viveka-Jnana* or *Nirvana* or *Grace* and the production and substitution of freedom in its place,—you are far away from the conception of *Moksha* that *Samkara* has." (P. 68-69).

"The whole purport of the Vedanta is to reveal Brahman in this state of absolute freedom.

Buddhism had tried to build up a theory of the universe without having any place for Brahman at all, the Samkhya had tried to establish the freedom of the Soul or Self by setting upon absolute separation between

it and *Prakriti;* the doctrine of immanence had sacrificed the freedom of *Brahman* by exhaustively mingling him up with Nature. The cardinal points in Sankara's interpretation of the *Vedanta* are:—(1) Brahman is (2) Brahman is through beginningless and endless time, the soul of Nature (3) *Brahman* is eternally free. His doctrine of Maya is the means which enables him specially to harmonize the second and the third points." (P. 71).

"The placid indifference of the Hermit who has denied home and society, and retired into the barest abstraction of life, is in these words—not the pathos, the depth, the fulness of the seer who has not shunned 'the burthen of the mystery',—'the heavy and the weary weight of all this unintelligible world', nor turned away from the 'still, sad music of humanity'—but realized therein the deepest meaning of life, and the incorruptible peace of the Eternal." (P. 85.)

"Just one thing more in this connection. I have no desire at this place to speculate upon what *Nirvana* might mean as taught by *Buddha* himself, or the idea of it popularly accepted in Buddhistic religion and culture; but Sankara's individual liberation is just the sort of *Nirvana* that would logically follow from the form of Buddhistic philosophy as understood by Sankara,—and which Sankara endeavours, with so much energy and skill, to refute." (P. 89.)

(খ) "বৌদ্ধধর্ম্ম" * —"সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর লোকের দুরকম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের মত, বর্ত্তমান সময়ে বুদ্ধের ভাব ও তাঁহার ধর্ম্মের ভাব দেশের উপরে, সমাজের উপরে ও ব্যক্তিগত জীবনের উপরে যতই বিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল। ইয়োরোপের জ্ঞানী মণ্ডলীর ভাবও অনেকটা এই প্রকার; অনেকের

* এই অপ্রকাশিত বক্তৃতার পাণ্ডুলিপিটি আমার বড় মামীমা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর নিকট পাই।

মত, বুদ্ধ যেমন সমাজের উপকার করিয়াছিলেন, সমাজের উপরে মঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ পারেন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের মত আবার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা বলেন এখন আর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। স্বভাবের নিয়মে আপনার কার্য্য শেষ হইলে, কাল পূর্ণ হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। এখন আর শত চেষ্টাতেও পুনর্ব্বার তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। কিন্তু এ বলিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারেনা। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু ইতিহাসের ঘটনা নয়; শুধু অতীতের নয়। ব্যক্তিগত জীবন এবং জাতীয় জীবনের উপরে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব কতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের বাহিরের অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবর্ষের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য।"

"ধর্ম্ম দুই ভাবের আছে। বিশ্বজনীন ধর্ম্ম এবং জাতীয় ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্ম্ম এই জাতীয়-ধর্ম্ম। ইহার ভিতরে খুব গভীরতা আছে, অনেক উচ্চ ভাব আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা জাতীয় ধর্ম্ম বই আর কিছু হইতে পারে না; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। ইহা মানবপ্রকৃতির গভীরতম ভাবকে অবলম্বন করিয়া জীবন, প্রহেলিকার মীমাংসা করিবার জন্য যত্ন করে। ইহা সমুদায় জগৎকে আপনার মধ্যে আলিঙ্গন করিয়াছে। মানবের আত্মার ভিতরে যে গভীর শান্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা তাহাকেই চরিতার্থ করিতে চায়। মানব-প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপরেই এই ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। তাই ইহা এত গভীর, বিশ্বজনীন এবং এই বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়াই হিন্দু জাতির সহিত অন্যান্য জাতির সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল।"

"এই বিশ্বজনীনতা হইতেই অহিংসা, মৈত্রী, প্রেম, কোমলতা, স্নেহপূর্ণ নূতন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল।" "জগতের যেখানে যত কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, গভীর

বেদনা আছে, যন্ত্রণা আছে, সে সমুদায়কে তিনি আপনার বুকের ভিতর স্থান দিবেন, এই তাঁহার ভাব। শুধু অপরের কষ্ট দেখিতে না পারা, দুঃখ ক্লেশের দৃশ্যে অসহ্য হওয়া, শুধু এ ভাবটী বিশেষ মঙ্গলকর নয়। এই ভাব থেকে ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ দার্শনিক সোপেনহাওয়ার দুঃখবাদী হয়েছিলেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ বুদ্ধদেবকেও Pessimist বলেন। ইহাতে মনে হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ সকল বিষয়ে বড় স্থূলদর্শী। বুদ্ধদেব যেখানে কষ্ট, যেখানে দুঃখ সেখান থেকে চলে যাননা। তিনি সকল দুঃখ যন্ত্রণাকে আপনার ভিতর লইতে চান।"

"বৌদ্ধধর্ম্মে অপর বিশেষ ভাব সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসের ভাব আমরা অনেকেই ঠিক জানিনা, বুঝিতে পারিনা। বিশেষ নারীজাতি এই সন্ন্যাসের ভাবকে একটু ভয়ের চক্ষে দেখেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দুই রকমের। এক রকম শঙ্করাচার্য্যের মত, যাঁরা বলেন, এ সংসার শূন্য, মায়া, কিছুই থাকিবে না, কিছুই নাই, সকলই ভ্রান্তি। আর এক রকমের সন্ন্যাসী যেমন বুদ্ধদেব, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহারাও সন্ন্যাসী, কিন্তু এঁদের ভিতরে যে গভীর কোমল প্রেম, তাহার ধারণা করিবে কে? আপনার কাহাকেও না রাখিয়া যাহা সকলকে আপনার করে, ভালবাসিবার কিছু না রাখিয়া যাহা সকলকে ভালবাসে, সেই প্রেম, যাহা জগতের যা কিছু ভগবানকে দিয়া, জগৎকে ভালবাসে।"

(গ) 'আরতি' বইটীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয় যা পাওয়া যায়, তার কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

বুদ্ধের বার্ত্তা—"তারপর বুদ্ধদেব। বোধিদ্রুমের তলে মার এসে তাঁকে বল্লে—তুমি এখন সিদ্ধিলাভ করেছো, এখন বিশ্রাম কর। সিদ্ধার্থ বল্লেন—নারে দুরাত্মন্ মার্, আমি যে তত্ত্ব পেয়েছি, তা আমি সকলকে দেব, ব্যাথিত মানবকে পরিত্রাণের পথ দেখাবো। দুঃখময় জীবনে পরিত্রাণ পেয়ে কিরূপে শান্তিলাভ করা যায়, সে মন্ত্র সকলকে শোনাব। তাই তিনি প্রচারের ব্রত নিলেন। কিন্তু কি

প্রচার করিলেন? দুঃখের জীবন হতে মোক্ষলাভ। স্বর্গরাজ্য-লাভের জন্য তাঁর প্রচার নয়। হৃদয়ে হৃদয়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে মিলে কেমন করে স্বর্গ গঠিত হয়, সে কথা প্রচার তিনি করেন নি। প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবন কিরূপে বাসনা ছেড়ে, জরা মরণের হাত এড়িয়ে, নির্ব্বাণ লাভ করতে পারে, তাই প্রচার করতে তিনি সচেষ্ট হলেন।" (পৃঃ ২৪) "যেন হঠাৎ একস্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইল। ইহা হইতে আর একটী নদী বহির্গত হইয়া ছুটিল—শেষে আবার এই শাখানদীর জল মূল হিন্দু নদীতে আসিয়া পুনর্মিলিত হইল। ইহার ফলে মূল নদী অধিকতর বিশালতা ও গভীরতা লাভ করিল। তাহার পর ইহা পুনর্ব্বার শাখারূপে বহির্গত হইয়া ভিন্ন দিকে ছুটিয়া চলিল। সিংহল, জাপান, চীনে গিয়া ইহার তরঙ্গের আঘাত লাগিল। সেই সকল স্থানেও আবার ইহার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির স্তর লক্ষিত হইল। (পৃঃ ৫২-৫৩)

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ ও মূলভাব—"চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশে এ ধর্ম্মের যে বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে, তাহার বিষয়ে আমার বিশেষ করিয়া জানা নাই। সুতরাং সে আলোচনা আমি এখন পরিহার করিলাম। আমাদিগের নিকট এ ধর্ম্ম অশোকের সময়ের ধর্ম্ম বা বুদ্ধদেবের নিজের ধর্ম্ম। আমরা সেইখানেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করি। বোধিদ্রুমের তলে বসিয়া যে দিন তিনি নবজ্ঞান লাভ করিলেন, সেদিন তাঁহার মুখে কি নির্ম্মল আনন্দের জ্যোতিঃ। তৃষ্ণাকে জয় করিয়া বিজয় গৌরবের সমুজ্জ্বল দীপ্তশিখা তাঁহার উন্নত ললাটে কি অপূর্ব্ব মহিমা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সে কি আনন্দ! তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিলেন—

"অনেক সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো, দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং
গহকারক! দিট্‌ঠো হসি, পুন গেহং নকাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকূটং বিসংখিতং
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা"

"বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ এই—সংস্কার হইতে তৃষ্ণার উদ্ভব, তৃষ্ণা হইতে দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু। সেই তৃষ্ণাকে জয় কর—মৈত্রীকে অবলম্বন কর। এই মৈত্রীর অর্থ:—জীবে দয়া, ধর্ম্মে ক্ষমা (Toleration), সকল কার্য্যে উদার সহানুভূতি। এই ভাব আসিয়া উত্তরকালে হিন্দুভাবের সহিত মিলিত হইল।" (পৃঃ ৫৭)

বুদ্ধতীর্থে গমন—"যে জীবনের মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত বাস করি, মনের যে পঙ্কিল নগরে আমাদের অধিষ্ঠান, তাহা হইতে বাহির হইয়া যদি একবার বুদ্ধতীর্থে গিয়ে বসি, তবে সেখানকার হাওয়ায় আমাদের নবজীবন লাভ হয়। আমরা বৌদ্ধ হইয়া যাইনা, কিন্তু আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করি, আমাদের প্রাণে নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া যায়। সেই তীর্থে বসিয়া মনে হয় সেই নির্ব্বাণের কথা। সেই অমরবাণী অন্তরাকাশ ধ্বনিত করিয়া উত্থিত হয়—'গৃহকার, তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি, আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তৃষ্ণা আমার ক্ষয় পাইয়াছে—দুঃখের ভিত্তি উৎপাটিত হইয়াছে।' কি ভাবে একথা বলা হইয়াছিল? বুদ্ধের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া দার্শনিকেরা মহাভ্রমে পতিত হন। Dr. Mcdonald প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ শুষ্কতর্কের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধকে 'অন্ধকারবাদী' pessimist বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, বুদ্ধদেব যে তৃষ্ণা, যে দুঃখের কথা বলিলেন, সে কাহার তৃষ্ণা, কাহার দুঃখ? সে কি তাঁহার নিজের জীবনের দুঃখ? কি দুঃখ তাঁহার ছিল? ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতির সন্তান, লক্ষ্মীরূপা সুশীলা পত্নী, সুকুমার হৃদয়ানন্দ পুত্র—কোথায় তাঁহার দুঃখ? অথবা তিনি কি দুর্দ্দম প্রবৃত্তির অগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া, বাসনা ও তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া, বিরাগভরে কঠোর সাধন গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমরাতো জানি, রাজার সন্তান হইয়াও তিনি প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছিলেন। বিলাসভবনে সহস্র লাস্যলীলা তাঁহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তবে কাহার দুঃখের কথা তিনি বলিলেন?

সে দুঃখ তাঁহার নিজের দুঃখ নহে। তাহা জগতের দুঃখ। জগতের নরনারীর দুঃখ। মহান সহানুভূতির ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বজগতের দুঃখভারকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বাল্যকালে আহত হংসের কথা ভাবুন, সেই বলিদানের মেষের কথা ভাবুন। কি উদার সহানুভূতি! কি সার্ব্বজনীন প্রেম!! আবার ভাবুন সেই গোমতীর কথা—প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে তিনি গোমতীর শিশুর প্রাণভিক্ষা করিয়া লইতেছেন—'আমার প্রাণ দিয়াও যদি ঐ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে পারি।' বুদ্ধদেব পরের দুঃখকেই নিজের দুঃখ করিয়া লইয়াছিলেন। তারপর তিনি ভাবিলেন, জগতের এ আগুন কি কিছুতেই নিবিবে না? কিসে দুঃখের অবসান হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের সাধন। এ দুঃখের মূল কোথায়? ইহার মূল—বাসনা, তৃষ্ণা। বুদ্ধদেব ভাবিলেন, আমি সুখ লাভ করিলাম কিসে? তৃষ্ণা-জয়েই সুখ। এই সুখ যদি সকলের হয়, তবেই জগতের শান্তি আসে। ইহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারের আগ্রহ। জগৎকে এ সুখসংবাদ শুনাইতেই হইবে। ত্রিতাপ-জর্জরিত নরনারীকে এই সুখের সেতু দেখাইয়া আনন্দলোকের দিকে টানিতে হইবে। তিনি জগৎকে শান্তির অধিকারী করিবেন। এইতো তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাতে দার্শনিক কচকচির আবশ্যকতা কি? নির্ব্বাণের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় মাথা ঘামাইবার সার্থকতা কি? বুদ্ধ জগতের দুঃখ লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন— এই তীর্থ। সেখানকার পুণ্য বাতাস, সেখানকার নির্ম্মল সূর্য্যালোক যদি গায়ে লাগে, তবে নূতন জীবন লাভ করিবে না? তাহা হইলে আমাদের জীর্ণ গৃহ নূতন হইয়া যাইবে না? আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রকার্য্য শোভায় পূর্ণ হইবে না?" (পৃঃ ৬২-৬৫)

নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা—"মনীষী Carlyle মানুষের জীবনকে ভগ্নাংশ (fraction) রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভগ্নাংশের 'হর' (denominator) আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, তৃষ্ণা। ভগ্নাংশের denominatorকে কমাইলে ঐ ভগ্নাংশের মূল্য বর্দ্ধিত হয়।

যখন denominator 'শূন্য' (zero) হয়, তখন উহা infinity র সমান হয়। মানবজীবনরূপ ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ইহার denominator অর্থাৎ বাসনা ও তৃষ্ণাকে সংক্ষেপ কর, মানবজীবনের মহত্ত্ব অনন্ত হইয়া উঠে। তখন তোমার কোন সম্পদ না থাকিলেও তুমি রাজচক্রবর্ত্তী, মহীপতি হইতেও মহীয়ান। কেবল এক আত্মার সম্পদ লইয়া তখন তুমি জগতের যাবতীয় সম্পদের উর্দ্ধে স্থাপিত। ইহাই ভারতের আদর্শ। বুদ্ধদেব এই আদর্শই এখানে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তৃষ্ণাকে জয় কর, তাহা হইলেই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ হইবে। মুনি, ঋষি ও তপস্বিগণ দীন আশ্রমে বাস করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতে সহস্র গুণে সুখী।" (পৃঃ ৮৭)

'বঙ্গদর্শন' ষষ্ঠবর্ষ, ১৯০৬ খৃঃ আষাঢ়, তৃতীয় সংখ্যায় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথের 'বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নবঅধ্যয়নের মূলসূত্রটী এই প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সেইজন্য তার কয়েকটী অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"আজ আমাদের দেশের চিন্তাশীল, ভাবুক, সুপণ্ডিত দেশনায়কেরা' এক গভীর আন্দোলনের ভিতর ডুবিয়াছেন। মানুষের শরীর, মন ও আত্মার একটা আমূল বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক সমস্ত উপকরণগুলিকে পৃথক করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে যেগুলি 'বিদেশী' মার্কা, সেগুলি কেন আসিল, কবে আসিল, তাহা স্থির করিয়া, সেই বিদেশী ঋণকে একেবারে সমস্ত সংস্পর্শ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবার যেন একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ...আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনে একটা স্থানে, আমার মনে হয়, বড় একটা শূন্য ও অন্ধকার থাকিয়া গেছে, সেদিকে বড় কেহ মনোযোগ করেন নাই। এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমস্ত ইতিহাসের মূলে একটা ভাব আছে—যাহা পশ্চিমেরও নয়, পূর্ব্বেরও নয়, যাহা বিদেশী নয়, স্বদেশীও নয়, কিন্তু যাহা এই যুগের,—সে ভাব—এই বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা। ...

এই স্বাধীন চিন্তা কোন দেশ বা ভূভাগ, বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়। ...

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত দুইটী বিপরীত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে,—একটী ভাঙ্গিবার পথ, আর একটী গড়িবার পথ। অথচ দুইটীকে লইয়া একই পথ,—একটীর ভিতর দিয়া না আসিলে আর একটীতে আসিবার উপায় ছিল না। যেমন ভারতবর্ষে, ঠিক তেমনিই পশ্চিম জগতে গুটি কয়েক জিনিষ মানুষের সমস্ত উন্নতির পথকে অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—তাহাদের নাম,—অভ্রান্তশাস্ত্র, দেশাচার ও পুরোহিতবর্গ। ·· মানবপ্রকৃতি ও সমাজ-শৃঙ্খলের ভাঙ্গিবার কাজ যখন আরম্ভ হয়, তখন স্বাধীন চিন্তার নাম ছিল—প্রতিবাদ, উপহাস, ব্যক্তিগত জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, শাস্ত্রশূন্য ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ। পাশ্চাত্য জগতেই ইহার আরম্ভ। ···এই অগ্নিময় বিপ্লবপূর্ণ, কঠোর অথচ মঙ্গলপূর্ণ পথ অতিবাহিত করিয়া স্বাধীন চিন্তা যখন গড়িবার পথে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নাম হইল—গবেষণা, স্বাধীন অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উচ্চতর শাস্ত্র বিবেক (Higher Criticism), অভ্রান্ত বুদ্ধিতে নয়, কিন্তু ভক্তি-সম্মার্জ্জিত জ্ঞানে শাস্ত্র আলোচনা। সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা অনন্যমনা হইয়া এখন এই পথে চলিয়াছে; কিন্তু এ পথে প্রথম পথ-প্রদর্শক, জগতের শিক্ষাগুরু একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়। ইউরোপ, আমেরিকা এ ঋণ অস্বীকার করে না। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা ভারতবর্ষ নয়। সেখানে একটী চিন্তার বীজ পড়িতে না পড়িতে চিন্তায়, দর্শনে, সাহিত্যে, সমাজে তাহা অসংখ্য আকারে পল্লবিত হইয়া কতই ফুলফল প্রসব করে। আপনাকে হারাইয়া ফেলিব, এ ভয় না রাখিয়া সকল ভূভাগের, সকল বিদেশী জাতির শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ···আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরের গভীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এই স্বাধীন চিন্তা প্রতিষ্ঠিত। ...ইহা যথেচ্ছাচারী বা অসংযত বুদ্ধি নয়।

সহজ মানব-প্রকৃতিতে ইহার মূল থাকিলেও, ইহা কঠোর সাধন, শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। নির্ভীকতা ইহার প্রকৃতি; বিশ্বরূপ দর্শন ইহার আকাঙ্ক্ষা, বিভূতিযোগ ইহার সাধনের সামগ্রী। রাজা রামমোহন রায় ইহাকে শুধু যে শাস্ত্রানুশীলনোন্মুখী করিয়াছিলেন, তাহা নয়; কিন্তু ইহার নির্ভীকচিত্ততা এবং দেশী-বিদেশী সকল শাস্ত্র চর্চ্চার মধ্যে ইহার সুদৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদকে পরিহার করিয়া গভীর ভক্তিপূর্ণ জীবনগত শাস্ত্রানুশীলন কি, নিজ জীবনে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী আর একজন (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যাভিমানশূন্য হইয়াও, সকল শাস্ত্রে ও সকল মহাপুরুষে বিভূতি যোগের গভীর মন্ত্র নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহারই কথা বলিয়া গিয়াছেন। ...মূল কথাটা কিন্তু এই। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্মের ভিতর একই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে; এ বিষয়ে এখন যেমন দুই মত হওয়া একরূপ অসম্ভব; তেমনি প্রত্যেক জাতীয় ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব আছে, এবং যতদিন জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব থাকিবে, ততদিন সেই ধর্ম্মের বিশেষত্ব থাকিবে, এ বিষয়েও এখন দুই মত হওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সেই জাতীয় ধর্ম্মের রক্ষা, উন্নতি, চির-জীবন্ত ভাবের জন্য, জাতীর শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা, কোন অভ্রান্ত বুদ্ধিতে না করিয়া যদি স্বাধীন চিন্তাদ্বারা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বাধীন চিন্তাকে বৰ্দ্ধিত, পুষ্ট, সম্মাৰ্জ্জিত, সুতীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ করিতে হয়। ঐজন্য কেবল জাতীয় শাস্ত্রের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখা শ্রেয় নয়, তাহাকে নির্ভীকচিত্তে সকল শাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের আলো-চনাতেই অধিকার দেওয়া অধিকতর অনুকূল? আমি কেবল শূন্য আলোচনা করিবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। নির্ভীক স্বাধীন-চিন্তার ভূমির উপর দাঁড়াইয়া স্বদেশী-বিদেশী সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গ করিবার জন্য আমি আমার পরিচিত-অপরিচিত সকল চিন্তাশীল বন্ধুগণকে অন্তরের

সহিত আহ্বান করিতেছি। ···এ পথে সঙ্কীর্ণতা রাখিলে চলিবে না। হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, ইহুদী ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র, মুসলমান শাস্ত্র, সকলের জন্য স্থান রাখিতে হইবে। শুধু পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়া নয়, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তিতে সকলের আলোচনা করিতে হইবে,—জ্ঞান ও ভাবকে মিশাইতে হইবে। ···যাহা স্বদেশী ভাষায় লেখা হয়, তাহারও অনুবাদ আবশ্যক। জগদ্বাসীকে তাহার অংশ দাও। ···জগতের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে বিধাতা সকল ধর্ম্মকে মিলিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রসঙ্গে ভারতের মধ্যে যে ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, সমস্ত জগৎকে তাহার কাছে মাথা নোয়াইতে হইবে। বিধাতার এ আশীর্ব্বাদ আমরা কি রাখিতে পারিব না?"

১৩। স্বামী বিবেকানন্দের বিবৃতি (১৮৯৩-১৯০২ খৃঃ)—

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথের সমসাময়িক মানুষ। ১৮৬২ খৃঃ কলিকাতায় পৈত্রিক ভিটায় তাঁর জন্ম ও ১৯০২ খৃঃ স্বপ্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন। কলিকাতাতেই তিনি বর্দ্ধিত। ১৮৮২ খৃঃ মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে তিনি দর্শনশাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষা দেন। তখন দেশের উপর দিয়ে ব্রহ্মানন্দের আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত, আর তরুণেরা সেই বিশুদ্ধ জলসেচনে পুষ্ট। ১৮৫৭-৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের শিক্ষামূলক আন্দোলনে সমস্ত দেশে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মের সংস্কার এবং নীতি ও চিন্তার নবযুগ এনে দিয়েছিল। আবার, ১৮৭৩-৮৪ খৃঃ তাঁর tradition-convention-মুক্ত আধ্যাত্মিক সাধন এক নবদৃষ্টি দান করেছিল। সেই দৃষ্টিতেই সাধকেরা সমন্বয়ের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। বহুধাবিভক্ত জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য ব্রহ্মানন্দ plan করে এক একটী মানুষ তৈরী করে, 'নবঅধ্যয়নের' ও 'সমন্বয়-সাহিত্য' সৃষ্টির আয়োজন করলেন, যে হেতু সাহিত্যই জাতির স্রষ্টা। আবার, সংকীর্ণ মানুষদের বিরাট মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য 'সাধু-সমাগম' বা আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রা,

আধ্যাত্মিকবক্তৃতার প্রবর্ত্তন করলেন। তারপর উৎসব-প্রাঙ্গণের গণ্ডী মুছে দিয়ে, তাকে প্রসারিত করে দিলেন। প্রতি জীবনে বিশ্বদেবতার অবতরণের মুহূর্ত্ত ও ক্ষেত্র,—যেগুলিকে আমরা ভুলেই থাকি, যথা, ধর্ম্মনেতাদের দান, পবিত্রাত্মার পরিচালনা, মাতৃভূমি, গৃহ, শিশু, ভৃত্য, দুঃখী, মহাজন, জনহিতৈষী, উপকারী, বিরোধী—সবার মিলনে মহা মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করলেন। ব্রহ্মানন্দের বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব দিয়েই এসব সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার মর্ম্মগ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। দু-একটী উর্ব্বর ক্ষেত্রে তার অপূর্ব্ব ফল ফল্‌লো। স্বামিজী তার ভিতর একজন। ব্রহ্মানন্দের খুব কাছে আসার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। * তাঁর কনিষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে Hindusthan Standard পত্রিকা লেখেন—

"Long back he had imbibed great religious zeal not only under the influence of his elder brother Narendranath (Swami Vivekananda) but also by coming into contact with the Brahmo Samaj as then led by Brahmananda Keshab Chandra Sen, Srimat Swami Vijay Krishna Goswami, who swayed the minds of vast masses of people in the country by their devotional and idealistic preaching."

স্বামিজী অতি অল্প সময়ের ভিতর হিন্দু সমাজের কাঠামোর ভিতর সেই আধ্যাত্মিক মুক্তি ও স্বাধীনতার বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর অগ্নিময়ী স্বদেশপ্রেমের বাণী দেশবাসীর চিত্তকে অধিকার করলো। অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব্ব তাঁর গঠনীশক্তি। 'রামকৃষ্ণ মিশন' ও বেলুড় মঠ তার সাক্ষ্য।

ব্রাহ্মসমাজের জীবনে বুদ্ধের বহু শিক্ষার নবজন্ম হয়েছিল। জাতিবর্ণ-বৈষম্য দূর, যাগযজ্ঞ পশুবলি নিবারণ বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বর্জ্জন, দর্শনমূলক ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিক সাধন, স্বার্থশূন্য বৈরাগ্যের জীবন দিয়ে করুণা ও

* 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান'—মহেন্দ্রনাথ দত্ত; ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের বিবৃতি।

সাম্যের প্রতিষ্ঠা। স্বামী বিবেকানন্দও বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর সন্ন্যাসও ছিল বুদ্ধের মত আপন ভোলা, পরদুঃখে কাতর। কোন কোন বিষয়ে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও ছিল। নানান অবস্থার ভিতর দিয়ে ১৮৮৬ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সন্ন্যাস নেন ও নব-সন্ন্যাসী দল গঠন করেন। ঐ traditional সন্ন্যাসীর বেশ, সন্ন্যাসীর মঠ ও আশ্রম ও বিভিন্ন traditional মতবাদের (কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, গুরুবাদ) আধুনিক যুগে স্থান কোথায়? আমেরিকার própaganda পদ্ধতিও কি ঠিক? ব্রহ্মানন্দের আদর্শ ছিল বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে, জাতির চিত্তকে tradition ও expediencyর পথ থেকে মুক্ত করে, শিক্ষার আলোকে শক্তিশালী করে তোলা ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত করা। আসলে, স্বামিজী ছিলেন বিশুদ্ধ ভারতীয় জ্ঞানপন্থী, বিদেশী ভাল জিনিষের সম্মান করলেও তিনি নববিধানের সমন্বয়ের পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর একটী বক্তৃতায় দেখি—

"Of course I do not endorse all his (Buddha's) philosophy. I want a good deal of metaphysics, for myself. I entirely differ in many respects, but because I differ, is that any reason why I should not see the beauty of the man? He was the only man who was bereft of all motive power;"*

Chicago Parliament of Religionsএ (১৮৯৩) স্বামী বিবেকানন্দ 'Buddhism, A Fulfilment of Hinduism' বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন, তাতে বলেন—

"Far be it from me to criticise Him whom I worship as God incarnate on earth. But our views upon Buddha are that He was not understood properly by His disciples. The relation between Hinduism—by Hinduism I mean the Religion of the Vedas—and what is called Buddhism at the present day, is nearly the same as that between Judaism and Christianity." "Sakya-

* **'Speeches and Writings of Swami Vivekananda' (Natesan).**

Muni came not to destroy but to be the fulfilment, the logical conclusion, the logical development of the Religion of the Hindus."

"He was the first being in the world to bring missionarising into practice,"

"The great glory of the Master lay in His wonderful sympathy for every one, but specially for the ignorant and the poor." "On the philosophic side the disciples of the Great Master dashed themselves against the eternal rocks of the Vedas and could not crush them, and on the other side they took away from the nation the eternal God to which every one, man or woman clings so fondly. And the result was that Buddhism in India had to die a natural death." 'Brahminism lost something of that reforming zeal, that wonderful sympathy and charity for everybody that wonderful heaven which Buddhism wrought into the masses."

"This separation between Buddhist and Brahmin has been the cause of the downfall of India."

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নববিধানের যে আদর্শ ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁর Lowell Lecturesএ * ব্যক্ত করেছিলেন, এই বক্তৃতার ভিতর তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' বইটীতে দেখি—

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

"Bereft of all motive power, he did not want to go to heaven, did not want money; he gave up his throne and everything else, and went about begging his bread through the streets of India, preaching for the good of men and animals with a heart as wide as the ocean."

"Buddha! Buddha! surely he was the greatest man who ever lived. He never drew a breath for himself. Above all, he never claimed worship. He said,

* 'Lectures in America and other Papers'—P. C. Mozoomdar

Buddha is not a man, but a state. I have found the door. Enter all of you!"

আরেক জায়গায় বলেছেন—

"It was part of a deep-lying law of the historic development, that Rama, Krishna and Buddha had all arisen in the kingly and not in the priestly caste. And in this paradoxical moment, Buddhism was reduced to a castle-smashing formula, a crushing rejoinder to Brahminism!"*. "I am the servant of the servants of the servants of Buddha, who was there ever like Him? The Lord, who never performed one action for Himself —with a heart that embraced the whole world! So full of pity that He—Prince and monk would give His life to save a little goat!"

"The fact is Buddhism tried to do in the time of Asoka, what the world never was ready for till now!" "He referred to the federalisation of religions. He also spoke about the morality of Budhism."

বৌদ্ধধর্ম্মের কুফল বর্ণনা করে স্বামী বিবেকানন্দ একটী ইংরাজী বক্তৃতায় বলেছেন যে, শাক্যমুনি পরম বিশুদ্ধ ও মহামহিমময়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের ফলে, বিভিন্ন অসভ্য, অশিক্ষিত জাতি আর্য্যসমাজে প্রবেশ করায়, বুদ্ধদেবের আদর্শ ঠিক নিতে পারেনি, বরং তাদের কুসংস্কার, বীভৎস পূজাপদ্ধতি ঢুকিয়ে দেয়। প্রাণিহিংসাকে নিন্দা করতে গিয়ে বৈদিক যজ্ঞ লোপ পেল, কিন্তু বড় বড় মন্দির, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ঢুকলো। বুদ্ধ পৌত্তলিকতা উঠিয়ে দেন, বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত তাঁরাই বৌদ্ধমূর্ত্তি গড়ে প্রতিমাপূজার সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া, উহার অপূর্ব্ব নীতিতত্ত্ব ও নিত্য আত্মার অস্তিত্ব লইয়া চুলচেরা বিচার সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংস হয়ে গেল ও যা রইলো, তা অতি বীভৎস, যা আর কখন ধর্ম্মের নামে চলেনি।"

* 'The Sages of India'—Lectures in Madras.

১৪। ভগিনী নিবেদিতার বিবৃতি (১৮৯৮-১৯১১)—

ভগিনী নিবেদিতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভাবে না দেখ্‌লেও, তাঁর প্রভাব এবং তাঁর প্রভাবে গড়া মানুষ দেখেছিলেন। তার ভিতর স্বামীজি, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ও বিনয়েন্দ্রনাথের নাম করা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতের নবযুগের ইতিহাসে কেশবের স্থান তিনি দেখেছিলেন। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খৃঃ আয়রলণ্ডে তাঁর জন্ম এবং ১৯১১ খৃঃ জগদীশচন্দ্রের দার্জিলিঙের গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৮৯৮ খৃঃ ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষকে জানা ও জানানই ছিল তাঁর ব্রত। সেজন্য যে সহানুভূতির প্রয়োজন, তা' পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'Web of Indian Life', 'Footfalls of Indian History', 'National Education', 'Civic and National Ideals,' 'Cradle Tales of Hinduism' বইগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ছিলনা। কিন্তু তাঁর ধী, স্বাধীন চিন্তা ও নূতন দৃষ্টি সকলকেই চমৎকৃত করে।

'Footfalls of Indian History' বইটীতে তিনি লিখেছেন—

"Buddhism in India never consisted of a church but only of a religious order. Doctrinally it meant the scattering of that wisdom which had hitherto been peculiar to Brahman and Kshatriya amongst the democracy. Nationally it meant the first social unification of the Indian people. Historically it brought about the birth of Hinduism. In all these respects Buddhism created a Heritage which is living to the present day. Amongst the forces which have gone to the making of India, none has been so potent as that great wave of redeeming love for the common people which broke and spread on the shores of Humanity in the personality of Buddha. By preaching the common spiritual right of all men whatever

their births. He created a nationality in India which leapt into spontaneous and overwhelming expression so soon as his message touched the heart of Asoka, the People's King. This fact constitutes a supreme instance of the way in which the mightiest political forces in history are brought into being by those who stand outside politics."

ভারতীয় স্থাপত্যের আলোচনায় তাঁর অশেষ দান। বৌদ্ধ স্থাপত্যের বিষয় তাঁর কোন কোন উক্তি এখানে উদ্ধৃত হল—

"A picture has properly speaking, two functions, with both of which the cheapness of modern commerce has sadly interfered. One of these is its place in architecture; the other is its place in the book. The first was developed in India to an extraordinary degree, under the Buddhistic civilisations of the first thousand years of the Christian Era. The second was equally highly developed under the auspices of the Moghul dynasty of Delhi......There can be no doubt that there is a great future in India for Moghul painting. The large halls of assembly that the coming era of nationality and democracy will popularise, for purposes of education and of the civic life,—will all demand decoration, and undoubtably that decoration will take the form of mural painting to a great extent. This painting will have three different subjects, the national ideals, the national history, and the national life. Among these shadows of noble thought, the men and women of the future will grow up. Against such background, a constantly grander civic life will be moulded.

"These village-halls, in which the deepening political consciousness of the future will find expression, have had their prototypes in India, in the chaitya-halls of the Buddhist *Viharas* by means of which, as Mr. Havell

very lucidly points out, one of the great world-schools has been developed in art."

"India has known two great periods of Nationality, the Buddhist and the Mahomedan. . . . The soil of India is an immense palimpsest of the Asokan and Mohammedan empires. In Behar,—the ancient Magadh—this is especially easy to prove. Here the tamarind tree deliberately replaces the peepul, the tomb of the pir is placed on the height of the ancient stups. The Mahomedan fortress is built on the site of the Asokan capital. It is only when we really grasp this idea thoroughly that we can prepare ourselves for the study of the further questions, the extent to which what we call Buddhism has actually influenced India as a whole. From the farthest south to the most distant north, we shall find its memorials here in buildings and relics of various sorts, again in a peculiar style of architectures, and yet elsewhere in names. doctrines and folklore.

And with all this,—what was Buddhism? It was no sect however large, no church, however liberal. It included a religious order. But Buddhism was, in fact, simply Hinduism nationalised, that is to say, Hindu culture plans the democratic idea. Hinduism alone in its completeness, can never create a nationality, for it then tended to be dominated by exclusiveness. . . . . exclusiveness is its characteristic weakness and vice. It is only, there, when there is within Hinduism itself a counter-centre to this that Hinduism can suffice to create a nationality. This counter-centre was found during the Asokan period in the personality of Buddha (and his Sangha). After the advent of Mahomedanism even this could no longer be sufficient, so that Akbar and Shah Jahans combining the ethos of Hindu culture with the Islamic idea of the Brotherhood of man, became the representative figures of the new conception of nationality.

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ও চিত্রে আধ্যাত্মিকতা যে রূপ লাভ করেছে, এমন পৃথিবীর অন্যত্র ক্বচিৎ দেখা যায়। সেই জন্য ভারতীয় ভাস্কর্য্যকে অপ্রাকৃত বলা হয়েছে। লোকশিক্ষাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। ইদানীং যে সব নূতন নূতন প্রাসাদ ও অট্টালিকা মাথা তুলেছে, তার অধিকাংশই ঐশ্বর্য্য ও ব্যবহার-সৌকর্য্যের দিক থেকে গড়া। তবে অনেক স্থলে মিশ্রশিল্পও চোখে পড়ে। নূতন নূতন দেবালয় এবং আশ্রমও নির্ম্মিত হয়েছে, যার ভিতর আধ্যাত্মিক রূপ ফুটে বেরিয়েছে। গৃহ নির্ম্মাণের ও তাকে সাজানোর নূতন পরিকল্পনা ব্রহ্মানন্দ 'নবসংহিতায়' দিয়ে গেছেন। ঐ ভাবে বহু গৃহস্থ নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করেছিলেন। তিনি একটি দেবালয়ও নির্ম্মাণ করেন, যা স্বল্প ব্যয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে গঠিত; কিন্তু ভাল করে দেখলে তার ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ আধুনিক রূপের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

এই দেবালয়টি কলিকাতায় ৭৮বি. আপার সার্কুলার রোডে শহরের ভিতর অবস্থিত। ১৮৮৩-৮৪ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দেবালয়টি নির্ম্মাণ করান। এটি 'নব দেবালয়' * নামে পরিচিত। শ্রদ্ধেয় ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রকে দ্রষ্টা ও শিল্পী বলেছেন। কথাটি অতি সত্য। কেশবচন্দ্রের বহুমুখীন প্রতিভা—যেমন সমাজগঠনে, নব ধর্ম্মরচনায়, 'নবসংহিতা' প্রণয়নে, 'নববৃন্দাবন' নাটকে, সমন্বয়ের নিদর্শনে, তেমনি আবার কমলকুটীর, কমল-সরোবর, যোগকুটীর, নব দেবালয়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতির গঠনে প্রকাশ পায়। তিনি যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য সাধনারও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, নব দেবালয়টি তার একটি সাক্ষ্য।

১৮৬৮-৬৯ খ্রীঃ তাঁর অনুপ্রেরণায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির' নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটির চূড়ার উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং অনেক পরিশ্রমে তা সম্পন্ন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তখনকার নূতন আদর্শটিকে স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে

* 'প্রবাসী' ১৩৩৩ আশ্বিন 'নব-দেবালয়' প্রবন্ধ দেখুন।

তোলা। সে সময় ছিল 'লোকসংগ্রহের' যুগ, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সম্মানিত সকল ধর্ম্ম ও সকল শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ সাধনের প্রয়াস। রাজা রামমোহন রায় পূর্ব্বেই যুক্তি বিচারের সাহায্যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রের ভিতর যে সাধারণ সত্য নিহিত আছে, তা প্রকাশ করে যান এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্রে সেই একেশ্বরবাদের ভূমিতে মিলবে, সেই উদ্দেশ্যে ১৮৩০ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে, তারই নূতনতম বিকাশ দেখা গেল ব্রহ্মানন্দের 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের' গঠনে; হিন্দুর মন্দির, খ্রীষ্টানের গির্জ্জা, মুসলমানের মস্‌জিদের আকৃতির সম্মিলনে সেই আদর্শ প্রকাশিত হ'ল। সকলের একত্র সমাবেশই হ'ল তখনকার অধ্যাত্ম আদর্শ। এই আদর্শ সনাতন কাল থেকেই ভারতের জীবনে দেখা গিয়েছে। নূতন যুগে তাই আবার নূতনতম রূপে উপস্থিত হয়েছে।

সমন্বয়ের এই চিন্তা ও আদর্শ ক্রমশঃ বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করে নববিধানের নূতন আদর্শ দেখা দিল। ইতিহাস নূতনরূপে গৃহীত হ'ল—কেবলমাত্র একত্র সমাবেশ নয়, যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান সমাগত হয়েছে, সকলের ভিতর অঙ্গাঙ্গী যোগ নববিধানে প্রকাশিত হ'ল। নববিধানের মূলকথা হ'ল, যে পথে মানুষকে সমন্বয়ে অগ্রসর করে দেয়, তার সাধন। বুদ্ধদেব যেমন একদিন 'মধ্য পথের' কথা বলেছিলেন, কোন দিকেই চূড়ান্ত ভাবে ঝুঁকে পড়বে না, মাঝখানে চলে আসবে, তা হলেই 'আমিত্বের' এমন অবস্থা হবে যে, সত্য বা প্রজ্ঞা তার কাছে সহজে প্রকাশিত হবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধানে ঘোষণা করেছিলেন যে, বর্ত্তমান যুগে যে বহুর প্রকাশ, বহুর সামীপ্য ঘটেছে, তাদের সকলকেই নিতে হবে। কি করে? প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির 'সামঞ্জস্য' করে। যদি কোনটির সঙ্গে কোনটির সামঞ্জস্য না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তার ভিতর গলদ আছে। আবার নূতন করে নূতন চোখে দেখতে হবে, সামঞ্জস্য প্রকাশিত হলে তখন বুঝবে যে, সত্য লাভ করেছ। সামঞ্জস্যেই

১লা জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃঃ কেশবচন্দ্র যথারীতি 'নব দেবালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৮ই জানুয়ারী ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া পরম জননীর ক্রোড়ে স্থানলাভ করেন। এই দেবালয়টি তাঁর শেষ দান ও তাঁর আধ্যাত্মিক শিল্প-প্রতিভার জ্বলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ আজও বর্ত্তমান। প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি যে প্রার্থনা করেন, তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

"এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালাম, এ স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব। আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দি। প্রিয় ভাইগণ, তোমাদিগকেও বলি, তোমরাও মার ঘরখানি সাজাইয়া দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও ; মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মার পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন, তোমরা একটী ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া, দেবদেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান, এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে।... মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রীসৌন্দর্য্য। মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ, সুস্থতা, বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ সুখ।"

এবার 'নব দেবালয়ে'র শিল্প-নৈপুণ্যের আলোচনা করা যাক। রয়্যাল একাডেমী অব আর্টের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিল্পী বন্ধুবর শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বসে বহুক্ষণ ধরে 'নব দেবালয়' দেখবার সুযোগ ঘটেছে। ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে, ভারতীয় শিল্পরীতিতে, নববিধানকে কি চমৎকার মূর্ত্তি দান করা হয়েছে এই 'নব দেবালয়ে' ; বাহিরকে ছেড়ে, ভিতরে প্রবেশ করে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও

বর্ত্তমান, সকল ধর্ম্মের সাধনার মর্ম্মকথার অপূর্ব্ব সমন্বয় করা হয়েছে। অতি সহজ অনাড়ম্বর, কিন্তু বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের নিখুঁত আদর্শ এই নব দেবালয়ের গঠনে প্রকাশ করেছেন। সমন্বয়াচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও ইঙ্গিতে ঐ সময়েই মহা মহা সমন্বয়ভাষ্য রচিত হয়েছিল—বেদান্ত-সমন্বয়-ভাষ্য, গীতাপ্রপূর্ত্তি, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা-সমন্বয়-ভাষ্য, নানকপ্রকাশ, কোর্‌আন্‌শরীফ ও হদিস্‌, Oriental Christ ও ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকায় অতুলনীয় সমন্বয় সাহিত্য প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'নব দেবালয়ে' স্থাপত্যের ভিতর নববিধানের আধ্যাত্মিক আদর্শকে প্রকাশ করেছেন।

প্রথমেই চোখে পড়ে নব দেবালয়ের পাদদেশে দুটি গুম্ফাকৃতি কোটর। ঐ দুটি যেন বলছে যে, ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা সাধন না করে উপরে উঠা যায় না। তার পরে, চার ধাপ সিঁড়ি ও তার দু'ধারে দুটি ছ'কোণা থাম দুটি মনে করিয়ে দিল বৈচিত্র্যের কথা।

> "রূপভেদপ্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌।
> সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতিরূপং ষড়ঙ্গকম্‌।"

বিশ্ব বৈচিত্র্যে গঠিত—সেই বৈচিত্র্যে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

উপরে উঠবার চারটি সিঁড়ি, যেন সাধনমার্গের চারটি ধাপ—যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান। 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' ব্রহ্মানন্দ কয়েক বৎসর ধরে সাধু অঘোরনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে এই তত্ত্বই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রশস্ত রোয়াক। ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, এটি ভক্তদের জন্যে, তাঁরা মার নাম কীর্ত্তন করে নৃত্য করবেন অনুরাগ ও মত্ততায়।

ভিতরে প্রবেশের দরজা চারটি, তার মধ্যে আবার একটি ছোট। যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানই আবার পরীক্ষা করে নেবার জন্যে সামনে দণ্ডায়মান। যোগের দরজাটি ছোট, যোগীকে দেহ সঙ্কুচিত করে ঢুকতে হবে। প্রতি দরজার উপরে শিব-মন্দিরের আকারের আর্চ—মঙ্গলময়ের কৃপা মাথার উপর যেন

সদাই উপস্থিত—তার ভিতরে জ্যোতির প্রতীক-স্বরূপ নানা বর্ণের কাঁচের ভিতর একটি প্রদীপ ও আলোক-শিখার মত রেখা অঙ্কিত। কার্নিশগুলি ভিতর দিকে ঢোকানো, যেন অন্তর্মুখীনতারই পরিচয় দিচ্ছে। দরজার আশেপাশে দেওয়ালের গায়ে গায়ে আটটি থামের আকৃতি বৌদ্ধ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক সত্যের ও যোগশাস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এবার কেশবের প্রিয় চূড়াটির দিকে একবার দেখি। সবার উপরে নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা সত্যের মহিমা ঘোষণা করছে। তার পরেই ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমন্দিরের মতন গঠন 'শিবমে'র প্রতীক হয়ে রয়েছে, তার পাদদেশে অঙ্কিত লতাপাতা ফুল 'সুন্দরের' প্রতীকরূপে শোভা পাচ্ছে। 'সত্য শিব সুন্দরে'র অপূর্ব্ব সমন্বয়! তারপর ভারতীয় মন্দিরের গঠনরীতি অনুসারে আবার অপেক্ষাকৃত বড় শিব-মন্দিরের ও তার পাদদেশে লতাপাতা ফুলের যোজনা করা হয়েছে। এই শিবমন্দিরটির মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি * ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, Religion-এর সঙ্গে Science-এর মিলনের নিদর্শনরূপে শোভা পাচ্ছে। বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হ'ল নববিধানের নূতন কথা—সেটিও এখানে সুন্দররূপেই স্থান পেয়েছে। চূড়াটির ভিতর সত্য শিব সুন্দরের অপূর্ব্ব সমন্বয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানের ভিতর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান করে দিয়ে, অতীত ও বর্ত্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের মিলন সাধন করেছেন।

এবার দেবালয়ের ভিতরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় ভিতরকে বলেছেন—"মার খাস দরবার।" সত্যই খাস দরবার, যেন গম্ গম্ করছে। একটি উচ্চ বেদী, তার উপর আচার্য্যের বসিবার আসন, গৈরিকবস্ত্র, একতারা, সম্মুখে কমণ্ডলু, নববিধান-অঙ্কিত রৌপ্য-পতাকা ও পুথি। বেদীর সম্মুখভাগে ও উভয় পার্শ্বে প্রেরিত মণ্ডলীর নামাঙ্কিত মর্ম্মর প্রস্তর ও বসিবার আসন। পশ্চিম পার্শ্বে মহিলাদিগের উপাসনায় বসিবার স্থান।

* ঘড়িটির কথা ভাই গিরিশচন্দ্রও উল্লেখ করেছেন।

সহজ অনাড়ম্বর স্থাপত্যের ভিতরেও যে গূঢ় আধ্যাত্মিকতাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়, 'নব দেবালয়' তারই প্রমাণ। স্থাপত্যের ভিতর নূতন জীবন্ত ভাবকে ফুটিয়ে তুলবার শিক্ষা দিয়ে বৌদ্ধদের মত কেশবচন্দ্রও জাতীয় শিক্ষার পথকেই প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন।

ব্রহ্মানন্দের নূতন মতবাদ, অনুষ্ঠান, ব্রত প্রভৃতির কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর স্থাপত্য ও চিত্র বিষয়ে কোথাও আলোচিত হয়নি; তাই বৌদ্ধ স্থাপত্য ও চিত্র আলোচনার প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দের এই দিকটীর পরিচয় দেওয়া গেল।

১৫। 'আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯ খৃঃ)

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 'নব অধ্যয়নের' ধারা ক্রমশঃ বাঙ্গলা দেশের সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করলো, এমনই ছিল তার কার্য্যকরী শক্তি। গবেষণা ও Critical History রচনার দিক দিয়ে কেউ কেউ গেলেন, কিন্তু অধিকাংশই জীবনের ভেতরে বৌদ্ধধর্ম্মকে আপনার করে পাবার ও দেখবার জন্য উৎসাহিত হলেন। তাঁদের চেষ্টায় তুলনামূলক ও সামঞ্জস্য-করার—দুই ভাবই ছিল।

ঐ সময়ে আরো দুটী প্রতিষ্ঠানের জন্ম, তাদের কথাও এখানে বলা দরকার। প্রথম হল সিংহলের Pali Text Society; Prof. T. W. Rhys Davids এটী ১৮৮১ খৃঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৬৪ খৃঃ Ceylon Civil Service এ যোগ দেন। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁকে আকৃষ্ট করে। সেই সময়ে তিনি পালি ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৭২ খৃঃ তিনি বিলাতে ফিরে যান এবং Childers, Fausboell, Oldenburg প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম্মবিৎদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুবাদ ও মূল গ্রন্থগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। প্রাচ্যের সঙ্গে তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, আর বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগও ছিল।

তাই তিনি Childers প্রভৃতির ব্যাখ্যায় যে সব ভুল ভ্রান্তি দেখতেন, তার সংশোধন করতে পারতেন। তাঁর গ্রন্থের ভিতর Buddhism (1896) ; Buddhist India (1903) ও Pali-English Dictionery (1925) বিখ্যাত। তাঁর সহধর্ম্মিণী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা করে যান। এঁদের দুজনের ভিতরেই গবেষণা ও সাধনার সংমিশ্রন দেখা যায়। তাঁদের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পাশ্চাত্য দেশবাসীর জীবনে সঞ্চারিত হয়েছিল ও অনেক নূতন কর্ম্মী ঐ ক্ষেত্রে এসে যুক্ত হন এবং যশস্বী হন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটী কলিকাতার Buddhist Text Society, এটী ১৮৯২ খৃঃ শরচ্চন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠা করেন। শরচ্চন্দ্র ১৮৮২ খৃঃ তিব্বত থেকে ফেরেন ও সেখানকার বহু প্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। তিব্বতে যে সব ভারতীয় পণ্ডিত গিয়েছিলেন, তাঁদের বিষয় অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেন। তাঁর কৃত 'অবদান কল্পলতা' (১৮৮৮) ও 'সুবর্ণ প্রভাষ' (১৮৯৮) বঙ্গানুবাদ দুটী সুপরিচিত। তিনি Tibetan English Dictionary (1879-1900) প্রকাশ করেন; এই অভিধান প্রণয়নে তাঁর ছাত্র সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ Buddhist Text Societyতে বহু অমূল্য কাজ করেছেন। সতীশচন্দ্র ১৯০১ খৃঃ পালি ভাষায় এম্ এ উপাধি পান, ১৯০৮ খৃঃ বৌদ্ধ ও হিন্দু ন্যায় ও দর্শনের ইতিহাস লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম Doctorate উপাধি পান। এই প্রসঙ্গে আরেকটী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করতে হয়। সিংহল থেকে অঙ্গারিক ধর্ম্মপাল মহাশয় এসে, ১৮৯১খৃঃ কলিকাতায় 'মহাবোধি সোসাইটী' স্থাপন করেন। তখনও এই সোসাইটীর বিশেষ কোন কর্ম্মপদ্ধতি দেখা যায়নি। ধর্ম্মপাল মহাশয় তখন শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাদের কাছে সহানুভূতি ও পরামর্শের জন্য নিত্য যাতায়াত করতেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্রের ব্যবস্থায়ই তিনি

১৮৯১ খৃঃ চিকাগো ধর্ম্মসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যান ও জগতের সভায় পরিচিত হন। এঁর কথা পরে বলা যাবে।

ঐ সময়ে (১৮৯৯-১৯০১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ঐতিহাসিক-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কয়েকটী চমৎকার বক্তৃতা হয়েছিল। বক্তাদের ভিতর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও কালীবর বেদান্তবাগীশ। বিনয়েন্দ্রনাথের কথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন ১৩০৬ (১৮৯৯) খৃঃ। সাহিত্য পরিষদ্ ঐ বছরেই সেটী পুস্তিকাকারে ছাপান। পরে এটী 'নানাচিন্তা' বইটীতে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটীতে বক্তা একসঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শন, বেদ, বেদান্তদর্শন, কাপিলসাংখ্য, পাতঞ্জলসাংখ্য, পুরাণ ও তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যকালে বাড়ীতেই পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরে দু-বছর সেণ্টপলস্ স্কুলে ও হিন্দু কলেজে পড়েন। ইনি কেশবচন্দ্রের দু-বছরের ছোটো। ১৮৬২ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ যখন কলুটোলা বাড়ী ছেড়ে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির পরিবারে এসে থাকেন, তখন ঐ পরিবারের সঙ্গে তাঁর সুদৃঢ় ভালবাসার বন্ধন হয়। ইনিও কেশবচন্দ্রের মতন পরীক্ষা পাশের জন্য অপেক্ষা করেন নি, আত্মোৎকর্ষই তাঁদের কাছে বড় ছিল। মেট্‌কাফ-গ্রন্থাগারে এঁরা দুজনেই দর্শন ও সাহিত্যের প্রধান প্রধান সকল গ্রন্থ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েন। Trigonometry ও Mensuration দ্বিজেন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল। মাতৃভাষার চর্চ্চায় কেশবের মতন দ্বিজেন্দ্রনাথও খুব অগ্রসর ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সুরসিক ছিলেন, সুন্দর কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করতেন, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ও তার স্বরলিপি প্রস্তুত করতেন, চিত্রাঙ্কনে নিপুণতা দেখিয়েছেন। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানালোচনার দিকে তাঁর ঝোঁক হয়। সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় কঠিন তত্ত্ববিদ্যা

ও দর্শনের কথা বলবার ও লিখবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে জন্মায় ও দার্শনিক হিসাবে তিনি যশস্বী হয়ে উঠেন। 'পতঞ্জলের যোগ-শাস্ত্র', 'একালের দর্শন', 'তত্ত্ববিদ্যা', 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা', 'সার সত্যের আলোচনা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন', 'বিদ্যা এবং জ্ঞান', 'গীতাপাঠ' তাঁর কয়েকটী প্রসিদ্ধ দার্শনিক রচনা। তিনি পিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতেন। পরে বড় হয়ে যখন তিনি উপাসনা ও ব্যাখ্যান দিতেন, তখন সকলে তা শুনে মুগ্ধ হতেন। তাঁর ব্যাখ্যানে তাঁর ভিতরের মানুষ যেন বেরিয়ে পড়তো। তিনি যে কোন্ উচ্চলোকে নিয়ত বাস করতেন, তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত তার পরিচয় দেয়। তাঁকে পরিবারের সকলে 'বড়দাদা' বলতেন, জ্ঞানে ও গুণে তিনি পারিপার্শ্বিক সকলের কাছেই 'বড়দাদা' ছিলেন। ইদানীং যে তাঁকে দেখেছে, সেই তাঁর নির্ম্মল সরল শিশুসুলভ মনের পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছে। তাঁকে ঋষি বলবো, না বৌদ্ধ-স্থবির বলবো? দু'টী সাধনই তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। বুদ্ধের মতন নির্ব্বিকার, সমদৃষ্টি, সকলের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা, এমন কি পাখী ও কাঠবিড়ালীও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতনা এবং নির্ভয়ে তাঁর গায়ের উপর বেড়িয়ে বেড়াতো। মহর্ষির মত ভারতীয় সাধু মহাজন ও দার্শনিকদের প্রতি তাঁর স্বভাব-সুলভ পক্ষপাতিত্ব ছিল। প্রবন্ধটীর কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"বুদ্ধদেব ঈশ্বর বটে, কিন্তু মনুষ্য-বুদ্ধই যে ঈশ্বর, তাহা নহে। মানুষ-বুদ্ধের অভ্যন্তরে তিন-শ্রেণীর দেবতাবুদ্ধ স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছেন। প্রথম স্তরে রহিয়াছেন—বৌদ্ধশাস্ত্রের পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, ইনি বোধিসত্ত্ব শ্রেণীর বুদ্ধ—বেদান্তদর্শনের পদ্মপাণি বিষ্ণু বা বৈশ্বানর। তেমনি দ্বিতীয় স্তরে রহিয়াছেন অমিতাভ, ইনি ধ্যানীবুদ্ধ—বেদান্তের যিনি হিরণ্যগর্ভা ব্রহ্ম। তৃতীয় স্তরে রহিয়াছেন বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ—বেদান্তের সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর, ইনিই মহেশ্বর।"

"যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি মহেশ্বর, তিনিই পৌরাণিক-দিগের শূলপাণি মহেশ্বর। যিনি আদিবুদ্ধ, তিনিই শিব।

চৌতালার বৌদ্ধের নির্ব্বাণমুক্তি বেদান্তের তুরীয়াবস্থা।”

“ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থান। একটী বেণী হচ্ছেন বৌদ্ধশাস্ত্রের সরস্বতী নদী, এক্ষণে যিনি দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পড়িয়া স্মৃতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বেণী হচ্ছেন বেদান্ত-দর্শনের গঙ্গা নদী। তৃতীয় বেণী হচ্ছেন সাংখ্যদর্শনের যমুনা নদী। এই সঙ্গমস্থানটীতে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত প্রথমত শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী বেদান্তদর্শনের ঐক্য। দ্বিতীয়তঃ কাপিলসাংখ্য দর্শনের ঐক্য; তৃতীয়তঃ পাতঞ্জলসাংখ্য দর্শনের ঐক্য। দর্শনের ত্রিভাবের ঐক্য।” বৈদিকধর্ম্মে নিষ্পাপ শিশুর প্রকৃতির কাছে দেবশক্তি প্রকাশিত। ঐ দেবশক্তি-গুলির নিকট সরল ভাবে, সকল বলিতে বলিতে জ্ঞান ফুটিল। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সত্য ফুটিল। বেদোপনিষদে ব্রহ্মের সহিত প্রগাঢ় সম্মিলনে যে আনন্দ, তাই মুক্তি। পরে দেব-প্রসাদ-বিমুখ আত্মপ্রভাবান্বিত জ্ঞানের গতি হল রসাতলের দিকে। ব্রহ্মের প্রসাদাৎ যে বলবীর্য্য, তারও অধঃপতন হল, মন্দ দিকে গেল। জ্ঞান ও ধর্ম্মই বল ছিল। এখন দেহ-বলই বল বলে গণ্য হল। পৌরাণিক ইতিহাসে ভারতে তিনবার এইরূপ বাহুবলকে খর্ব্ব করে জ্ঞানবলকে, ধর্ম্মবলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সত্যযুগে পরশুরাম, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্থবার এলেন শ্রীবুদ্ধ। তিনি যাগযজ্ঞের, অভ্রান্ত শাস্ত্রে ও কল্পিত ভগবানের ধারণাকে ভাঙ্গিলেন। উচ্চনীচভেদ ভাঙ্গিলেন। আত্মপ্রভাবের দ্বারা ইন্দ্রিয়-দমনে নির্ব্বাণ ও বিশুদ্ধতা লাভ, দয়া ধর্ম্ম সাধনের পথ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু ‘ঈশ্বরের’ নাম করিলেন না। কারণ ‘ঈশ্বর’ নামের সঙ্গে এমন সব ভ্রান্ত ধারণা জুটে ছিল, তাই ঈশ্বরের নামই করিলেন না, এবং কোনরূপ ভজনা দিলেন না। মানুষ কিন্তু গম্যস্থানটীর ধারণা করিতে চায়, ‘ঈশ্বর’ চায়, তাঁকে সম্ভোগ করিতে চায়। তাই পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা বুদ্ধকেই ভগবানে পরিণত করিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের তিন স্তরে তিন বুদ্ধের কল্পনা করে, তাতে ভগবানের ১ নিত্যতা ২ সর্ব্বজ্ঞতা ৩ ক্লেশবাসনা-নির্লিপ্ততা যুক্ত

করিলেন। বুদ্ধ একই; উপাধি-ভেদে ভিন্ন। এই ভাবে জীবেশ্বরের ঐক্য সম্পাদন করলেন। যার থেকে শাঙ্কর-দর্শনের অদ্বৈতবাদ। কাপিলসাংখ্যের মত নিরীশ্বর এবং ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। জীবের পরম পুরুষার্থ পাতঞ্জল-সাংখ্যের মত পথ হইতে alternative রূপে ক্লেশ বাসনা নির্লিপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কারণ মনে করিয়াছেন যে, একজন সর্ব্বজ্ঞ আদি গুরু দরকার। আবার দক্ষযজ্ঞের অবতারণা করে দেখিয়েছেন, সাংখ্য-দর্শন যেমন ছদ্মবেশী বৌদ্ধ-দর্শন, বুড়াশিব তেমনি ছদ্মবেশী আদি-বুদ্ধ। বেদের 'ব্রহ্মার' স্থানে এখন 'শিব' প্রতিষ্ঠিত হল। পুরাণাদিতে ব্রহ্মার পূজার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। ব্রহ্মা যেমন 'বেদের' আদিগুরু, শিব তেমনি 'তন্ত্রের' আদি গুরু। এইখানে 'বৌদ্ধতন্ত্র' ও 'পৌরাণিক তন্ত্রের' মিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক আঁকজোঁকের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের আঁক-জোঁকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিল আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে আত্ম-প্রভাবের উপর নির্ভর, তন্ত্রে ইহাই যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধির চেতনা। উপায়টীও কৃত্রিম। তাঁহারা বিকারের হেতু সম্মুখে আনয়ন করিয়া মনের উপর আত্যন্তিক জয়-লাভের অভিপ্রায়ে রিপুগণের সহিত প্রকৃতির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কালী দুর্গা প্রভৃতি তন্ত্রের উপাস্য দেবতা সাংখ্যের নিরীশ্বর রূপ। কিন্তু ভুলিয়া গেলেন যে, পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইলে দুই পায়ে চলা প্রয়োজন। ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা চিত্তের ভাবগতি এবং লক্ষ্য উপরের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া চাই; আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রভাবরূপী প্রহরীকে দিয়া নীচের প্রবৃত্তি সকল প্রতিরোধ করা চাই।"

"বৌদ্ধধর্ম্মের ঈশ্বর-বিহীন জগৎ। সাংখ্য দর্শনের ঈশ্বর-হীনা প্রকৃতি। শাক্তধর্ম্মের কালী। এই তিনটীই বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ—বেদান্ত দর্শনের তুরীয়াবস্থাপন্ন পুরুষ—শৈবধর্ম্মের উদাসীন ভোলা মহেশ্বরের অপভ্রংশ। আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হল বৌদ্ধধর্ম্মের সাত্বিক অংশ—অহিংসা, দয়া, প্রেম, ভক্তি, শুদ্ধাচার, বিনয়, নম্রতা। বৌদ্ধধর্ম্মের আত্মপ্রভাবই

পৌত্তলিকতার মূল। (ক) মানুষের মহাপৈত্রিক সংস্কার যে ঈশ্বর-দত্ত জ্ঞান; তাহার উপরে লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইল; নিজ-হস্ত-রচিত ও মনঃ-কল্পিত কারিকরীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির আতিশয্য। (খ) বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে, তাতে এক আনাও বিশ্বাস নাই, কিন্তু জোর করে আনা কৃত্রিম বিশ্বাসের স্তোকবাক্যে মনকে প্রবোধ দিয়া মূর্ত্তি-পূজার নাট্যাভিনয় করেন।"

১৬। 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯০১)

—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই সি এস্

১৩০৭ সনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতাটি ঐ বছরেই সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশ করেন। সেই বক্তৃতা অবলম্বন করে, সে সময়ে প্রকাশিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলীর তথ্য নিয়ে ১৩০৮ সনে (১৯০১) তিনি 'বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' বইটীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। শেষ জীবনে আরো অনেক পরিবর্ত্তন ও নূতন তথ্য সংযোগ করে বইটির নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও জামাতা প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৯২৩ খৃঃ নূতন সংস্করণটি প্রকাশ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র, ১৮৪২ খৃঃ জোড়া-সাঁকোয় তাঁর জন্ম ও ১৯২৩ খৃঃ কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনিও হিন্দু কলেজের ছাত্র। সেখানে তিনি কেশবচন্দ্রের সতীর্থ ছিলেন। দুজনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। এঁর সঙ্গেই কেশবচন্দ্র প্রথমে মহর্ষির কাছে যান ও এঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি যখন সিংহল-ভ্রমণে যান, ইনি ও কেশবচন্দ্র মহর্ষির সঙ্গে ছিলেন। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে' ব্রহ্মানন্দ ও মহর্ষিদেব বক্তৃতা দিতেন। মহর্ষির বক্তৃতাগুলি সত্যেন্দ্র-নাথ লিপিবদ্ধ করে রাখেন ও পরে বইএর * আকারে প্রকাশ করেন। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথের মত মহর্ষিকে ব্রাহ্মসমাজের সব কাজে

* 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস'।

সাহায্য করতেন। সেই সঙ্গে ব্রহ্মানন্দও মহর্ষিদেবকে সব কাজে সাহায্য করতেন, কিন্তু তাঁর কাজ ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি ছিলেন দ্রষ্টা ও শিল্পী ; সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' বইটিতে বলেছেন—"কেশবের আগমনে আমাদের সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হ'ল। ব্রাহ্মসমাজের সেই মধ্যাহ্ন কাল ; —কেশবের প্রভাবে সমাজ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করলো। আমিও সেই উৎসাহ-তরঙ্গে গা ঢেলে দিলুম।"

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬২ খৃঃ সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত যান ও প্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ন হয়ে আসেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন কাজ করেন ও বোম্বাইএর ভাষা, কৃষ্টি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। তাঁর 'বোম্বাই চিত্র' (১৮৮৯) বইটীতে ও অন্যান্য রচনার ভিতর তার পরিচয় আমরা পাই। ইঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। ইনি শেষ দিন পর্য্যন্ত নানারকম উৎকর্ষ, অধ্যয়ন, গ্রন্থরচনা, দেশসেবা, ব্রাহ্মসমাজ এবং বম্বে প্রার্থনা-সমাজের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তিনি অনেক সময় রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সঙ্গে থাকতেন। ইনি ভাল উপাসনা করতে পারতেন। সুমিষ্ট আবৃত্তি করে বয়স্ক, অল্প-বয়স্ক সকলকেই আনন্দ দান করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের রচিত সুন্দর সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত আছে। 'হিন্দু মেলার' জন্য তিনি সর্ব্ব-প্রথম জাতীয়সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়' গানটী রচনা করেছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ ইনি 'গীতার' পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন, ১৯০৭ খৃঃ তুকারামের দোঁহা, পার্সি, বৌদ্ধ, সুফি, উপনিষদ ও গীতার বাক্য সঙ্কলন করে 'নব রত্নমালা' বইটি প্রকাশ করেন। বইটির দুটি সংস্করণ হয়। কিন্তু খৃষ্টের কোন বাণী এতে দেননি। ১৯০৯ খৃঃ ইনি মহর্ষির 'আত্মজীবনী'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খৃঃ 'আমার বাল্যকথা ও বাল্যপ্রবাস' বইটী প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের কত সাদৃশ্য ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি

সাহিত্য-পরিষদের বক্তৃতায় বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ভেতর থেকেই প্রকাশ করেছিলেন। তার ভিতর তথ্যসংগ্রহের ভাব বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের রেখামাত্র দেখা যায় না। বুদ্ধের প্রদর্শিত বিশুদ্ধ নীতিমার্গ, তাঁর ধর্ম্মচক্র, জটীল কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণের আধিপত্যের অপকার, সমাজের দুর্গতি ও বুদ্ধের প্রতিবিধান, স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক আচরণে শুদ্ধতা রক্ষা, বুদ্ধের দৈনিক জীবন—প্রত্যূষে স্নান, তারপর ধ্যান, তারপর ভিক্ষুকের মত বসনত্রয় পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ৮।১০ ক্রোশ পায় হেঁটে ধর্ম্মপ্রচার ও প্রয়োজনীয় ভিক্ষা গ্রহণ, ধর্ম্মপ্রচারের সময় ঘরে ঘরে গিয়ে সমবেত লোকজনকে কি ভাবে উপদেশ ও ব্রত দীক্ষা দিতেন, এই সব কথা সত্যেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় জানতে পাই। বুদ্ধদেব একটী উপদেশ বারংবার দিতেন—"সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ। বুদ্ধের উপদেশ-লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না।" সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তিনি কখন কখন স্নান করতেন। তারপর নিজের ঘরে বসতেন। সেখানেও আশ-পাশের গ্রাম বা নগর থেকে লোকজন ধর্ম্মোপদেশ নেবার জন্যে তাঁর কাছে আসতেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত এই রকম চলত। অবশিষ্ট রাত্রি তিনি কতক ধ্যানে, কতক নিদ্রায় কাটিয়ে আবার পরদিন প্রত্যূষে উঠে, কি উপায়ে লোকের দুঃখ-মোচন ও কুশল বর্দ্ধন করবেন, তার বিষয় স্থির করতেন। এই নিয়ম আর ব্রাহ্মপ্রচারকদের দৈনিক নিয়মের কত সাদৃশ্য! শেষ উপদেশে তিনি আনন্দকে বলেন—

"দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিদ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া ধর্ম্মপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে।...পরে যখন সত্য জ্যোতিঃ সংশয়-মেঘ-জালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন।"

তারপর তিনি প্রশ্ন করেন—"বুদ্ধের প্রতি কাহারো কিছু সন্দেহ আছে কিনা।" তদুত্তরে আনন্দ কহিলেন—"গুরুদেব! আশ্চর্য্য এই যে, এত লোকের মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল। কাহারো তিল মাত্র সংশয় নাই।" বুদ্ধদেব ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"যার জন্ম, তার ক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে। তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তি সাধন কর।"

এই কয়েকটি কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ-রাজ্যে প্রয়াণ করেন।

১৬। 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' (১৩০৭ সাল ১৯০০ খৃঃ)

—কালীবর বেদান্তবাগীশ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৭ সালের বিশেষ অধিবেশনে কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই বক্তৃতাটি পাঠ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমৎ শঙ্করের পরিচয় দেন এবং তাঁকে কেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা যায় না, তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেন।

কালীবরের নাম আজকাল বিশেষ শোনা যায় না, কিন্তু ১৮৬০-১৯১২ খৃঃ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী বাংলা সাহিত্য তাঁর শাস্ত্রীয় আলোচনায় ও শাস্ত্রগ্রন্থানুবাদে খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পরের এবং পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের আগের মানুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে যথার্থ পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, ভূমিকার স্বচ্ছ চিন্তা ও সঠিক পাঠের জন্য তাঁর সংস্করণ সাঙ্খ্যদর্শন, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়দর্শন প্রভৃতির এত আদর। তিনি উদার ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু যে শাস্ত্রের যা প্রকৃত অর্থ, তা গ্রহণ করার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচনায় তিনি এই ভাব প্রকাশ করেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিকাশে যোগ্য পণ্ডিতদের স্থান বরাবর দেখা যায়। রাজা রামমোহনের সময় শিবরাম মিশ্র, হরিহরানন্দ স্বামী ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; মহর্ষির সময় অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও লালা হাজারিলাল; ব্রহ্মানন্দের সময় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী ও ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ীর নাম পাওয়া যায়; পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁর Intellectual Ideal বক্তৃতা প্রস্তুত করার জন্য একটী খাতায় কালীবরের 'শঙ্কর শারীরক ভাষ্য' লিখে রেখেছিলেন। খাতাটী এখনো আছে। ঐ খাতাটী দেখেই কালীবরের বিষয় জানবার জন্যে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হয় এবং সন্ধান করতে থাকি। তিনি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তার কথা সহজেই জানতে পারি; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও অনেকদিন আমি তাঁর জীবনকথা জানতে পারিনি। একদিন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে 'নব্যভারতের' একটি প্রবন্ধের * সন্ধান পাই। ঐ প্রবন্ধে যা পাওয়া গেল এবং আরও যা জানতে পেরেছি, একত্রে নিবদ্ধ করলাম।

নব-অধ্যয়নের প্রধান কথাই হল জীবন দিয়ে জীবনের অধ্যয়ন, জীবন দিয়ে শাস্ত্র ও দর্শনের অধ্যয়ন। কালীবরের দর্শন-শিক্ষার বিশেষত্বও তাই। তিনি এই 'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' প্রবন্ধের এক অংশে লিখেছেন—

"যাহারা কৌতুক-নিবৃত্তির জন্য বেদান্ত পড়ে, অথবা যাহারা বিদ্যাখ্যাতি বিস্তারের জন্য বেদান্ত পড়ে, তাহারা কোনরূপ দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু যাহারা তদুপদিষ্ট পথে চলিবার জন্য পড়ে, তাহারা অল্লাধিক দৃষ্ট উপকার পায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। শোক, সন্তাপ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য,

* 'স্বর্গীয় কালীবর'—আনন্দগোপাল ঘোষ. (নব্যভারত, আশ্বিন ১৩১৯)।

আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শ তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় আক্রমণ করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় তাহাই তাহাদের দৃষ্ট উপকার।”

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মহৎ চরিত্রের জন্যই কালীবরের বিশেষ আদর হয়েছিল। অনুমান ১৮৬৪-৭০ খৃঃ যখন তাঁর বয়স মাত্র ২০।২২, তিনি কাশী রাজসভায় ‘বেদান্তবাগীশ’ উপাধি পান। সে সময়ে নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুর কাশীতে ছিলেন। জানা যায় যে, তিনি তাঁর কাছে সেই সময় কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীরামপুরের দে-বাবুরা যখন মহাভারতের সটীক নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন তার সম্পাদনার ভার তাঁকেই দেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে তিনি ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় সাংখ্যদর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যখন সংস্কৃত মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ কার্য্য হাতে নেন, কালীবরই সেই কাজ সুসম্পন্ন করেন। কাশীমবাজারের রাণী আর্ণাকালী দেবী বহরমপুরে জুবিলী টোল নামে একটী চতুষ্পাটী খোলেন এবং কালীবরকেই আহ্বান করেন ও তিনি সেখানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁকে ঐ সময়ে চার বছরের জন্য বেদান্তের পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। হুগলীর সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ‘সঙ্গীত-রত্নাকর’ ও ‘সঙ্গীত-পারিজাত’ নামে দুটি পুঁথি তাঁর সাহায্যে সম্পাদনা করেন। ‘সারস্বত সমাজে’ পরিভাষা নির্ব্বাচনের কাজে কালীবর প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভবানীপুরের ভাগবত চতুষ্পাটীতে তাঁকেই অধ্যাপক-পদে বরণ করা হয়েছিল।

‘সারস্বত সমাজের’ কথা আমরা আগেই বলেছি। তাঁদের সাহিত্য-সাধনায় ব্রহ্মানন্দদলেরও যোগ ছিল। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়কে তার প্রথম যুগ্মসম্পাদক করা হয়েছিল। Liberal পত্রিকা থেকে এই বিষয়ে একটী বিবরণ উদ্ধৃত করা হ’ল—

"Pursuant to announcement a meeting of the well known literary men of Calcutta was held at the residence of the Chief Minister of the Adi-Brahmo Somaj at Jorasanko, on Sunday last at 4-30 P.M. There were present among others Dr. Rajendra Lala Mittra, Rajah Sourindra Mohun Tagore, Rai Kanai Lal Dey Bahadoor, Babus Bankim Chandra Chatterjee, Hem Chandra Banerjee, Krishna Komul Bhattacharjya, Dijendra Nath Tagore, Sanjib Chandra Chatterjee, Raj Krishna Mookerjee, Jogendra Nath Ghosh, Chandra Nath Bose, Akhai Kumar Sarkar, and Hara Prasad Shastri. The object of the meeting was to organise an academy of Bengali literature, the object of which, as defined in the prospectus, will be to coin scientific terms, to review the latest works in Bengali on literature and science, supply proper canons of criticism and standards of taste, and further by all legitimate methods the symmetrical development of the vernacular language. Dr. Rajendra Lala Mitra was by general consent voted to the chair. The proceedings began by an introductory speech from the learned gentleman. He began by pointing out in how many different ways the society could find work for itself. There was, for instance the question of spelling. It was for the members to decide whether there were any redundant letters in the alphabet and how far the letters were generally used to express the sounds which they represented. Some one had declared his opinion that there were properly speaking no long and short vowels in Bengali, and this question should be decided. Then there was the important problem of spelling proper, including in this term, also geographical names. Take Victoria for instance; should v be represented by bh or v as the latter is represented in Sanskrit? Most writers in Bengali use bh, thus sacrificing a letter which already exists to express the v sound. The translation of technical terms came next, and the society had before it the tough and difficult task of settling the principles on which they were to be rendered,—whether, and

if so, to what extent, should we keep foreign terms and how much should we stick to purism in the use of scientific words. These and many such problems would present themselves before the society, and he had no doubt that if the members went to their task with a will and serious determination to benefit the national literature, they would do something to recommend their labours to the appreciating notice of their countrymen.

The objects of the society were then discussed and generally defined. The name gave rise to some discussion. Five names were proposed, and after a ballot the "Swaraswat Somaj" was accepted by the majority. The subscriptions were declared to be Rs. 6/- yearly for a member and Rs 100/- for any who chose to be a Life Member. The following gentlemen were then appointed office-bearers:—Dr. Rajendra Lala Mitra, President; Rajah Sourindra Mohun Tagore, Babu Bankim Chandra Chatterjee and Babu Dijendra Nath Tagore, Vice-Presidents; Babus Rabindra Nath Tagore and Krishna Bihari Sen*, Honorary Secretaries. The discussion of other rules was postponed. With thanks to the chair the meeting broke up."

—Liberal and the New Dispensation, July, 23, 1882

তাঁর 'যোগশাস্ত্র' সম্পাদনার জন্য কলিকাতার 'যোগ-সমিতি' তাঁকে সম্মানিত করেন। সেই সভায় ছোটোলাট বাহাদুর নিজে তাঁর গলায় স্বর্ণ-পদক পরিয়ে দেন। পাণ্ডিত্য ছাড়া, তাঁর গুণও ছিল অনেক। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিশুদ্ধ চরিত্র, সদ্ব্যবহার, সকলের প্রতি সমব্যবহার, অভিমানশূন্যতা ও সরল প্রকৃতি সকলকে মুগ্ধ করতো। বাল্যকাল থেকেই তাঁর রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শিক্ষার সঙ্গে ঐ শক্তি খুবই বিকশিত হয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বহু প্রবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায়, যথা, রহস্য

* 'Romance of Language' by Krishna Bihari Sen, M. A.

সন্দর্ভ, আর্য্য দর্শন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী, নব্য ভারত, বঙ্গদর্শন, অনুসন্ধান, পুরোহিত, উপাসনা, সাহিত্য, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, প্রচার, প্রবাহ (প্রথম সময়ের), সাধনা, ভারতী, বান্ধব ও অঙ্কুর।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন 'হিন্দুশাস্ত্র' সংগ্রহ প্রকাশ করেন (১৮৯৫-৯৭), তখন কালীবরের উপর ষড়্ দর্শনের সঙ্কলনের ভার দেন। বইটী প্রকাশিত হলে রমেশচন্দ্র ভূমিকায় লেখেন—

"এই ভাগের সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় অত্যধিক শ্রমস্বীকার করিয়াছেন এবং প্রুফ-সংশোধনাদিও তিনি করিয়াছেন। এইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তিনি বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে প্রাচীন হিন্দুদর্শন-বিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমাকে যারপর নাই অনুগৃহীত করিয়াছেন।"

১২৪৯ সালে (১৮৪৬ খৃঃ) ২৪ পরগণায় পুঁড়াগ্রামে তাঁর জন্ম ও ১৩১৮ আশ্বিন (১৯১২ খৃঃ) তাঁর মৃত্যু। তাঁর তুই পুত্র ও এক কন্যা। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি যাজক ছিলেন। তাঁর কিছু দেবোত্তরও ছিল। কালীবর তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। বাল্যেই তাঁর প্রতিভা চোখে পড়ে। ১০ বৎসর বয়সের ভিতর তিনি পাঠশালায় সমস্ত ব্যাকরণ পাঠ শেষ করেন। তারপর তাঁর উপনয়ন হয় ও তিনি পিতার কাছে যাজন কাজ শেখেন। ১৬ বৎসর বয়সের ভিতর তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কয়েকটী স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। ঐ সময় কিছুদিন তুটী কীর্ত্তনের দলে যোগ দিয়ে, তাদের জন্য তিনি গান ও ছড়া রচনা করতে থাকেন। কিন্তু পড়াশুনার ক্ষতি হওয়ায়, তিনি ঐ কাজ ছেড়ে, বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে যান। পুঁড়ার উমানাথ রায় মহাশয় ও বহরমপুরের স্বনামধন্য ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে তিনি ছয় বৎসর কাশীতে থাকেন ও এক চতু-ষ্পাটীতে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ঐ সঙ্গে শুনে শুনে

অন্য শাস্ত্রও আয়ত্ত করেন। পাঠ শেষ করে কাশীর রাজকীয় পণ্ডিত সভার পরীক্ষায় তিনি প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ও 'বেদান্তবাগীশ' উপাধি পান। কাশীরাজের সভাপণ্ডিতদের সঙ্গে ১৮৬৯ খৃঃ স্বামী দয়ানন্দের মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে বিচার হয়েছিল। তার ভিতর পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন একজন ছিলেন। তাঁর বেদান্তদর্শন মতের অনুসরণ করে কালীবর 'পরমাণুবাদ খণ্ডন' নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তিনি আরেকটী প্রবন্ধে ঐ সমালোচনা খণ্ডন করেন। ঐ প্রবন্ধের যুক্তি ও পাণ্ডিত্যে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যথা, বেদান্তদর্শন টীকা, ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ ১৯০০, বশিষ্ঠ মহা-রামায়ণ সটীক বঙ্গানুবাদ ১৮৯২, ন্যায়দর্শন ১৩১৩, সাঙ্খ্যদর্শন ১৮৭৭, পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ পরিশিষ্ট ১২৯১, ভগবদ্গীতা সংক্ষিপ্ত সানুবাদ ১৮৯৭ খৃঃ, মহাভারতম্ ১৮৭০-৮৪ খৃঃ, সটীক সাঙ্খ্যসূত্রম, সটীক পাতঞ্জল সূত্রম্ ১৯১১, সটীক বেদান্ত সংজ্ঞাবলী ১৯০০, সনৎ সুজাতীয় ভাষ্য ১৮৯৬, গুরুশাস্ত্র, আত্ম-রামায়ণ, বেদান্তসার ১৯০২, সংকর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, চরিত্রানুমান বিদ্যা ১২৯১, তান্ত্রিক চিকিৎসা ১৩০৯। এই বইগুলি বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকের অর্থ-সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অনেকগুলির দু-তিনটী সংস্করণ হয়েছে। 'চন্দ্রকোষ' ও 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' নামে দুটী সংস্কৃত অভিধান তিনি প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ঐ দুটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নি।

'শঙ্কর ও শাক্যমুনি' বক্তৃতার কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল।

"বুদ্ধ-পুরাতন ও দর্শন-শিরোমণি বলিয়া পূজিত ব্রহ্মসূত্রের উপর উৎকৃষ্টতম ভাষ্য রচনা করিয়া মহাবুদ্ধিধর শঙ্কর ইহলোকে কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এতদীয় 'শারীরক' নামধেয় ভাষ্য ব্যাপক-সমাজে এত আদৃত এবং তাহার উচ্চতা বা শ্রেষ্ঠতা এত অধিক যে, শারীরক ভাষ্য না পড়িলে যেন বেদান্ত পড়া সিদ্ধ হয় না। ছাত্রেরা যতই

ভাষ্য পড়ুন না কেন, একমাত্র শারীরক পাঠের অভাবে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।”

“একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা ও পতনোন্মুখতা, অপর দিকে কর্ম্মপ্রধান বৈদিক ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব, এই দু-এর সন্ধি-সময়ে বা সংঘর্ষ-সময়ে মহাপুরুষ শঙ্কর যেন মাধ্যস্থ অবলম্বন করিয়া দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করিলেন।”

“ইঁহার সেই পুণ্যাশ্রমে (নর্ম্মদাতীরে) অনেক লোক থাকিত। কেহ যোগ শিক্ষা করিত, কেহ বা কেবল তপস্যা করিত। নবাগত শঙ্কর ইঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলে, যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথ শঙ্করকে “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “অহং ব্রহ্মাস্মি” “তত্ত্বমসি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্য চতুষ্টয় উপদেশ করিলেন এবং শঙ্করও উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুসকাশে বাস করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ইঁহারই নিকট ব্যাসকৃত শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব ও অদ্বৈতমতের পূর্ণ-ব্যাখ্যা বিদিত হন।”

“যে অংশে এখন সারনাথ নামক বন্যস্থান ও ইতরলোকের বাসস্থান, শঙ্করের সময়ে সেই অংশে প্রাচীননগরের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৌদ্ধগণ ঐ অংশে নগর স্থাপন করিয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করও এবার ঐ অংশে থাকিয়া যতিধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিবার কামনা করিলেন।”

“শঙ্কর শিষ্যসহ উক্তস্থানে বাস করিয়া প্রথমতঃ তত্রস্থ যোগীদিগের ও বিবেকীদিগের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও শব্দ-তাৎপর্য্যাদি আলোচনা করিলেন। পরে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর উৎকৃষ্ট ভাষ্য রচনা করিলেন।” “(তৎপরে) তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক···দশ উপনিষদের প্রসন্নগম্ভীর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে মহাভারতের সারস্বরূপ ভগবদ্গীতার, সনৎসুজাতীয় অধ্যায়ের ও বিষ্ণু-সহস্র-নামের ভাষ্য রচনা করিলেন। তদ্ভিন্ন নৃসিংহ তাপনীয় ব্যাখ্যা ও মুমুক্ষুদিগের পাঠোপযোগী উপদেশসাহস্রী, আত্মানাত্মবিবেক, মহাবাক্যরত্নাবলী, কতকগুলি শতক, কতকগুলি বিবেক,

কতকগুলি অষ্টক, প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তক অদ্যাপি পঠিত হইতেছে। শঙ্করকৃত শিব, বিষ্ণু, গণেশ ও দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর স্তোত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই স্তোত্র দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ গাণপত এবং কেহ বা সাকারোপাসক ভাবিয়া পরিতুষ্ট হন।"

"পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইলে, অমন যে রমণীয় বদরীবন, তাহাও তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচার ও তৎকালিক দুষ্ট মত সকল নিরাস করিবার জন্য ব্যগ্রচিত্ত হইলেন।"

"মহাপুরুষ শঙ্কর এইরূপে নানাদেশে (কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মাহিষ্মতীনগর (নর্ম্মদাতীরে), গোকর্ণ, হরিহরালয়, মূকাম্বিকাভবন, শ্রীবলী-ক্ষেত্র, রামেশ্বর, রামনাথ, দ্রাবিড়, কাঞ্চী, কর্ণাট, সৌরাষ্ট্র, দ্বারকা, দ্বারাবতী, অবন্তীনগর, কামরূপ, অঙ্গদেশ, গৌড়মণ্ডল, কাশ্মীরমণ্ডল, প্রভৃতি) যতিধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া ও নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়া, বয়সের বত্রিশ বৎসর সমাপ্তে ব্যাসাবাস বদরীবনে যোগাবলম্বনে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

"মধ্যে মধ্যে আমার মনে শঙ্করের সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্কের উদয় হয়, সেগুলি এতৎপ্রসঙ্গে ব্যক্ত করি।

১। শঙ্করের আবির্ভাবে তাৎকালিক ধর্ম্মজগতের অথবা সাহিত্য-সংসারের কোনরূপ উপকার, অপকার হইয়াছিল কিনা?

২। শঙ্করের পূর্ব্বে আর কেহ অদ্বয়বাদী ছিলেন কিনা?

৩। শঙ্করকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে, তাহাই বা কেন বলে?

এই তিন বিতর্ক আমার মনোমধ্যে যখন যখনই উঠে, তখন তখনই আমি পশ্চাদুক্ত চিন্তায় বা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যথা—

১। বৌদ্ধেরা এ দেশকে প্রায় ঈশ্বরভাব-বর্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, শঙ্করের আবির্ভাবে সে ভাবের অপগম

অর্থাৎ ঈশ্বরাস্তিকতা পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অধঃপাতিত ও বিধ্বস্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, শঙ্করের আবির্ভাবে তাহার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষাকে নষ্টকল্প করিবার চেষ্টা করিতেছিল, পালি প্রভৃতি অপভাষাদ্বারা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। কুমারিল, শঙ্কর ও বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে তাহার অঙ্গপুষ্টি ও বিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছে। অবিশ্রান্ত কর্ম্ম, নিরন্তর সংসারাসক্তি, এবং চিরকালের মত কর্ম্মত্যাগ, এ সকলের সমাবেশ প্রণালী শঙ্কর মহামতির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সকল যদি উপকার বলিয়া গণ্য হয়ত, উপকার হইয়াছে এবং অপকার বলিয়া গণ্য হইলে অপকার হইয়াছে। আমি যখন যখনই বেদান্তের অধিকারি-নির্ব্বাচন-বিভাগ পর্য্যালোচনা করি, তখন তখনই আমার মনে হয়, বেদান্তের এই বিভাগটী নীতি-বিশেষ। বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, অন্যান্য নীতি মাত্র সমাজকে সুশৃঙ্খলে চালাইবার চেষ্টা করে; পরন্তু এ নীতি মনুষ্যের শরীর-বাস ও পৃথিবী-বাস উভয়বিধ বাসকে নির্ব্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, নিরুদ্বেগ ও দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা করে। নীতি শব্দের অর্থ কি? এতৎ প্রসঙ্গে আমার এইরূপ মনে হয়, যাহা যাহা মানুষকে ঈশ্বরের, প্রকৃতির, কালের অথবা স্বভাবের হিতকর আদেশের অধীনস্থ রাখিয়া সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তাহা তাহাই নীতি। এ লক্ষণ আমি বেদান্তের অধিকারী নির্ণয় বিভাগে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। তাই আমি বলি, বেদান্তও নীতি-বিশেষ। সুতরাং ইহলোকেরও সুখস্বচ্ছন্দতার নেতা।···আমার বিবেচনায়, দার্শনিক জ্ঞানে বিভূষিত হওয়া মনুষ্যত্বের অন্যতম অঙ্গ।

২। শঙ্করের পূর্ব্বে অদ্বয়বাদ—শঙ্করের ধর্ম্মমতই বলুন, আর দার্শনিক মতই বলুন, কিছুই নূতন নহে, সমস্তই পুরাতন। (১) তাঁহার সন্ন্যাস "ন ধনেন ন প্রজয়া, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, (২)

তাঁহার জ্ঞানকারণবাদ "দৃশ্যতে ত্বগ্রায়া বুদ্ধ্যা" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইত্যাদি উপনিষদ্ মূলক, (৩) তাঁহার নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, (৪) তাঁহার নিরাকারবাদ "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বং" "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি উপনিষদ্‌মূলক, (৫) তাঁহার জীব-ব্রহ্মসিদ্ধান্ত "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক। (৬) তাঁহার একজীববাদ "স ঐক্ষত বহুস্যাং" ইত্যাদি বেদ-মূলক, (৭) তাঁহার মায়াবাদ "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি বেদমূলক, (৮) তাঁহার অভিন্ন নিমিত্তোপাদানবাদ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" ইত্যাদি শ্রুতিমূলক, (৯) এবং তাঁহার জগন্মিথ্যাত্ববাদ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ইত্যাদি উপনিষদ-মূলক। অধিক কি বলিব, শঙ্করের এমন একটীও কথা নাই, যাহা অবৈদিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাই আমার বিশ্বাস—শঙ্করের ধর্ম্মমত ও দর্শন প্রাচীন ধর্ম্মমতের ও দর্শন পরিপাটীর বিস্তৃতিমাত্র।

৩। শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে কেন? "মায়াবাদমসৎ শাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" "ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা" শ্লোকটীর মূল্য কি? প্রামাণ্য কিরূপ? তাহাও জানি না। আমি মাত্র এই বুঝি যে, ব্যাসের পুরাণে বুদ্ধের ও শঙ্করের মতোল্লেখ তত অসম্ভব নহে, নামোল্লেখ যত অসম্ভব। যাহাই হউক, অবশ্য কোন না কোন কারণ আছে, না থাকিলে ঐ কথা উঠে কেন? কিন্তু সে কারণ আমার অবিদিত। বৌদ্ধেরা বর্ণাশ্রম বিধানের বিরোধী, কিন্তু শঙ্কর তার অনুরোধী। বৌদ্ধেরা দেবদেবী পূজার নিষেধক, কিন্তু শঙ্কর তাহার বিধায়ক। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ ব্যবস্থার বিপক্ষ, শঙ্কর তাহার সপক্ষ। বৌদ্ধদিগের নীতি ও আচার অবৈদিক, শঙ্করানুমোদিত নীতি ও আচার বৈদিক। এইরূপ দর্শনাংশেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—শঙ্কর বলেন আকাশ প্রথম ভূত,

কিন্তু বৌদ্ধ বলেন "আবরণাভাবোহিআকাশঃ", আবরণের অভাবকেই আমরা আকাশ শব্দে ব্যবহার করি সত্য, পরন্তু আকাশ কোন তত্ত্ব বা পদার্থ নহে। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনে আকাশ অভাব পদার্থ, পরন্তু শঙ্কর দর্শনে উহা ভাব পদার্থ। বৌদ্ধ দ্বিপ্রমাণবাদী, প্রত্যক্ষ ও অনুমান; কিন্তু শঙ্কর ষট্-প্রমাণবাদী—প্রত্যক্ষ, অনুমান. উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। শঙ্কর বলেন, জগৎ প্রপঞ্চ পাঞ্চভৌতিক, বৌদ্ধ-বিশেষ বলেন, জগৎপ্রপঞ্চ চতুর্ভৌতিক। বৌদ্ধ স্বভাব-কারণবাদী; শঙ্কর ব্রহ্মকারণবাদী; বৌদ্ধের অভিমত স্বভাব-জড়শক্তিবিশেষ। শঙ্কর বলেন, আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার পদার্থ, বৌদ্ধ বলেন আত্মা সবিকার পদার্থ। শঙ্কর বলেন, আত্মা নিষ্ক্রিয়, বৌদ্ধ বলেন, সক্রিয়। বৌদ্ধ-অহংজ্ঞানকে আত্মা বলেন, যে অহংজ্ঞান অনাদি ও নির্ব্বাণ না হওয়া পর্য্যন্ত নবদ্বার গৃহে অবিচ্ছিন্ন শিখার দীপের ন্যায় নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া রূপালোক ও মনস্কাম জন্মায়। রূপালোক শব্দের অর্থ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করা এবং মনস্কাম শব্দের অর্থ—গৃহীত শব্দ স্পর্শাদির ভালমন্দ বা অনুকূল প্রতিকূল প্রভৃতির বিবেচনা (অনুভব করা)। শঙ্কর বৌদ্ধোক্ত আত্মাকে আত্মা বলেন না, অর্থাৎ অহংজ্ঞানকে আত্মা বলেন না। তিনি বলেন, যাহা ঐ অহংজ্ঞানেরও জ্ঞাতা, সাক্ষী ও প্রকাশক, এবং যাহাদ্বারা উহাদের অস্তিতাব্যবহার সাধিত হইতেছে, সেই চিৎ বা চেতনা নামক পদার্থই আত্মা। বৌদ্ধের মতে অহংজ্ঞান ও আত্ম-চেতনা একই বস্তু; পরন্তু শঙ্করের মতে পৃথক্ বস্তু। শঙ্কর বলেন, অহং একপ্রকার মনোবৃত্তি, সুতরাং জড়; আত্মা তাহার গ্রাহক, প্রকাশক, অস্তিতা-আধায়ক ও সাক্ষীর স্থানীয়। বৌদ্ধমতে আত্মা নানা শরীরে নানা। শঙ্করের মতে সকল শরীরে একই আত্মা জলচন্দ্রের অনুরূপে বিরাজিত। শরীর ও মন প্রভৃতি আধারের ভেদ থাকায় বন্ধ মোক্ষের ও সুখ দুঃখাদি অনুভবের অব্যবস্থা নিবারিত হয়। যে সময়ে শঙ্কর কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে

জনৈক বৌদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বিজ্ঞানবাদে ও বেদান্তবাদে প্রভেদ কি?" শুনিয়া তিনি হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞানবাদী আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া জানে, আর বেদান্তবাদী আত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপী অদ্বয় প্রত্যগভিন্ন ও নিত্যশুদ্ধ স্বভাব বলিয়া মান্য করে। বিজ্ঞানবাদীরা নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ নিরাশ্রয় ভ্রম মান্য করে আর, বেদান্তী পরব্রহ্ম নামক অধিষ্ঠান মান্য করিয়া তদাশ্রয়ে মায়িক প্রপঞ্চারোপ অস্বীকার করে, এই প্রভেদ। এইরূপ আরোও প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। কেহ কেহ তাঁহার গুপ্তবৌদ্ধতার প্রতি নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১। শঙ্করও অদ্বয়বাদী, বৌদ্ধও অদ্বয়বাদী।

২। শঙ্কর ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর মান্য করেন না।

৩। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের ন্যায় নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেষ্টা।

৪। শঙ্করের দর্শনে ভক্তির উপদেশ নাই।

৫। শঙ্কর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগৎকে নাই বলেন বা বুদ্ধের ন্যায় মিথ্যা বলেন।

প্রথম কারণ :—শঙ্করের অদ্বয়বাদ ও বৌদ্ধের অদ্বয়বাদ এক নহে। শঙ্করের অদ্বয়বাদ ব্রহ্মসত্তাবশেষিত, বুদ্ধের অদ্বয়বাদ শূন্যাবশেষিত।

দ্বিতীয় কারণ :—শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের ন্যায় সাকারবাদী নহেন। তাদৃশ্য নিরাকারবাদ কারণে যদি তাঁহাকে গুপ্তবৌদ্ধ বলিতে হয়, তাহা হইলে জৈমিনি, কপিল, কানাদ ও গৌতম প্রভৃতি ঋষিবৃন্দকে গুপ্তবৌদ্ধ না বলি কেন? ঐ সকল দর্শনকার ও শঙ্কর যে কারণে ঈশ্বরের বিগ্রহ অস্বীকার করেন, সে কারণের বর্ণনা বিস্তৃত প্রবন্ধ সাপেক্ষ।

তৃতীয় কারণ :—শঙ্কর বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণবাদী। কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে-নির্ব্বাণ বৌদ্ধের, সে-নির্ব্বাণ শঙ্করের নহে। শঙ্করের নির্ব্বাণ স্বতন্ত্র। বৌদ্ধেরা দীপ নির্ব্বাণের দৃষ্টান্তে, নিবিয়া যাওয়া অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহার করেন। শঙ্কর "নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং" ইত্যাদি দৃষ্টান্তে মনোবৃত্তি সম্পর্ক বর্জ্জিত

অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ প্রয়োগ করেন। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে অহংজ্ঞানরূপ দীপের বিনাশে শূন্যতাপত্তি, শঙ্করোক্ত নির্ব্বাণে চিত্তবৃত্তির অনুরঞ্জন অভাবে আত্মার নির্ব্বিকার সুখরূপতাপত্তি। অতএব, শঙ্করোক্ত নির্ব্বাণ—

"নির্ব্বেদাদেব নির্ব্বাণং ন চ কিঞ্চিদ্বিচিন্তয়েৎ।
সুখং বৈ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম নির্বেদাদেব গচ্ছতি।"

এই ব্যাসোক্ত নির্ব্বাণের সহিত সমান।

চতুর্থ কারণ—শঙ্করের দর্শনে ভক্তির কথা নাই। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর ঠিক্ এই কথা হইয়াছিল। তাহাতে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, শঙ্কর ঈশ্বরের আদেশে ভক্তিমার্গ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এইরূপ বুঝি যে, শঙ্করের দর্শনে কেন, কোনও দর্শনে ভক্তির কথা নাই।...বেদে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এই ত্রিবিধ উপদেশ আছে। প্রথমে সতত সংসারোন্মুখ চিত্তকে সংযত করা ও তাহার মালিন্য মার্জ্জন করা আবশ্যক বিধায়, প্রথমাধিকারীর প্রতি প্রথমে কর্ম্মকরণের উপদেশ। অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত-বুদ্ধি ও সংযতেন্দ্রিয় মধ্যমাধিকারীর প্রতি উপাসনা করিবার আদেশ। তৎপরে উত্তমাধিকারীর জন্য সপরিকর তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত বৈদিক উপাসনাই বৈদিক কোন কোন কর্ম্মের সহিত মিশিয়া ভজনা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদিক উপাসনা পূর্ব্বে মাত্র সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপারে (ধ্যানে বা চিন্তনে) পর্য্যবসিত ছিল। পুরাণকার ঋষিরা সুগমতার জন্য ব্রহ্মকে মূর্ত্ত ঈশ্বরে আনিয়া, তাহাতে রূপ, লাবণ্য, লীলা, মাধুরী প্রভৃতি যোগ করিয়া দিয়াছেন। সেইজন্যই আমরা ভক্তির বহিরঙ্গে মূর্ত্তি-পরিচর্য্যাদি কায়িক ব্যাপার ও স্তবস্তুতি প্রভৃতি বাচিক ব্যাপার এবং অন্তরে ধ্যান, আনুরক্তি, রসাস্বাদ ও দশানামক সমাধি-বিশেষ প্রভৃতি মানস ব্যাপার দেখিতে পাই। রামানুজ স্বামীও ভক্তিকে উপাসনাবিশেষ বলিয়াছেন। তাই আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী অতি বিশদযুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৈদিক উপাসনা মুক্তির প্রতি যেরূপ কারণ, পৌরাণিক

ভক্তিযোগও সেইরূপ কারণ। উপাসনার ফল মুক্তি নহে কিন্তু একাগ্রতা। ভক্তিরও শেষ ফল ভজনীয় পদার্থে চিত্তের তন্ময়ভাব; মুক্তি নহে। মুক্তি উহার অনেক পরে, তাহা তজ্জনিত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। একাগ্রতা, একতানতা, তন্ময়ীভাব, তদাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তি, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই সমস্তই তত্ত্বজ্ঞান পদাভিধেয় মুক্তিকারণ জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নাম।...এইরূপ বহুকারণে দর্শনকারগণ, বিশেষতঃ শঙ্কর জ্ঞানপ্রাধান্যবাদী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে ভক্তি কর্ম্মবিশেষ; সঙ্গে কতকটা উপাসনার ভাব থাকিলেও কর্ম্ম-বিশেষ; সেজন্য তাহার মোক্ষজনকতায় প্রাধান্য নাই। ...কথা এই যে, দর্শনকারগণ, বিশেষতঃ শঙ্কর, প্রকৃত মুমুক্ষু বৈরাগ্যবান্ অধিকারীদিগের জন্য জ্ঞানযোগের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের দর্শনে ভক্তি-প্রাধান্য স্থান পায় নাই।

পঞ্চম কারণ এই যে, শঙ্কর প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলেন।...তিনি পারমার্থিক সত্যতার নিষেধ ব্যতীত ব্যবহারিক প্রভৃতি সত্যতার নিষেধ করেন নাই; যথা,—

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

অর্থ এই যে, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাবৎ এই সকল লৌকিক ব্যবহার ও ব্যবহার্য্য সমস্তই ব্যবহার দশায় সত্যবৎ হইতে থাকে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানে ব্যবহারাতীত হওয়ার পর এ সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। এ প্রকারের জগন্মিথ্যাত্ববাদ বৌদ্ধাভিমত কিনা, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

অপিচ, শঙ্করের এই দ্বৈতমিথ্যাত্ববাদ সম্বন্ধে আমার মনে অন্য এক প্রকার বিতর্কাদির উদয় হয়। আমার মনে হয়, শঙ্কর দ্বৈতকে মাত্র মিথ্যা ভাবিতে বলিয়াছেন। ...ভাবনার বলে দ্বৈতমিথ্যাত্বে বিশ্বাস করিলে অর্থাৎ তন্ময়ীকৃত হইলে তখন অবশ্যই নিষ্প্রতিবন্ধকে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে।

দ্বৈতমিথ্যাত্ব বোধ করা ব্যতীত অন্য উপায়ে অদ্বৈত উপাসনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না আমার বিশ্বাস।…**শঙ্কর** সত্য সামান্যকে প্রাতীতিক, প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, এই চারি প্রকার বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন, জগতে অন্য প্রকার সত্যতা থাকে থাকুক, পারমার্থিক সত্যতা নাই। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমান থাকে, যাহার ক্ষয়োদয় বা পরিবর্ত্তন কস্মিন্‌কালেও নাই, তাহাই পারমার্থিক সত্য। এরূপ সত্যতা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই নাই।" শঙ্করের ও সমুদায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্ম এই।

১৮। 'মহাপরিনির্ব্বানসূত্র' (বাংলা অনুবাদ) ১৯০১ খৃঃ;
'বুদ্ধদেবের স্থান' (বক্তৃতা) ১৯০৯ খৃঃ

—ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার-সম্পাদিত 'Sacred Books of the East' বইগুলির এক সময়ে খুবই আদর হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' ও কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের 'বুদ্ধদেব চরিত' বই দুইটীতে তার প্রমাণ পাই। নিয়োগী মহাশয়ের প্রথম বইটীও তার সাক্ষ্য দেয়। 'মহাপরিনিব্বাণসূত্ত' ত্রিপিটকের 'সূত্ত পিটকের' দীঘনিকায়ের একটি অংশ। বইটীতে বুদ্ধদেবের শেষ তিন মাসের ঘটনা ও উপদেশ এবং তখনকার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য এবং সংঘ গঠন সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী পাওয়া যায়। Sacred Books গ্রন্থে প্রদত্ত এই বইটীর ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে নিয়োগী মহাশয় তার বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং পরে পালিভাষাজ্ঞদের সাহায্যে মূল পালির সঙ্গেও মিলিয়ে নিয়েছিলেন। অনুবাদটী ভাবমূলক (free translation), অনুপূর্ব্বিক (literal) নয়। অনুবাদের সঙ্গে বইটীতে মূল পালি পাঠ দেওয়া হয়নি, কিন্তু বই প্রকাশের পরে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় মূল পালির কতকাংশ প্রকাশ করা হয়েছিল। বইটীর মুখবন্ধে বৌদ্ধদর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লি একটী ভূমিকা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বইটী নিয়োগী মহাশয়ের একটী বক্তৃতার সার। ১৯০৯-১০ খৃঃ কোন এক ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপ-নিহিত বুদ্ধপূতাস্থি আবিষ্কৃত হয়। সেই ভস্ম রক্ষার জন্য তখন এদেশে আন্দোলন চলেছিল। ঐ বিষয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে' নিয়োগী মহাশয় এই বক্তৃতা দেন।

১৮৫৭ খৃঃ, ঢাকার অন্তর্গত এক গ্রামে, মাতুলালয়ে নিয়োগী মহাশয়ের জন্ম এবং ১৯১৯ খৃঃ পাটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। মাতুল শ্রদ্ধেয় হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের * কাছে ভাগলপুরে এক স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। পরে কলিকাতায় এসে কলেজে ভর্ত্তি হন। অল্পদিন কলেজে পড়ে, ব্যবসা করার জন্য দেশে যান ও সেখানে একটি ছোট ষ্টীমার কিনে, পোড়াবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ফেরী সার্ভিস খোলেন। ঘটনাক্রমে ঝড়ে ষ্টীমারটী ডুবে যাওয়ায় তাঁর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায় ও তিনি আবার মাতুলের কাছে ফিরে যান। মাতুল তখন গয়ায়। তিনি সেখানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা এবং কিছু ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি বাঁকিপুরের একটী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা নিয়ে, সেখানে যান। ভক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয় ব্রহ্মানন্দের দলের একজন বিশিষ্ট সাধক ছিলেন। তাঁর ভিতর বৈষ্ণব সাধনার ও মোসলমান ফকিরী সাধনার সমাবেশ হয়েছিল। বাঁকিপুরেও তখন ব্রহ্মানন্দের অনুগামী শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার, ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়, সাধ্বী অঘোরকামিনী দেবী, ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসাদ মজুমদার, নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ প্রসাদ প্রভৃতি একদল গৃহস্থ সাধক একটী ঘনিষ্ঠ মণ্ডলী গঠন করেছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মাঝে মাঝে সদলে বাঁকিপুরে এসে উৎসব করে, বক্তৃতা করে নূতন উৎসাহের সৃষ্টি করতেন। ব্রজগোপাল ব্রহ্মানন্দকে দেখেছিলেন মাত্র। এখন বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে এই সকল স্বনামধন্য কর্ম্মী ও সাধকদের দেখে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ করার জন্য তাঁর স্পৃহা হয়। ১৮৯৭ খৃঃ তিনি 'নববিধান প্রচারক ব্রত' নেন। তারপর তিনি কলিকাতায় আসেন ও নানান কার্য্যে

* 'ভক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের চরিত কথা'—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু।

যথা—বই লেখায়, পত্রিকা প্রকাশে, বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রচারাশ্রমের কাজে সহায়তা করিতে থাকেন। মহাপরিনির্ব্বাণ-সূত্রের অনুবাদটি তিনি ঐ সময়ে প্রকাশ করেন। বইটীর একটী অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"যদি কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা ধর্ম্মের মূল শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন করে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, অনুশাসনের অনুরূপ আচরণ করে, সেই ব্যক্তি তথাগতের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তথাগতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, তথাগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তথাগতকে উত্তমরূপে পূজা করে। অতএব হে আনন্দ! শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন কর, অনুশাসনের অনুসারে আচরণ কর। হে আনন্দ, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।" ৫।৬

১৯। 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও নির্ব্বাণধর্ম্ম' প্রবন্ধ (১৯০৬-১০ খৃঃ)

—অম্বিকাচরণ সেন, এম্ এ

ব্রহ্মানন্দ প্রদর্শিত পথে সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বা Comparative Religion-এর প্রভাব ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে ও বাহিরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং একটী আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করে, মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের ভিতর অধ্যাপক অম্বিকাচরণ একজন।

১৮৫০ খৃঃ ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের মত্তগ্রামে তাঁর জন্ম ও ১৯১১ খৃঃ কলিকাতায় তাঁর মৃত্যু। তিনি ঢাকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ Royal Cirencester Agricultural College-এ সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করতে যান ও পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ফিরে এসে, এদেশে উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। তিনি দেশভক্ত ছিলেন।

তাঁর 'কৃষি প্রবেশ' বই ও তাঁর তৈরী কৃষিযন্ত্র সে সময়ে খুব আদৃত হয়েছিল। তাঁর পত্নী সুদক্ষিণা দেবীর বাল্যকাল ব্রহ্মানন্দের ভারত আশ্রমে* কেটেছিল। তাঁদের এক কন্যা; ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের সহিত বিবাহ হয়।

১৯০২ খৃঃ থেকে অম্বিকাচরণ বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খৃঃ সরকারী কাজে অবসর নেওয়ার পর তিনি পালি, সংস্কৃত, পেহ্লাবী প্রভৃতি ভাষা রীতিমত শিক্ষা করে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, জেন্দাবেস্তা, বৌদ্ধ শাস্ত্র, হিন্দু দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ব্রহ্মানন্দের কাছে তিনি সমন্বয়-ধর্ম্মের মূল সূত্র লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর উপাসনায় ও বক্তৃতায় উপস্থিত হবার সুযোগ ছাড়তেন না। তিনি ভাল উপাসনা করতে পারতেন। সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর থেকে তিনি সভা সমিতিতে স্বাধীন ভাবে যোগদান করেন। তিনি 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সভার' সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন ও 'বৌদ্ধ সাহিত্য সমিতির' একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। Modern Review, Indian Research Review, Asiatic Society Journal, East (ঢাকার) প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। সেগুলি বইএর আকারে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কবিহারী কর মহাশয় তাঁর জীবন চরিতে তার সংক্ষিপ্ত সার লিপিবদ্ধ করেছেন। তার থেকে আমরা তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের বিষয় মতামত কিছু কিছু জানতে পারি।

তিনি বলেন যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ শব্দটী দুই বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন (১) সকল বস্তুর বিনাশ বা শূন্য (২) দৃশ্যমান জগতের অতীত বস্তু যাহা মনুষ্যকে অমর করে, অকুতোভয় করে, যাহা অজাত, অভূত, অকৃত, অসংযত।

বুদ্ধ কখন ব্রহ্মশব্দ ব্যবহার করেছেন, কখন আত্মাশব্দ ব্যবহার করেছেন। আত্মাশব্দও দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

(১) ব্যক্তিগত আত্মা (২) নিত্য আত্মা। বুদ্ধদেবের অন্যের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, (১) এ নহে যে তিনি

* 'জীবনস্মৃতি'—সুদক্ষিণা সেন।

বলেন ঈশ্বর নাই এবং অন্যে বলেন ঈশ্বর আছেন। বিভিন্নতা এই যে অন্যে বলেন ঈশ্বরও আছেন, অন্য সব জিনিষও আছে। তিনি বলেন ঈশ্বরই আছেন। তিনি বলেন এমন অবস্থা আছে, যাহা লাভ করিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত ভৌতিক সম্বন্ধ হইতে মানুষ নির্ম্মুক্ত হয়। তখন মানুষ আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। কারণ যে সকল লক্ষণ দ্বারা আমরা মানুষ আছে বলি, তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়। তখন মানুষ নাইও বলা যায় না, কারণ তখন সে ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত বস্তুতে সমাধিস্থ হইয়া তন্ময় হইয়া, গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্পরিগ্রাহ্য মহাসমুদ্রের ন্যায় হয়। (২) অন্য লোকে ইন্দ্রিয়গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত সম্পর্কিত ভগবানের যে রূপ তাই দেখতে চায়, তাতেই পরিতৃপ্ত হয়। তারা ভগবানের নিকটস্থ হয়েও এই ইন্দ্রিয়গ্রামে থাকে, বুদ্ধদেব প্রথম থেকেই এই ইন্দ্রিয়-গ্রামের অতীত বস্তু দর্শনের জন্য লালাইত হন। এমন কি আর একটুকু হলে এ দেহও পরিত্যাগ করতেন। (৩) অন্যে গুরুর মুখে শুনে শাস্ত্র পাঠ করে, আভাস মাত্র পেয়ে ধর্ম্মের কথা, সত্যের কথা, ব্রহ্মের কথা বলে। বুদ্ধ তাতে পরিতৃপ্ত না হয়ে, প্রথমে সাক্ষাৎকার করেন।

২০। 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান' (১৯১৭); 'Buddhism and Navavidhan' (1930); 'Synthesis of Religions—A New Exposition' (1954)

—ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ এম এ, এম্ বি

ক্রমে ক্রমে Comparative Religion জীবনের ধর্ম্ম হয়ে উঠলো। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন, সর্ব্বসাধু সমাগম, আবার সকলের সঙ্গে একাত্মতা সাধন নববিধানের নূতন সাধন হল। ঐ সাধনার ভিতর দিয়াই নববিধানের নূতন চরিত্র সম্ভব। বিমলচন্দ্রের* জন্ম সেই সাধনার ভিতর। তাঁর পিতা সাধক গোপালচন্দ্র ঘোষ ও মাতা সারদাদেবী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিমলচন্দ্র তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান।

* 'সাধক গোপালচন্দ্র ঘোষের আদর্শ জীবন সাধনা'—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

১৮৭৪ খৃঃ লক্ষ্ণৌএ তাঁর জন্ম ও ১৯৪৮ খৃঃ কলিকাতায় মৃত্যু।

নববিধানতত্ত্ব যে একটী নূতন তত্ত্ব, ঐ তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করার জন্য যে বিশেষ সাধন ও যোগ্যতার প্রয়োজন এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। ধন, মান, যশ ও খ্যাতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না; তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল নববিধান-তত্ত্ব অবধারণ। তিনি মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত নববিধান সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। ঐ সাহিত্যকে Revealed বা প্রত্যাদিষ্ট বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সম্যক্‌ভাবে তার অর্থ উপলব্ধি করার জন্যেই তিনি বিলাতে অধ্যয়নের সময় দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ব, নৃতত্ত্ব, শরীর বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। বিলাতে তিনি কিছুদিন অধ্যাপনা ও ধর্ম্মোপদেষ্টার কাজও করেন। দেশে ফিরে এসে প্রথমে কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্ত্তমান আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ), পরে ন্যাসানাল মেডিকেল কলেজে, বিদ্যাসাগর কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, কলিকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান, নববিধান মণ্ডলীর নেতৃত্ব, Nava-vidhan পত্রিকার সম্পাদনা, প্রভৃতি কাজ করেন। ১৯৩০-৪৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁর অশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর উপাসনা গভীর অথচ সহজ ছিল, ভাবা সুমিষ্ট ছিল। দুর্ব্বোধ্য বিষয়কে তিনি নিজ উপলব্ধির আলোকে ও সহজ ভাষার ব্যবহারে স্বচ্ছ করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর সুমিষ্ট সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার ও বিনয় তাঁকে সকলের বিশেষ প্রিয় করেছিল। সত্যে অনুরাগ ও ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ আস্থা, ব্রহ্মানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সময়ে সময়ে তাঁকে ব্রহ্মানন্দ-বিরোধীদের অন্যায় মতামতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে প্রবৃত্ত করতো। খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ও বর্ত্তমান দর্শন বিষয়ে তাঁর বহু রচনা ও বক্তৃতা পাওয়া যায়।

বিমলচন্দ্র ১৯১৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে' সাপ্তাহিক উপাসনার পরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে কয়েকটী উপদেশ দেন। ঐ বৎসরেই বুদ্ধোৎসবের সময় 'ব্রহ্ম-মন্দিরে' এবং 'বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভায়' কয়েকটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি খুবই নূতন ভাবের হয়েছিল। ঐ ছয়টি উপদেশ প্রথমে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার ইংরাজী অনুবাদও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিমলচন্দ্র প্রথম বক্তৃতায় বলেন—

"শাক্যমুনির ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করিলে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। সে কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শতাব্দী ধরিয়া গবেষণার ফলে ধরিতে পারিয়াছেন, সাধকের যোগীর দিব্যদৃষ্টিতে সে সত্য—এক মূহুর্ত্তে প্রকাশিত হইয়াছে।

বুদ্ধি বিচারে যে রহস্যভেদ করিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া যায়, দিব্যচক্ষে, বুদ্ধচক্ষে, প্রত্যাদিষ্ট অবস্থায় সে রহস্য এক নিমেষে উন্মুক্ত হইয়া যায়।"

ঐ সময়ে একদিকে Lotze, Bergson, অন্যদিকে Freud, Einstein দর্শনে ও বিজ্ঞানে যে নূতন জগৎ প্রকাশ করিতেছিলেন, বিমলচন্দ্র সেই বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত ইতিহাসের আলোককে মিলাইয়া, বুদ্ধদেবের শিক্ষার অর্থ করেন ও সামঞ্জস্য দেখাইতে থাকেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই পথ দেখাইয়াছিলেন। তাহা ধরিয়া বিমলচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক দুর্ব্বোধ্য ও বিরুদ্ধ মতবাদকে স্পষ্ট ও সহজ করিয়া দেন।

প্রথম "ভাবনাচতুষ্টয়"—"সকলি ক্ষণিক" অর্থে দেখাইয়াছেন যে "জগতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন অনাদি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়াছে"; "অনুপরমাণুগুলিকে গতিশীল বলিয়া ধরিলেও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হয় না। কারণ অনুপরমাণুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সেইজন্য তাহাদের পরিবর্ত্তে অনাদি অবিচ্ছিন্ন শক্তি-প্রবাহের কল্পনা (stream of energy) বিজ্ঞানে স্থান পাইয়াছে" "বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষণবাদকে শক্তিবাদ (Doctine of energy)

বলিতে হয়।” “জগৎ যে শক্তিময় এই মহান সত্য বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর প্রথম সাধন”। “তিনি ক্ষণবাদের সঙ্গে নিয়মবাদ (Law of Causation or Cosmic order) সংযুক্ত করিতেন।” জড় জগতে ‘হেতু নিয়ম’, জীব জগতে ‘বীজ নিয়ম’, মনো-জগতে ‘চিত্ত নিয়ম’, সামাজিক জীবনে ‘কর্ম্ম নিয়ম’ আধ্যাত্মিক জীবনে ‘ধর্ম্ম নিয়ম’। “এই পঞ্চ নিয়মের কথা মনে রাখিয়া জগতে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া, অবিচ্ছিন্নশক্তিপ্রবাহের বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে আজকাল যাহাকে আমরা ক্রমবিকাশ, বিবর্ত্তন, অভিব্যক্তি (evolution) বলি, প্রকৃতই সেই ব্যাপার বুদ্ধদৃষ্টিতে শাক্যমুনির জ্ঞানগোচর হইয়াছিল।”

“সকলি দুঃখ”—এই Process of evolutionএ Struggle এবং Struggleএ দুঃখ। দুঃখ দিয়ে দুঃখ দূর, দুঃখই সব উন্নতির মূল, সব devolopmentএর মূলে দুঃখ। ক্রমে উন্নতির গতি ঊর্দ্ধমুখে, তার সমাপ্তিতে দুঃখমুক্তি। “মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় ক্রমে দেহের উপরে প্রাণের, প্রাণের উপরে চিত্তের, চিত্তের উপরে কর্ম্মের, কর্ম্মের উপরে ধর্ম্মের অধিকার ও রাজ্য সুসংস্থাপিত হয়। তখন বিবর্ত্তনের বিরাম হইয়া,—ক্ষণিকত্বের ক্ষয় হইয়া, দুঃখের নির্ব্বাণ হইয়া যে নূতন সৃষ্টি হয় তাহার বর্ণনা মানুষের ভাষার অতীত, মানুষের বুদ্ধির অগোচর।”

“সকলি স্বলক্ষণ”—‘‘কার্য্য-কারণে যখন সাদৃশ্য নাই, তখন ক্রমবিকাশের প্রতিপদে নূতনের আবির্ভাব এবং অভিব্যক্তির প্রত্যেক সোপানে নিত্য নূতন সৃষ্টি।” “প্রত্যেকে Unique, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্টস্থান আছে,… একজনের স্থান অন্যে লইতে পারে না। তাই কর্ম্ম নিয়মে ও ধর্ম্ম নিয়মে হিংসার, ঈর্ষার, পরপীড়নের স্থান নাই। “অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ”। আধুনিক ফরাসী দার্শনিক Bergson এই Creative evolution এর কথা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। আরও এই বিবর্ত্তনে (evolution) যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই নূতনের আবির্ভাব, তাহার পূর্ব্বাবস্থার

প্রত্যাবর্ত্তন হয় না। যখনই চরিত্র পদস্খলিত হয় তখনই তাহার ভাবী evolutionএর মাত্রা এবং দুঃখ-ভোগের মাত্রা উভয়ই বাড়িয়া যায়" এবং বিবর্ত্তনের দিকে আরো দ্রুত অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়।

"সকলি শূন্য"—এই কথাতে বৌদ্ধেরা বলেন যে বিবর্ত্তমান বিশ্বসংসারে কোন অবিকারী অবিবর্ত্তমান সার বস্তু নাই এবং কোনও জীব বা আত্মা নাই।...সকল আত্মাই যখন বিরাট কিম্বা বিরাটত্ব লাভের দিকে অগ্রসর, তখন আত্মা মাত্রেই পরস্পর interpenetrative জালতন্তুধর্ম্মী। "বুদ্ধং জ্ঞান-মনন্তং আকাশবিপুলং সমং" অধ্যাত্মরাজ্যের কথা, সাধনের কথা একমাত্র অনন্ত জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, শাক্যমুনি পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর মত ছোট ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন।...বুদ্ধের জ্ঞানবস্তু এক অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তা (continuum)। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ কতকটা Aristotleএর বিশ্বাসের ন্যায় এবং প্রকৃত ভাবে বিবর্ত্তনবাদ মাত্র।

"বুদ্ধের ধর্ম্ম" "সর্ব্বধর্ম্ম-নির্ব্বিরোধ" বলিয়া প্রচারিত হইল বাস্তবিক বুদ্ধদেব প্রচলিত ধর্ম্মগুলিকে আত্মস্থ করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম শত সহস্র নরনারীর নিকট আদরণীয় হইয়াছিল।" বুদ্ধ উপলব্ধি করেন যে "হেতুনিয়মে শক্তির শাসন; বীজ-নিয়মে প্রাণ শক্তির শাসন; চিত্তনিয়মে জ্ঞানের শাসন; কর্ম্মনিয়মে পুণ্যের শাসন; ধর্ম্মনিয়মে প্রেমের শাসন।" "কর্ম্মনিয়মে চরিত্রের বিকাশ, চরিত্রের আধিপত্য ও পুণ্যের প্রাধান্য। পুণ্য করিতে হলে আত্মসংযম করিতে হয়, ত্যাগ করিতে হয়, অহংকে ভুলিতে হয়।...পুণ্যেতেই মঙ্গল বিশেষ-রূপে উপলব্ধ হয়। চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকার করাতে বুদ্ধদেব একেবারে যে নিরাত্মবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। যোগিবর সাধু অঘোরনাথের কথাই ঠিক। অর্থাৎ আমরা যাহাকে 'অহং' 'অহমিকা' বলি, সাধারণ জ্ঞান বা চেতনায় যাহাকে 'আমি' বলি, স্বতন্ত্র ইচ্ছার উৎস

বা কেন্দ্র স্বরূপ যে "আমার দায়িত্ব," আমার 'অসার স্বামিত্ব', বুদ্ধদেব তাহাকেই 'আত্মা' নাম দিয়া তাহারই বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। যখন 'আমিত্বকে' অপসারিত করা যায়, নাশ করা যায়, তখন আমিত্ব যে একটা ক্ষণস্থায়ী অনিত্য ব্যাপার মাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। "যাহাকে Person or Personality বলা হয়, বাঙ্গলাতে যাহাকে ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে, সেই ব্যক্তিত্ব dynamic এবং 'কর্ম্মনিয়মের' অধীন। মানুষে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্ভব নয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিতে পূর্ণব্যক্তিত্ব লাভ, ক্রমবিকাশের পরাকাষ্ঠা লাভ, তখন ভগবানের সহিত যোগযুক্ত অবস্থা। বুদ্ধের ভাষায় আমরা অনন্তকাল জ্ঞানবস্তুর সহিত যোগযুক্ত থাকিয়া বিবর্ত্তনের সীমায় পৌঁছিয়া পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হই। "সাধু অঘোরনাথের অনুসরণে এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক রহস্য ভেদ হয়।"

প্রাণের সংযোগে জীবদেহে organic unity হয়; তার সঙ্গে মনের অধিষ্ঠানে স্থিতিশীলতা কমিয়া গতিশীলতা বাড়িয়া যায়। স্থির, ধীর, দৃঢ়, প্রশান্ত চরিত্র বলিলে তাহাতে পরিবর্ত্তন নাই এমন বোঝায় না; কিন্তু পরিবর্ত্তন আছে, গতি আছে উন্নতির দিকে, অবনতির দিকে নহে। উন্নত হলে নূতন চেতনা, নূতন দৃষ্টি লাভ হয়। তাই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন কেবল পুণ্য প্রেম চালিত হইয়া জীবন ধারণ করিবে। সেই অভিজ্ঞায় জানিতে পারিবে, গঠিতচরিত্র 'অনাগামিগণের' প্রত্যাবর্ত্তণ নাই।" আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শেষ জীবনে রামমোহন ব্যস্ত হন। পরমাত্মার ও জীবাত্মার মধ্যে আকাশের ব্যবধান নাই, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রৌঢ়াবস্থায় বিশেষরূপে জানিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র যৌবনেই ব্রহ্মবাণী অনুসরণ করিয়া অন্তরে পরমাত্মসামীপ্য অনুভব করিলেন। বুদ্ধদেব ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই কিন্তু একথা বলা যায় যে সাধনবলে তিনি জানিতে পারিলেন যে চিত্তনিয়মের অধীনতায় সূক্ষ্ম-জগতের সহিত, আধ্যাত্মিক-জগতের সহিত যোগ স্থাপিত হয়।" "এই অধ্যাত্ম জগতে প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

এবং নির্ব্বিশেষ অপেক্ষা বিশেষ জ্ঞান অধ্যাত্মরাজ্যে বেশী আদরণীয়।" আমিত্ববিহীন নিজেকে ও বিশ্বসংসারকে নিরাত্ম জানিয়া শাক্যমুনি বুদ্ধদৃষ্টি পাইলেন। ফলে তাঁর প্রাণ অসীম করুণায় প্লাবিত হইয়া অসীম, অনন্ত, শুদ্ধ-সত্তার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিয়া, প্রধান পুরুষত্ব লাভ করিলেন। প্রেমের দ্বারা সমস্ত জীবজনকে নিজের অভ্যন্তরে দেখিয়া, নিজের বিশালত্ব ও বিরাটত্ব অনুভব করিলেন।" আচার্য্য কেশবচন্দ্রও নববিধান সাধন করিয়া দেখিলেন "নববিধানের নূতন মানুষ"—"যাঁর মস্তকে সক্রেটিস, রসনায় শ্রীগৌরাঙ্গ, বক্ষে শ্রীঈশা, এক বাহুতে মহম্মদ, অন্য বাহুতে মহামতি হাওয়ার্ড।" "শত শত তাঁহার চক্ষু, শত শত তাঁহার কর্ণ, শত শত তাঁহার নাসিকা, শত শত হস্ত, শত শত পদ। যোগে সমস্ত নরনারী সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিশ্বমানবের উদ্ভূতি। বুদ্ধের অভিজ্ঞতায় কেশবের অভিজ্ঞতায় কত সাদৃশ্য।"

২১। 'The Life of Princess Yashodara: The wife and disciple of the Lord Buddha' (1929)
—Sunity Devee, C. I.

এই বইটীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী নব-অধ্যয়নের আলোকে বুদ্ধদেবের সহধর্ম্মিনী দেবী যশোধরার কাহিনী স্বতন্ত্রাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক কালে যেমন সাধু অঘোরনাথকে শাক্যমুনি বিষয়ে, তেমনি মহারাণী সুনীতি দেবীকে রাণী যশোধরা বিষয়ে প্রথম গ্রন্থকার বলা যায়। সুনীতি দেবী চমৎকার বাংলায় এই বিষয়ে মধ্যে মধ্যে কথকতা করতেন। সেই কথকতা প্রকাশিত হয়নি। পরে তিনি সেই কাহিনী ইংরাজীতে নিবদ্ধ করে ইংরাজী-নবীশদের জন্য ও পাশ্চাত্য পাঠকদের জন্য প্রকাশ করেন।

মহারাণী সুনীতি দেবী তাঁর পিতৃদেবের জীবনের বহু পর্য্যায়ে নারীর মাহাত্ম্য দেখেছিলেন। তাঁর পিতাই সর্ব্বপ্রথম অনন্ত পরব্রহ্মকে পরমজননী বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন।

তাঁর পিতার প্রথম জীবনের সন্ধিস্থলে পিতামহী সারদাসুন্দরীর শক্তিদানের কথা তিনি জানতেন। আবার তাঁর পিতৃদেবকে যখন ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য ঘোর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গৃহত্যাগ করতে হয়, তখন মাতৃদেবী জগন্মোহিনী দেবীর সায় ও সঙ্গ তাঁকে যে কতখানি উৎসাহ ও শক্তি দিয়েছিল তাও কন্যা জানতেন। আর, তাঁর পিতা অন্তঃপুরস্ত্রীসভা, বামাবোধিনী সভা, ব্রহ্মিকাসমাজ, বামাহিতৈষিণী সভা, আর্য্যনারী সমাজ, বিভিন্ন বালিকাবিদ্যালয় এবং বামা-বোধিনী ও পরিচারিকা পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে নারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা ও তাঁর উপদেশাদির ভিতর যে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়ে গেছেন, তাঁর তীক্ষ্ণ ধী সে সকলই সম্যক্ অবধারণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রসঙ্গে তিনি যে বুদ্ধ-পত্নীর জীবন কাহিনী কীর্ত্তন করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। পিতার নূতন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করে কন্যা সুনীতি দেবী ধন্য হয়েছিলেন। পিতার 'জীবনবেদের' অরণ্যবাস অধ্যায়ে বর্ণিত নব-বৈরাগ্যের আস্বাদও তিনি পেয়েছিলেন। তার বলেই নিজে রাজরাণী হয়ে, মহারাজার সঙ্গে সর্ব্বদা প্রজাদের দুঃখ ও অভাব মোচনের জন্য তৎপর ছিলেন এবং মহারাজার তিরোধানের পর 'নবপরিচারিকা ব্রত' নিয়ে ভগিনীদের সঙ্গে নগ্নপদে নববিধানের 'নিশান' বরণ ও বহন করেছেন। এই সকল শিক্ষার ফলেই তিনি দেবী যশোধরার মনের কথা ও অন্তরের মহিমা এমন সুন্দর করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। Foucaux-র সংস্করণ 'ললিত বিস্তর' অবলম্বন করে তিনি বইটি লেখেন। প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান গৌরবময় ছিল। বুদ্ধদেব ধর্ম্মসংঘে নারীকে স্থান দিয়ে, তাঁদের মর্য্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর সহধর্ম্মিনী দেবী যশোধরার প্রেরণা ভিন্ন তিনি নিজ পথে কতদূর অগ্রসর হতে পারতেন বলা কঠিন। দেবী যশোধরার প্রতিভা ও স্বামী-সহযোগীতার পরিচয় লাভ করলে, শ্রীবুদ্ধের কর্ম্মকাহিনীর ভিতরে প্রবেশ করা সহজ হয়। সংসার ত্যাগ করে, নির্জ্জনে, বহুকষ্টে, কঠোর

উপায়ে যে সাধনা শ্রীবুদ্ধ আয়ত্ব করেছিলেন, সেই সাধনাই তাঁর পত্নী কেবলমাত্র প্রেমবলে ও আত্মিক যোগে, সংসারের কোলাহলের মধ্যে এবং সকল কাজকর্ম্মের বোঝা মাথায় নিয়েও সহজে নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের তৃতীয়া কন্যা মহারাণী সুচারু দেবীর কাছে তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাণী সুনীতি দেবীর বিষয় যা শুনেছি এখানে তাই লিপিবদ্ধ করলাম। তাঁরা পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোন। * সুনীতি দেবী পিতার দ্বিতীয় সন্তান প্রথমা

* ব্রহ্মানন্দ জন্মঃ ১৮৩৮ খৃঃ ১৯শে নবেম্বর তিরোধান: ১৮৮৪ খৃঃ ৮ই জানুয়ারী

সতী জগন্মোহিনী জন্মঃ ১৮৪৭ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর তিরোধান খৃঃ ১৮৯৮ খঃ ১লা মার্চ্চ

প্রথম সন্তান করুণাচন্দ্র জন্মঃ ১৮৬২ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর
মৃত্যুঃ ১৯০৭ খৃঃ ২৯শে নবেম্বর

বধূ মোহিনী দেবী জন্মঃ ১৮৬০ খৃঃ ১৯শে মার্চ্চ
মৃত্যুঃ ১৮৯৭ খৃঃ ৬ই মে

(এঁদের তিন পুত্র ও এক কন্যা)

দ্বিতীয় সন্তান জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী
জন্মঃ ১৮৬৪ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর
মৃত্যুঃ ১৯৩২ খৃঃ ১০ই নবেম্বর

জামাতা মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর
জন্মঃ ১৮৬২ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর
মৃত্যুঃ ১৯১১ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর

(এঁদের চার পুত্র ও তিন কন্যা)

তৃতীয় সন্তান দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রী দেবী
জন্মঃ ১৮৬৬ খৃঃ ২রা ডিসেম্বর
মৃত্যুঃ ১৯৩২ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর

জামাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ জন্মঃ ১৮৫৭ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট
মৃত্যুঃ ১৯২১ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর

(এঁদের চার পুত্র ও তিন কন্যা)

চতুর্থ সন্তান নির্ম্মলচন্দ্র জন্মঃ ১৮৬৯ খৃঃ ২১শে জানুয়ারী
মৃত্যুঃ ১৯৩৬ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী

বধূ মৃণালিনী দেবী জন্মঃ ১৮৭৯ খৃঃ ৩রা আগষ্ট

(এঁদের তিন কন্যা এক পুত্র)

কন্যা। তিনি বাল্যে পিতৃগৃহে পিতার তত্ত্বাবধানে, পরে 'ভারত আশ্রমের' বিদ্যালয়ে ও কিছু দিন 'বেথুন কলেজে' ও পরে পিতৃগৃহে ইয়োরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর কাছে

পঞ্চম সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র জন্মঃ ১৮৭১ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর
মৃত্যুঃ ১৯১৫ খৃঃ ৩০শে জুলাই
বধূ শ্রীমতী লিজী (Lizzi) ইংরাজ মহিলা
(এঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা)

ষষ্ঠ সন্তান তৃতীয়া কন্যা মহারাণী সুচারু দেবী
জন্মঃ ১৮৭৪ খৃঃ ৯ই অক্টোবর
জামাতা মহারাজা জন্মঃ ১৮৭১ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও মৃত্যুঃ ১৯১২ খৃঃ ২২শে জুন
(এঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা)

সপ্তম সন্তান সরলচন্দ্র জন্মঃ ১৮৭৫ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর
মৃত্যুঃ ১৯৪৩ খৃঃ ৮ই ডিসেম্বর
বধূ শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী জন্মঃ ১৮৮৫ খৃঃ ২৩শে নবেম্বর
(এঁদের দুই পুত্র ও তিন কন্যা)

অষ্টম সন্তান চতুর্থী কন্যা জন্মঃ ১৮৭৭ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর
মণিকা দেবী মৃত্যুঃ ১৯৪৭ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর
জামাতা অধ্যাপক জন্মঃ ১৮৬৭ খৃঃ ৪ঠা মার্চ্চ
সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মৃত্যুঃ ১৯৫৩ খৃঃ ৩১শে জুলাই
(এঁদের তিন পুত্র)

নবম সন্তান পঞ্চমা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবী
জন্মঃ ১৮৭৯ খৃঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর
জামাতা চিফজষ্টিক জন্মঃ ১৮৮০ খৃঃ ২৪শে জানুয়ারী
সত্যেন্দ্রনাথ সেন মৃত্যুঃ ১৯৪১ খৃঃ ২৭শে মার্চ্চ
(এঁদের চার কন্যা ও এক পুত্র)

দশম সন্তান সুব্রতচন্দ্র জন্মঃ ১৮৮২ খৃঃ ৭ই নবেম্বর
মৃত্যুঃ ১৯৩৮ খৃঃ ২০শে ডিসেম্বর
বধূ মাদাম জঁা (Jannet) ফরাসী মহিলা
(এঁদের এক কন্যা)

শিক্ষালাভ করেছিলেন। আমার মাতৃদেবী স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দেবী ও তাঁর দুই জ্যেষ্ঠা ভগ্নি এঁদের বাল্যবন্ধু ছিলেন। 'আর্য্যনারীসমাজ' এঁদের চরিত্রকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল। ব্রহ্মানন্দ সে সময়ের মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের প্রয়োজন বোধ করতেন না; নারীচিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ, নারী চরিত্রের গঠন, সমাজে নিজস্ব স্থান পূর্ণ করার যোগ্যতা এবং মহৎ চরিত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করার শিক্ষা বেশী দরকার বলে বুঝতেন। সেই ভাবেই তিনি তাঁর উচ্চ মহিলা বিদ্যালয়ের (পরে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' নামে প্রখ্যাত) পরিকল্পনা করেছিলেন। ঐ পরিকল্পনা বাংলায় ও ইংরাজীতে 'পরিচারিকা' ও 'Liberal' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজীটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল।

PROSPECTUS OF
INSTITUTION FOR THE HIGHER EDUCATION OF WOMEN

The following is the prospectus of an important and interesting movement which, we hope, will commend itself to the sympathy of all well-wishers of the cause of female education.

The want of an institution for the higher education of adult Native Ladies has long been felt. The numerous girls' schools which exist in the country and which are multiplying every year, are no doubt carrying on, with efficiency and success, the work of educating little girls. Such teaching, however, is necessarily of a most elementary character, and requires to be supplemented by a higher and more complete standard of education. The Committee of the Indian Reform Association propose to supply this great national want. Their chief aim is to organise a scheme of education specially adopted to the requirements of the female mind and calculated to fit woman for her position in society. It can not be denied that woman requires special training for the sphere of work and duty which is peculiarly her own. To compel her to go through studies and seek titles

and distinctions which are suited to the sterner sex is harmful and objectionable. Whatsoever, therefore, tends to unsex her by giving her masculine education or degrade her by teaching her mere outward accomplishments and superficial refinements will be sedulously avoided in the proposed Institution. The development of the true type of Hindu female character upon a plan of teaching, at once natural and national, is the primary object of the undertaking. In carrying out this object, the Committee will restrict their operations to Lectures, Examinations and the conferring of rewards. A series of conversational lectures will be delivered in Calcutta, of which due notice will be previously given. The lectures will embrace such subjects as these:—Elementary Science, Ethics, Laws of Health, Grammar and Composition, History and Geography, Domestic Economy, Exemplary Hindu Female Characters. Arithmetic, Drawing and needle work will also form subjects of instruction. Ladies attending these lectures will be subjected to annual examinations, by means of printed papers. Such candidates also, in Calcutta or the provinces, as may appear to the Syndicate to be duly qualified, will be admitted to the examinations. Successful candidates will be rewarded with prizes, jewellery, Certificates of honour, and Scholarships varying from Rs. 50/- to Rs. 200/- a year.

Native Princesses, Ranis, Maharanis, and Ladies of rank, interested in the cause of Native female education, are respectfully requested to countenance and support this scheme, and become Patronesses of the Institution.

A Ladies' Committee will also be appointed composed of European and Native Ladies of rank for purposes of supervision. Under the auspices of this Committee friendly reunions will be held from time to time at the houses of respectable European and Native gentlemen with a view to give enlightened Native ladies that practical social training which is so essential to their higher education.

A Syndicate has been formed under the presidency of Babu Keshub Chunder Sen, President of the Association, to prescribe subjects of study, appoint a board

of examiners, and frame the requisite rules and regulations.

The Committee hope to commence their operations on the 15th of April, when the first Lecture of the session will be delivered.—*Liberal*, April 2, 1882.

নিজের কন্যাদের তিনি এই ভাবেই শিক্ষাদান করেছিলেন। তাঁদের জীবনে তার ফল ব্রহ্মানন্দের দূরদর্শীতার পরিচয় দেয়। মহারাণী স্থনীতি দেবীর চরিত্রের পবিত্রতা, নিষ্ঠা, স্বাভাবিক তেজস্বিতা, উৎসাহ ও মাতৃপ্রাণতা তাঁকে সমসাময়িক সমাজে খুবই সম্মানের স্থান দিয়েছিল। নিজের আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা তিনি সৎ কাজে বেশী সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর বদান্যতায় বহু গুণী নিজ গুণ প্রকাশের, বহু দুঃস্থ ছাত্র উচ্চ শিক্ষালাভের, বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু অনুষ্ঠান সাফল্য লাভের স্থযোগ পেয়েছিল। কবি রাজকৃষ্ণ রায়, কীর্ত্তনকার কুঞ্জবিহারী দেব, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা তাঁর কাছে মার মতন সাহায্য পেয়েছিলেন বলেছেন। পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত Victoria Collegeটীকে তিনি বরাবর পরিচালনা করেছেন। পিতার অন্যান্য মহৎ কীর্ত্তিগুলিও যথাসাধ্য পোষণ করেছেন। তাঁর লেখা 'The Autobiography of an Indian Princess' (1923) বইটীতে আমরা তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী জানতে পাই—

"Our days were full of interest, and some of my earliest recollections are connected with the female education movement which my father started. There was an establishment called the Asram where his followers from all different classes lived in happy disregard of caste and class. This house was quite close to Coolootola and there I spent many happy days with my sister-in-law, then Miss Kastogiri, the ideal of my girlhood." (P.7).

"We were not allowed to pluck the fruit or flowers in the Belghuria garden, and I remember seeing cards in my father's clear handwriting fixed on the trees, which forbade us to hurt the growing loveliness." (P. 7).

"My father had indeed a striking personality: tall and broad shouldered, he gave one the impression of great strength. I always thought of him as an immortal; his eyes were 'homes of silent prayer'. Lord Dufferin once remarked to me: 'I did not know you were Mr. Sen's daughter. I've travelled far and seen many handsome men, but never one so handsome.'' (P. 7—8).

"The childhood of an Indian girl of years ago may have some interest now, and I must say that I do not admire the modern upbringing of children. Our old system had many defects, but it had also many advantages, chiefly the ideas of simplicity and duty which were primarily inculcated in the little ones."

"I got up early and by nine o'clock my eldest brother 'Dada' and I were ready for school. I went to Bethune College (Miss Hemming was then a teacher there) and he to a boys' school." (P. 15).

"The Asram near Coolootola consisted of two houses joined together, and there we lived for a time with many of my father's followers as one big united family (a thing hitherto, unheard of in India), addressing each other as sisters and aunts, uncles and brothers. My father held a service in the hall every morning. His motto was, "Faith, Love, and Purity" and upon this he always acted. His life was a pilgrimage of extraordinary faith which made him trust in the infinite mercy of God even in the darkest hour, of love which enabled him to view the failings of others with perfect charity and compassion, and purity which kept the lustre of his private life undimmed to the last." (P. 20).

"My father formed a Normal School for girls called the Native Ladies' Normal School. This school was at one time the only institution of the kind in India. To-day there are hundreds of Colleges and Schools all over India for Indian girls and women. My father fought for female education. How keenly he was opposed by the leading men at the time." (P. 20).

"Later on (1882) my father established a College in Calcutta, named after her late Majesty Queen

Victoria. This College will always be associated with the name of Keshub Chunder Sen. He did not believe in the importance of university degrees; he maintained that for a woman to be a good wife and a good mother is far better than to be able to write M.A. or B.A. after her name. Therefore, only things likely to be useful to them were taught to the girls who attended the Victoria College. Zenana ladies also came to the lectures, and the good work flourished." (P. 21).

বৃটিশ সরকারের বিশেষ আগ্রহে, ১৮৭৮ খৃঃ কুচবিহারের ভাবীরাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে সুনীতি দেবীর বিবাহ হয়। ঐ অনুষ্ঠানটী কুচবিহারে ব্রাহ্ম-আদর্শ অনুসারে সম্পন্ন হয়। কেবল কন্যার বিবাহ নয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ নূতন ধর্ম্ম ও নীতি কুচবিহারে নিয়ে গেলেন। কিন্তু নূতন বিবাহ আইন (Act III of 1872) অনুযায়ী এই বিবাহে কন্যা ও জামাতার বয়স কম ছিল। সেইজন্য ব্রহ্মানন্দ একটী সর্ত্ত করিয়ে নেন যে, বিবাহ হলেও যতদিন না তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হন ততদিন বিবাহকে বাগ্‌দানের মত ধরতে হইবে। এ সর্ত্ত অনুসারে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সুনীতি দেবী পিতার সঙ্গে কলিকাতায় পিতৃভবনে চলে আসেন। নৃপেন্দ্র নারায়ণকে কুচবিহারের নিকটস্থ 'নীলকুঠিতে' পাঠান হয় ও কয়েকদিনের ভিতর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে রওনা হন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি বিলাত থেকে ফেরেন এবং ১৮৮০ খৃঃ দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক হলে, কলিকাতায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে' তাঁদের বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ও তাঁরা একত্রে কুচবিহারে যান। * তাঁদের চার পুত্র ও তিন কন্যা—মহারাজার সঙ্গিনীরূপে তিনি রাজ্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রজাদের ভিতর স্ত্রীশিক্ষা, মাদকতা নিবারণ, জনসেবা ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংস্কার করেন। কলিকাতার যশস্বী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও

* Vide: 'Keshub Chunder Sen and Coochbehar Betrothal 1878' by Dr. P. K. Sen, M. A., LL. D. and 'কেশব-জননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা'।

অধ্যাপকদের কুচবিহার কলেজে ও বিদ্যালয়ে এনে রাজ্যে শিক্ষার ও বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। বহু যোগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে এনে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, কীর্ত্তনীয়া এবং বক্তাদের এনে উৎসব, কীর্ত্তন, কথকতা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করে রাজ্যে ধর্ম্ম-চেতনার সৃষ্টি করেন। এই সকলের ভিতর দিয়ে মহারাণী সুনীতি দেবী গর্ভধারিণীর মত চিরদিনের জন্য নূতন কুচবিহার রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন।

তাঁর পিতৃমাতৃভক্তি ও ভাই বোনেদের প্রতি ভালবাসার শেষ ছিল না। তাঁর উৎসাহে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক 'ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী' বইটী রচনা করেন। পিতার গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তার ফলে ব্রহ্মানন্দের রচনাবলী নূতন বেশে প্রকাশিত হয়েছিল। পিতার কীর্ত্তিরক্ষা, পিতার ধর্ম্মপ্রচার, বৃহৎ পরিবারের ও পিতার সহযোগীদের খবরাখবর নেওয়া এবং প্রয়োজন মত অক্লান্ত-ভাবে সকলের সাহায্য করায় তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগী ছিলেন। নিজে প্রত্যহ আচার্য্য দেবের 'দৈনিক প্রার্থনা' ও অন্যান্য বই থেকে পাঠ করতেন। 'নবসংহিতায়' নিবদ্ধ অনুষ্ঠানাদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজে পালন করতেন, এবং অন্যেরা যাতে এই নিয়ম পালন করে তারও ব্যবস্থা করতেন। নিত্য উপাসনা করা, পিতার প্রতিষ্ঠিত নববিধান মণ্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করা ও সেখানে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি দেখলে তার সংশোধন করা তাঁর ব্রত ছিল।

১৯১১ খৃঃ মহারাজার মৃত্যু হয়। তারপর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণকে রাজ্যভারদিয়ে, তিনি রাজমাতারূপে কিছুদিন কুচবিহারে থেকে, রাজ্য-পরিচালনায় সাহায্য করেছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরে এসে, পিতৃধর্ম্ম 'নববিধান' প্রচারে উদ্যোগী হন। ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতষ্পুত্র পুণ্যচেতা মহাত্মা প্রমথলাল সেন মহাশয়কে অগ্রণী করে মণ্ডলী মধ্যে

নবজীবনের তরঙ্গের সৃষ্টি করেন। ১৯১৪ খৃঃ লক্ষ্ণৌ নগরীতে 'নববিধান সংঘের' এক অধিবেশন করান। সংঘ থেকে ফিরে এসে প্রচারক, সাধক ও তরুণ কর্ম্মীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 'কমল কুটীরে' নূতন জীবনের জোয়ার দেখা দিল। ব্রহ্মানন্দের পুত্র করুণাচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এতদিন প্রচারকদের সহযোগিতায়, 'ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটীর' নামে, তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতেন। এখন নব-পরিচারিকা সুনীতি দেবী সে ভার নিলেন ও নূতন সংস্করণের প্রকাশ আরম্ভ করলেন। ঐ কার্য্যে প্রমথলাল ছিলেন তাঁদের নেতা এবং গণেশ প্রসাদ ও যামিনীকান্ত কোঁয়ার মহাশয় ছিলেন দুটী হাত। অনেকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে ঐ কাজে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। সে সময়ে অধিকাংশ প্রচারক ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। তখন ব্রহ্মানন্দ-কন্যা সুনীতি দেবীর প্রভাবে এই নূতন কর্ম্মীদলের সৃষ্টি হয়েছিল; মণ্ডলীর যুবকদের ও মহিলাদের ভিতর নূতন জাগরণ দেখা দিয়েছিল। যখন তাঁরা পাঁচ বোন সেই সব মহিলাদের নিয়ে, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে, নগ্নপদে ব্রহ্মোৎসবে, নগরকীর্ত্তনে বা নিশান-বরণে বা অন্য কাজে যেতেন, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য সকলকেই অনুপ্রাণিত করত। সেই দৃশ্য ২৫০০ বছরের আগের সেই দেবী যশোধরার কথাই মনে করিয়ে দিত। নূতন করে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ', 'আর্য্যনারী সমাজ', 'পরিচারিকা পত্রিকা', 'আনন্দ-বাজার', 'কল্পতরু', 'ব্রহ্মোৎসব', The World and the New Dispensation পত্রিকা প্রভৃতির কাজ চল্‌লো, নূতন নূতন গান ও পুস্তক রচিত হল। সগৌরবে গিরিডি ও করাচীতে নূতন নববিধানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। নোয়াখালী, ঢাকা ও ময়মনসিংহে মহোৎসাহে 'নববিধান বিশ্বাসী সমিতির' অধিবেশন হল। কলিকাতায় Association of the Youngmen of Nabavidhan গঠিত হল ও অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথের ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের

সভাপতিত্বে নূতন কর্ম্মপদ্ধতির সূচনা হল। নববিধানের প্রাণশক্তি আবার আত্মপ্রকাশ করলো। পিতৃভবন 'কমলকুটীর'টি নিজে ক্রয় করে তিনি 'ভিক্টোরিয়া কলেজের' ব্যবহারের জন্য একটী ট্রাষ্ট গঠন করে দিলেন। 'কমল কুটীরের' ছবি তুলে তার উপর লিখলেন—'আমাদের অমর ধাম'। 'কমল কুটীরের' সংলগ্ন 'নবদেবালয়', পিতৃদেবের শেষ সময়ে ব্যবহৃত প্রকোষ্ঠ দুটী এবং পিতামাতা ও ভায়েদের সমাধিমন্দিরগুলি যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করে যোগ্যহস্তে ভারার্পণ করেন। নববিধান-বিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় গত ত্রিশ বৎসর অক্লান্তভাবে ঐ ভার বহন করে, ধীরে ধীরে ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি-মন্দির গড়ে তুলছেন।

বাংলায় ও ইংরাজীতে লেখার ও বলার ক্ষমতা মহারাণীর ছিল। তাঁর কথকতা ও উপাসনা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করতো, চিত্তকে স্বর্গীয় শক্তিতে শক্তিমান করতো। তিনি পিতার মত অভিনয়প্রিয় ছিলেন। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায়ই সুন্দর সুন্দর অভিনয় ও টেবলোর ব্যবস্থা করতেন। পিতার জন্মদিনে 'কল্পতরু', উৎসবের সময় 'যাত্রা', 'কথকতা', 'কীর্ত্তন' ও 'আনন্দবাজারের' ব্যবস্থা করতেন ও আনন্দের প্রস্রবনে উৎসবকে ভাসিয়ে দিতেন। বিশেষ করে পর্দ্দানসীন মহিলাদেরকে মুক্ত-প্রাঙ্গণে, সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে মেলা-মেশার সুযোগ দান, নানান জ্ঞান ও বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্যে ব্রহ্মানন্দ যে 'আনন্দবাজারের' পরিকল্পনা করেছিলেন—'ভিক্টোরিয়া কলেজ' ও 'আর্য্যনারী সমাজের' সঙ্গে তাকে জড়িত করে—তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার এই নূতন উপায়টীকে শেষ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

পিতার নামে তিনি পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিতা ছিলেন। তাঁদের ভিতর ভারতীয় নারীদের আদর্শ প্রচার করার কর্য্যে তিনি নিজেকে আদিষ্ট মনে করতেন। সেইজন্যই

ভাই প্রমথলালের উদ্দীপনায় তিনি চারটী সুন্দর বই ইংরাজীতে প্রকাশ করেছিলেন—

1. The Rajput Princesses (1918)
   [Bappa : Warrior and King ; Pudmini the beautiful ; the Golden age of Hindusthan; Krishna Kumari.]
2. The Beautiful Mogul Princesses (1918)
   [Rajput Begum of Akbar ; Mumtaza Mahal ; Princess Reba ; Zebunnissa ; Nurjehan—the Light of the World.]
3. Nine Ideal Indian Women (1919)
   [Sati; Sunity; Sukuntala; Savitri; Shaibya; Sita ; Promila ; Damayanti ; Uttara]
4. The Life of Princess Yashodara : The Wife and Disciple of the Lord Buddha (1929).

আবার পাশ্চাত্য দেশের ছোটো ছেলেমেয়েদেরকে এদেশের গল্প শোনাবার জন্যে 'The Bengal Dacoits and Tigers' বইটী প্রকাশ করেন। বাংলায় তাঁর 'শিশু কেশব', 'সংঘশঙ্খ', 'অমৃতবিন্দু', 'সতী' (অভিনয়) ও 'কথকতার গান' প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজীতে তাঁর 'Prayers' একটি চমৎকার বই।

দেবী যশোধরার জীবন-কাহিনী থেকে কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

বইটির ভূমিকায় মহারাণী সুনীতি দেবী লিখেছেন—

" In placing this short life of the Buddhist Princess Yashodara before the public I must plead for leniency for any shortcomings. My one aim in the book has been to form a vivid word picture of a Princess born in the purple of royalty and wedded to the heir of a great kingdom who became a saint. Never has there been such another Maharani *Bhikshuni*. Through the centuries which have passed her name has been handed down and we find a sweet and living reality in her memory.

The Princess Yashodara first accepted the Prince Sidharta as her heart's love and lord. Later, when he left her to found a new religion, she suffered all that a loving and devoted wife can suffer. Later again she

realised the greatness of his work, and elected to follow him as his disciple. Idolatry then flourished in India, Buddhism was in the throes of its birth. The new cult was not easy to practise. It demanded selfabnegation, suffering and penance. Yet Princess Yashodara, foreseeing its inner meaning, accepted the Lord Buddha as her saviour and became his most ardent follower. Her great love as wife became purified and perfected by the teachings and practice of her husband's religion, and Yashodara shines through the ages a perfect wife, mother, queen and saint."

বইটিতে সিদ্ধার্থের স্বয়ম্বর সভার অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন—

"At the conclusion of the entertainment Sidharta presented each one with an *asokha bhanda* containing a jewel. Each fair recipient made obeisance and returned to her seat. At last all the jewels were distributed, and Prince Sidharta remained standing by the table absorbed in perplexity. He could make no choice, all the maidens seemed alike to him, and he was divided between his own desire for celibacy and his devotion to his father's wish. Suddenly a thrill of admiration magnetised the room, and Prince Sidharta raised his eyes. Floating towards him with angelic grace came a lovely damsel. . . . The winning expression of her face and the radiance of her beauty were so remarkable that even among that vast gathering of lovely maidens she was peerless. Yet it was rather an inward spiritual beauty which radiated from her soft black eyes and captured all hearts. It electrified the Prince, and he made a clearly perceptible movement towards her. Like a queen coming into her kingdom, she stepped into the room and slowly walked up to where he stood, and with gracious dignity asked, in a sweet musical voice, "Is there no present for me, kind sir, because I am late?" The silvery notes of her voice touched an unknown chord in Sidharta's heart; his face paled and then blushed. Love awakened. Their two hearts beat in unison. The hall was hushed and still, it seemed as if they two were alone in all the world, and as their

souls met in rapture Sidharta's deep eyes gazed into hers. Her luminous eyes gave him his answer. . . . . "No, fair maiden, thou wilt not go empty handed," answered the Prince, and removed the emerald necklet he wore and fastened it round her neck. His action broke the spell which had held the assembly. The kingly decision of his action left no doubt of his choice and murmurs of approbation filled the room."

তারপর যশোধরার পিতা নিজে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রদের ক্ষত্রবীর্য পরীক্ষার জন্য তাঁদের অশ্বারোহণে আহ্বান করলেন। সেজন্য একটী দুর্দ্দান্ত অশ্বের ব্যবস্থা করলেন। অন্যান্য রাজপুত্রেরা বিফল হলে, সকলের শেষে সিদ্ধার্থ অগ্রসর হলেন--

"With a caressing hand he gathered up reins and mounted the horse. The animal arched its fine neck as if proud of its master and galloped over the greensward, rider and horse in perfect accord and making a pleasing picture to the beholders. Yashodara was among the spectators, and fear quickly gave place to loving pride at the Prince's success. She whispered shyly to her own heart, "He conquers by love."

বিবাহের পর যশোধরা অবগুণ্ঠন রক্ষা করতেন না—সেজন্য কেউ কেউ প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে তিনি বলেন—

"What need is there for me to hide my love for my husband? . . . Does the river hide itself, or does the moon cover herself? Do they not both reflect the sun in their brightness? My beloved husband is my sun, and I reflect in my face his love for me."

সিদ্ধার্থ সংসার ছেড়ে সত্যের অন্বেষণে যাওয়াই স্থির করলেন। গ্রন্থকর্ত্রীসেই বিদায়ের ছবিটী নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত করেছেন—

"He gently touched Yashodara's feet with his forhead. He longed to take his baby son in his arms once more for the last time, but dared not lift the child, as the wee head was resting on the mother's arm. He bent over to see Yashodara's face once more, and saw, glistening in the bright moonlight, pearl-like tears roll-

ing down her cheeks. Was Yashodara awake or was she dreaming this sad parting?"

"Sleep, sweet Princess, sleep on, the moon is beautifully shining on you, the lotus has closed for the night, the birds have gone to their nests for rest, the strings of the *vina* are silent, all nature is peaceful and quiet, sleep on, beautiful Princess of Sidharta, the sun might awaken you to a sad scene. The day will begin with a new leaf of life, sleep on, fair Princess, thy peaceful sleep."

সিদ্ধার্থের বিচ্ছেদে যশোধরার বৈরাগ্য সংসারকে শ্মশানে পরিণত করলো—যশোধরা সঙ্গীদের বল্লেন—

"Dear kind friends, when I was happy, you shared my joy. Now I am in sorrow, will all of you kindly leave me? I need no jewels, no music, no flowers. This palace is changed into a *Shmashan*. You girls can no longer stay with me. You are all young and beautiful. Seek some other palace, where you will have merriment and pleasure as in the happy days now gone from Bishram-bhavan forever. Make yourselves happy, and forget poor Yashodara and her misery and desolation."

ক্রমে বৈরাগ্যের আগুণে বিশুদ্ধ হয়ে, যশোধরা বৃথা শোক পরিত্যাগ করে স্বামীর ব্রত গ্রহণ করলেন, সন্ন্যাসিনী বেশ ধরলেন। রাজা শুদ্ধোদন ব্যথিত হয়ে তাঁকে প্রত্যাবৃত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহারাণী মহাপ্রজাপতি মহারাজাকে বাধা দিয়ে বল্লেন—

"It is no use grieving so bitterly, Gopa is acting rightly. Now that her husband is a *Samnyasi*, she must dress like a *Sannyasini*."

"All merry sounds had been silenced in the palace where Suddhodhan and Maha Prajapati mourned their son and the Princess Yashodara led the life of a Sannyasini. And out of respect for the royal grief the subjects no longer indulged in music, singing or dancing."

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। পিতার কাছে তাঁর ভিক্ষুর বেশ

ও ভিক্ষার পাত্র অসহ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু মাতা মহাপ্রজাপতি বল্লেন—

"How proud I feel my Sidharta is a Buddha! He has come to relieve the world of sorrow and misery. Go, my people, go, and ask him to bless you, that you may receive the treasure of Nirvana which he has brought with him."

যশোধরাকে বুদ্ধের আগমন সংবাদ দিয়ে, বুদ্ধদর্শনে যাবার জন্য মহাপ্রজাপতি অনুরোধ করলে, তিনি বল্লেন—

"Mother, I bow down to Buddha's feet, but he is my husband, and I have loved him with my heart and soul. My love for him is true, mother, but he left me when I was asleep. He has to come and see me here, and let the people know I loved him, and have been a true wife to him."

মাতা তাঁকে বলেন যে, তিনি এখন বুদ্ধ। ভিক্ষুদের নিয়ম অনুসারে তিনি আসতে পারেন না। তখন যশোধরা দীপ্তবদনে বলে উঠলেন—

"Oh, mother, he is my husband, and if my love is true and heavenly, he will come."

বুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। একে একে সবাই এলেন এবং বুদ্ধ সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ একজনকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিকে তাকালেন ও ধীরপদে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন।

"The Buddha passed through the many corridors and terraces, till he came to the room of his once-beloved wife. Her attire proved that she lived the life of a *bhikshuni*. Buddha entered the room, and Yashodara fell on his feet and sobbed like a little child."

পিতা ও মাতা সে ঘরে ঢুকেই দেখেন যে যশোধরা বুদ্ধের পা দুটি ধরে রয়েছেন। দেখে তাঁরা ভীত হয়ে বুদ্ধের কাছে ক্ষমা চেয়ে বল্লেন—

"Oh, holy one, Yashodara is overwhelmed with grief, and forgets thou art a Buddha now, and has touched thy feet. Revered Sir, kindly forgive her.

Ever since you left her, Yashodara has lived the life of a *bhikshuni*. She has only one very simple meal a day, sleeps on the bare floor, and wears not any jewels or coloured saris."

যশোধরা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"My Lord, do *bhikshus* have no *bhikshunis*? May I not be allowed to follow thy footsteps, and be a *bhikshuni*?"

বারংবার অনুরোধ করায় বুদ্ধ উত্তর দিলেন—

"Rahul is too small; you must do your duty to your child first."

সময় হলে যশোধরা ভিক্ষুণী ব্রত লাভ করেন।

"For Yashodara, life now held a higher meaning. She had suffered much in the seven years of her husband's absence. When she found him again, their souls were reunited, but not in earthly love. Here was true spiritual union. Even as a nun, wherever Yashodara went many women followed her."

বইটির শেষভাগে 'ভিক্ষুণী অবদান' থেকে যশোধরার শিক্ষা উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং ক্ষেমা, নকুল মাতা, বিশাখা, মহাপ্রজাপ্রতি, প্রভৃতি বিখ্যাত থেরীদের কথাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাণী যশোধরার জন্যই বৌদ্ধ-বিধানে নারীরাও ধর্ম্মসংঘে স্থান লাভ করেন। তাঁরা কেবল নারীকুলকে নয়, সংঘকেও ধন্য করেছিলেন।

২২। 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' (১৯৩৩)

—অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত এম্ এ, সিসেষ্টার

অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় একাধারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধক ও শক্তিমান কর্ম্মী ছিলেন। এই বইটি তার সাক্ষ্য। তাঁর জীবনের আদর্শের কথা তাঁর একটী বক্তৃতায় * এইরূপ পাওয়া যায়।

"মাত্র পাঁচ ছয় বৎসর কাল তাঁহার (ব্রহ্মানন্দের) পাদপ্রান্তে বসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ

* 'সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বা নববিধান' ১৯১৭ খৃঃ

করিয়াছিলাম। তাঁহারই সাহায্যে সেই অল্প সময়েই ভগবান ধ্রুবতারার ন্যায় আমার সম্মুখে যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাই সারাজীবন আমাকে চালাইয়াছে; চল্লিশ বৎসরের বিদ্রোহও তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।”

ঐ আদর্শটী কি? তিনি নিজেই ব্রহ্মানন্দের কথায় * তার পরিচয় দিয়েছেন।

“(রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) এই দুই জনে আপনাপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মানুরাগ-বলে হিন্দুসমাজকে এতদূর উচ্চাসনে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না।... তখন ঝনাৎ করিয়া হিন্দুস্থানের দ্বার মুক্ত হইল।...সমুদায় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপনাপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল।...পৃথিবীর সঙ্গে দেখা হইবা মাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজ প্রশস্ত হইল। নববিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন।...পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই ‘নববিধান’।...হে নববিধান, তুমি অন্যান্য ধর্ম্মবিধানের চাবি।”

এই আদর্শই নব অধ্যয়নের গোড়ার কথা। অনেকের ধারণা যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের যোগ কম, Western, তথা Christian Influence-এ তিনি মানুষ। যাঁরা ব্রহ্মানন্দের সমগ্র জীবন ও সাধনা এবং নববিধানতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরাই এই রকম ধারণা পোষণ করেন। যিনি বাল্যে দেওয়ান রামকমল সেনের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে বর্দ্ধিত, নিষ্ঠাবতী বিধবা জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত, নিষ্ঠাবান গুরুর কাছে বাল্যে গৃহে শিক্ষিত, যাঁর বাল্য-ক্রীড়া ছিল নামাবলী গায়ে, টিকিমাথায়, করতাল হাতে, পথে পথে সদলে কীর্ত্তন করা, যিনি জীবনে বিদেশী বেশভূষা ধারণ বা মদ্যমাংস স্পর্শ করেননি, দেশের জল মাটীর সঙ্গে তাঁর কতবেশী যোগ ছিল তা বলার দরকার হয়না। আত্মবিকাশের

* ‘সেবকের নিবেদন’—নববিধান ২রা জানুয়ারী ১৮৮১ খৃঃ

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ স্তর ছাড়িয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন যুগমানব। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি কিশোর, তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। একদিকে পরাধীনতা-তাড়িত দেশবাসীর প্রবল ইংরাজ-বিদ্বেষ ও নৃশংসতা, অন্যদিকে উগ্র শাসক বণিক-ইংরাজের ভারতীয়দের চূড়ান্তভাবে শায়েস্তা করার জন্য পাশবিক আচরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই বিশ্রী সংঘর্ষের মুখে কেশবচন্দ্রও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে দেবতার বাণী শুনে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই ব্রাহ্মসমাজকে নূতন রূপ দান করেছিলেন।

একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের ও অন্য দিকে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ভিতরে প্রবেশ করে, তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে এযুগ হল একাকার হবার যুগ, সমন্বয়ের পথই এ যুগের পথ। তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পৃথিবীর রাজপথে এনে উপস্থিত করলেন ও কেবল হিন্দুত্বের ভিতর আবদ্ধ না থেকে, যাবতীয় ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করার পথ তাকে ধরালেন। এইরূপে পূর্ব্ব-ভারতীয় ঐতিহ্যকে পৃথিবীর সম্মুখে এনে, পশ্চিম জগতের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকে সমঞ্জসীভূত করে, পৃথিবীতে নববিধানের নূতন সাধনা প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিদেশী শাসক ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বোধগম্য করার জন্য তাঁর ইংরাজী বক্তৃতাগুলি যেমন বাইবেলের প্রসঙ্গে পূর্ণ, তেমনি জাতির মর্ম্মস্থল স্পর্শ করার জন্য বাংলা উপদেশ ও প্রার্থনা বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবপ্রসঙ্গে প্লাবিত ছিল। এই কথাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"I also remember that years after his death I read his beautiful Sermons—*Shebaker Nibedan*, so full of devotion and visions of God, the Mother. . . . . He was indeed the embodiment of the consciousness of our race." *

দ্বিজদাসের যখন ২০ বৎসর বয়স তখন দেশের আত্মমর্য্যাদা ফিরে এসেছে, বরং বলা যায় যে দেশবাসী ঐ

* Vide 'India Speaks' B. Koyal, M. A.

ভাবে তখন বিহ্বল। তিনি সেই নবজাত স্বাদেশিকতার ভিতর সংযত ভাবে দেশীয় শাস্ত্র চর্চ্চা করেছিলেন। 'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন' ২ খণ্ড, 'ঋগ্বেদ' ২ খণ্ড, 'বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী', 'Rigveda Unveiled', 'Purusha Sukta', 'Vedantism' প্রভৃতি গ্রন্থ তার ফল। ক্রমে নববিধানের আদর্শ তাঁর দৃষ্টিকে অধিকার করলো। তখন তিনি ইস্‌লাম, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মকে আত্মস্থ করে, 'কোরাণের সূরা ও বেদের সুক্ত সংগ্রহ', 'ইসলাম', 'সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করলেন। তিনি যৌবনে যে প্রভাবের ভিতর বর্দ্ধিত হয়েছিলেন, তার সাক্ষ্য 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' বইটীর উৎসর্গ পত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

"এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রথম উন্মেষ সময়ে যে শিক্ষকের স্নেহ এবং ধর্ম্মোপদেশ আমার আত্মার অন্নজল হইয়াছিল, যিনি পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য থাকিয়া, তাঁহার ঢাকাস্থ আশ্রমে মুন্সী জালালুদ্দিনকে এবং শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সেনাদিকে ও আমাকে এক পরিবারভুক্ত ভাইয়ের মত তাঁহার পরিবারে স্থান দান করিয়া, হিন্দু মুসলমানের একতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যৌবন কালেই আমার চক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া ছিলেন,—গাঢ় কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ সেই ভক্তিভাজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।"

১৮৫৬ খৃঃ ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে দ্বিজদাসের জন্ম। তাঁর পিতার নাম রায় গঙ্গাদাস দত্ত ও মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী। তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। বিদ্রোহে জড়িত থাকায় তাঁদের অবস্থার বিপর্য্যয় হয়েছিল। তার ভিতরেও দ্বিজদাস তীক্ষ্ণ-ধীর পরিচয় দিয়ে মাইনর পরীক্ষা থেকে এম্ এ পর্য্যন্ত বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণবেড়িয়া গ্রামে এক মাইনর স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রাইভেটে মাইনর পরীক্ষা দেন ও প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। তারপর ঢাকায় যান ও এক গ্রামিক আত্মীয় জগমোহন পেস্কার মহাশয়ের বাড়ীতে বাস করে,

Pogose School-এ পড়েন ও ১৫৲ বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরে ভাই বঙ্গচন্দ্রের আশ্রমে বাস করে, ঢাকা কলেজে পড়ে, এফ্ এ পাশ করেন। বি, এ ও এম্ এ পড়ার জন্য তিনি কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সব পরীক্ষাই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। তখন তিনি মুক্তকেশী দেবীকে বিবাহ করেন। বিপ্লবী-বীর শ্রীউল্লাসকর দত্ত মহাশয় * তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিজদাস অধ্যাপনাকেই নিজের জীবনের ব্রত করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজে ও বেথুন কলেজে অধ্যাপনা কবার পর, তিনি সিসেষ্টার বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান ও কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে আসেন। ফিরে এসে তিনি সরকারী বন-বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক এবং শেষ তিনি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে শিক্ষার উন্নতি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তিনি ইংরাজী ভাষা ও জমিদারী আইন বিষয়ে ছু-একটী বই প্রকাশ করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধন শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজদাসের শেষ জীবনের ব্রত ছিল। কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয়, সমস্ত বঙ্গসমাজে, তখন পর্য্যন্ত মাত্র চারজন আরবী শিখেছিলেন জানা যায়। তার ভিতর তিনি একজন। অন্য তিনজন হলেন, রাজা রামমোহন রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও ভাই বলদেব নারায়ণ। মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন তিনি ব্রতরূপে ঐ আন্দোলনে যোগ দেন। খদ্দর ব্যবহার ও প্রচার এবং হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনাকে তিনি বড করে ধরেছিলেন। ১৯৩১ খৃঃ কুমিল্লায় তিনি 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নিজে সস্ত্রীক থাকতেন। ঐ আশ্রমে তাঁরা হিন্দু মুসলমানের একত্র বসবাসের, সাধন ভজনের, পাঠ অধ্যয়নের, মেলামেশার ব্যবস্থা করেছিলেন।

---

* শ্রীউল্লাসকর দত্ত মহাশয় লেখকের অনুরোধে নিজ বংশ-পরিচয় ও পিতার ছাত্রজীবনের কথা লিখে পাঠিয়ে অনুগৃহীত করেছেন।

হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে ১৩৩৭ সনে তিনি 'রায়তবন্ধু' নামে একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় বেদ ও কোরাণের বচন উদ্ধৃত করে, উভয়ের উপাসনা পদ্ধতি ও সার্ব্বজনীনতার বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িকতা যে মিথ্যা ও পাপ ব্রহ্মানন্দের এই উক্তি তিনি সপ্রমাণ করেন। এমন কি, তিনি মুসলমানদের ভিতর নববিধানের কাজ করার জন্য, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ও মস্‌জিদে একসঙ্গে নমাজ পড়েন। একজন অমুসলমান এই ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে নমাজপড়া বোধ হয় এই প্রথম। মুসলমানেরাও তাঁকে আলিঙ্গন করে নেন। কিন্তু তাঁদের ভিতর কেউ কেউ বিষয়টী বিকৃত করে, তাঁকে Muslim Convert বলে সংবাদ পত্রে ছাপিয়ে দেন। তিনি তাতে দুঃখ পান; কিন্তু সেজন্য মুসলমানদের সঙ্গে মিশে, নববিধানের কাজ করার আহ্বানকে তিনি উপেক্ষা করেননি। এ বিষয়ে ঐ সময়ের নববিধান মণ্ডলীর সম্পাদক ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লেখা তাঁর অনেক চিঠি পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে তিনি একটী ইংরাজী বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেটী এখানে দেওয়া হল—

"To avoid misunderstanding, I hereby declare:

(1) I believe in the unity of God "*Allahu ahad* (*Ikhlas* 112-1)" "God is one". Compare Rammohan's "*Tuhfat-ul-mir wa heddin*" or advice to unitarians; and he was known as the Zabardust Moulovi.

(2) I believe that Muhammed came with the special mission of teaching the world that God is one, "*Inmama ana basharun meslukum, Yuha ilaya anna ma Ilahu Kum Wa hadun, fastuqimu ilay he wastag feruhu*" *Hamim* (41-6). "I am nothing but a man like you all: it has been revealed to me that God whom you are to worship, is one only; therefore stand upright towards Him, and pray for his forgiveness.

(3) I believe in Islam as revealed in the Quran and as practised by Muhammad due regard being paid to the distinction drawn in the Quran. (*Al-i-Inram*) (3-6), between *Ayatun Muhka matun* or teaching, universal-

necessary; and *Ayatun Muta Shabehatun*, or teachings local contingent.

(4) I believe that God being one, true Islam and true Hinduism are one, as I have shown in my *Harmony*, 5, August 1928. It is a mistake to speak of me as a convert or as one who has changed his faith; I am a Brahmo; and in my eye a true Musalman and a true Brahmo are one. I believe in the fundamental unity and Harmony of all the revelations granted to mankind,—"*Ma-Yuqalu-laka illa maquad qila ler rasule min qablaka*". (*Ha-Min*) (41-48). "You are not told (O ! Muhammad), anything that the apostles who came before you, were not told," "*Walekulle ummatin rasulin* " (*Yunus*) (10-47). " And to every people was sent an apostle". This is the message of the New Dispensation, revealed in our life-time to Keshub Chandra Sen : (1) "The New Dispensation is the Harmony of all scriptures, and all Saints, and all Sects. (2) to make all churches in the east and the west one undivided and universal church of God" (N.D.I. 841). I look upon the Quran as a higher and a more up-to-date stage of evolution of the truths revealed in the Vedas and Upanishads; and Brahmoism is, I believe, the practical realization of all those truths, in man's daily life.

9th October, 1980, Comilla. DVIJA DASS DATTA"

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী ও নববিধান জয়ন্তী উৎসবের সময় মণ্ডলীর পক্ষ থেকে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁকে যে সম্বর্দ্ধনা দেন সেটী এখানে মুদ্রিত হল—

"নির্জ্জন নীরব সাধনায় অতৃপ্ত হৃদয় আপনার

আজ সজন সদল সাধনের জন্য আগ্রহান্বিত ;

হে অক্লান্ত কর্ম্মী—হে গভীর জ্ঞানী—হে সুধীর ভক্ত—

হে সাধক মহাস্থবির,

কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে জীবনের বিধান-বিরোধ

আপনাতে আজ পরম অনুরাগে পরিণত ;

কৃষি বিজ্ঞানের অনুশীলনে, আপনার রায়তবন্ধু হৃদয় বিশেষ স্পন্দিত;

অশ্রান্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভাষা চর্চ্চায় ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় আপনার ও আমাদের মাতৃভূমি আপনার কাছে ঋণে আবদ্ধ—ইতিহাস দর্শনাদির অধ্যাপনায় ও গবেষণায় দেশের বিদ্বৎ মণ্ডলী আজ কত হর্ষিত!

আর বিধান কাহিনী রচনায়—আজ আমাদের মণ্ডলী কত আনন্দিত, আপনার বিধান সেবা কত আদৃত—আপনার সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী সহানুরাগিনী দেবী মুক্তকেশী আজ এই আনন্দ প্রকাশে আমাদের সহিত আত্মায় আত্মায় মিলিতা, বিধান আশ্রিত মণ্ডলী আজ আপনার ন্যায় বিধান সেবককে আদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া ধন্য হইতেছে, শ্রদ্ধা অর্ঘ্যদান করিতেছে।

বিধান জননী নিজ সেবক নির্দ্দেশ করিয়া, শত-স্ফূর্ত্তি আশীর্ব্বাদে ভূষিত করিয়া বিধান বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দিয়া আপনাকে বিশ্বাসিদলের কাছে চিরজীবিত রাখুন।"

১৮৭৮ খৃঃ ব্রহ্মানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পর যে বিরোধী আন্দোলন হয়, তার স্রোতে তাঁকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় তিনি অনুতাপের সঙ্গে সে কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আত্মাভিমান তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। দ্বিজদাস ছিলেন সত্যের সাধক, আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান। ভুল উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরোধের অবসান হয় ও তিনি সস্ত্রীক নববিধান মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে নূতন কর্ম্মপ্রবাহের সৃষ্টি করেন। 'Behold the man—A Reminiscence of Brahmananda Keshab Chandra Sen' বইটী রচনা করে তিনি বিরোধীতার বহু কুয়াসাজাল সরিয়ে, সত্যের প্রতিষ্ঠা করে যান।

তাঁর রচিত 'সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়' বইটার কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"একথা সত্য যে বৌদ্ধ দার্শনিকেরাই নানাপ্রকার দার্শনিক

মত লইয়া কলহ করিয়া ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম তাড়িত হইবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল। দার্শনিকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, বৌদ্ধধর্ম্মকে বেদেরই একটী শাখা এবং বুদ্ধকে শেষ বৈদিক ঋষি বলা যায়। যজুর্বেদের সময়েই দেখা যায়, যজ্ঞাড়ম্বর এবং যজ্ঞে পশু-বলির বাহুল্য, এমনকি সকল জাতীয় নরবলিরও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা। তখনই চাতুর্বর্ণ্য বিভাগেরও প্রতিষ্ঠা হয়। এ সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই বুদ্ধের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মকে সকল প্রকার বাহ্যাড়ম্বর এবং উপকথার জাল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া, সাক্ষাৎ ধ্যানযোগে অন্তরাত্মার ভিতর হইতে প্রকৃত ধর্ম্মকে বাহির করা— মুসা, ঈশা এবং মহম্মদের যেমন উদ্দেশ্য ছিল, তাহাই বুদ্ধেরও উদ্দেশ্য ছিল।

···ঋগ্বেদ যেমন বলিতেছে, "স ঈংমৃগো অপ্যো" (১-১৪৫-৫), "জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাকে পাইতে হয়" এবং "উত স্বেন ক্রতুনা সম্বদেত। শ্রেয়াংসং দক্ষং মনসা জগৃভ্যাৎ" (১০-৩১-২) "নিজের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার সহিত (ধ্যান দ্বারা) আলাপ করিবে এবং তাহাতে প্রকাশিত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ('still small voice') জীবনের সূত্র জানিয়া অন্তঃকরণ দ্বারা দৃঢ়ভাবে, আশ্রয় করিবে", অথবা বাইবেল যেমন বলিতেছে, "যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে (মথি, ৭-৭); অথবা কোরান যেমন বলিতেছে, "ও-আ-স্তায়িনু বেস্ সাব্রে ও-ওাস্ সালাত" (২-৪৫), "ভক্তি এবং ধৈর্য্যের সহিত পরমেশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর", বুদ্ধও সেইরূপ ধ্যানসাধন দ্বারা "ধম্ম চক্খু" (ধর্ম্মচক্ষু), "দিব্যচ কখু" (দিব্য চক্ষু), বা "প্রঞ্ঞা চক্খু" (প্রজ্ঞা চক্ষু) কোরানোক্ত "এল্মিন" (৬-১৪৯), "এল্মাল ইয়াকিন্" "আইনাল্ ইয়াকিন্" (১০২-৫-৭), বিকাশ দ্বারা মানুষকে সাক্ষাৎ উপলব্ধির পথে—"এল্মের" পথে, আন্দাজ বা অনুমানের (জন্না, ৬-১৪১) পথে নয়, বুদ্ধও নামরূপাতীত

পরমেশ্বরকে কোন নাম না দিয়া, নির্ব্বাণ নামে তাঁহারই আলোকের দিকে লইয়া চলিয়াছিলেন ; কোরান যেমন বলিতেছে, "তুখরে জান্নাসা মিনাজ্জুলুমাতে ইল্লান্নুর" (১৪-১) "মানুষকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে নিবার জন্য" কোরান প্রকাশিত হইয়াছিল, বুদ্ধও "শরবৎ তন্নময়ো ভবেৎ" তীর যেমন লক্ষ্যভেদ করিয়া তাহাতেই লুকাইয়া যায়, মুক্ত বাসনা হইয়া, ধ্যানেতে সেইরূপে পরমেশ্বরের ভিতরে লুকাইয়া যাওয়াকেই বুদ্ধও "পরিনির্ব্বাণ" নাম দিয়াছিলেন ; "পরিনিব্বন্তি অনাসবা" (ধম্মপদ ১০-১১)। মহম্মদ হিরা পর্ব্বতে গভীর ধ্যানযোগে 'ইসলামের' তত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন ; মুসাও সাইনাই পর্ব্বতে ধ্যানদ্বারা তাঁহার নিকটে প্রকাশিত 'দশ আজ্ঞা' সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়া, জগৎকে দিয়াছিলেন। বুদ্ধও সেইরূপ গয়ার পর্ব্বতে, বটবৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, দুঃখ-মুক্তির উপায়-স্বরূপ তাঁহার 'অষ্টাঙ্গ' আর্য্যমার্গ লাভ করিয়া জগৎকে দিয়াছিলেন।

"বুদ্ধকে 'বৃহদারণ্যক', 'ছান্দোগ্যাদি' প্রামাণ্য উপনিষদ্ সকলের প্রায় সমসাময়িক মনে করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধের গৃহত্যাগের সঙ্কল্পও 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদেরই অনুমোদিত। ৪-৪-২২ ও ২৩ 'বৃহদারণ্যক' উপদিষ্ট পরমাত্মজ্ঞান লাভের জন্যই সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধ রাজ্য এবং গৃহপরিবার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'মহাযান' বৌদ্ধদিগের প্রধান গ্রন্থ 'ললিত বিস্তর' সাক্ষ্য দিতেছে—মিথ্যাদৃষ্টিরূপ কুম্ভীর এবং ক্লেশরূপ রাক্ষস যেখানে সকলকে গ্রাস করিয়াছে, সেই ভবসাগর স্বয়ং পার হইয়া, আমি অনন্ত জগৎকে অজর অমর এবং মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দ্যুলোকে প্রবেশ করাইব। 'জাতকেও' বর্ণিত আছে যে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, আমি একাকী ভবসাগর পার হইয়া নির্ব্বাণ পাইতে চাই না। আমি সকল দেবমনুষ্যকে ভবসাগর পার করাইয়া নির্ব্বাণ দিতে চাই।"

"এই সকল দেখিয়া কে না বলিবে, বুদ্ধের ভিতরে

বৃহদারণ্যকোক্ত ঐ অস্ফুট সমন্বয়ের আদর্শই 'নির্ব্বাণ' নামে ফুটীয়া উঠিয়াছিল ?

"বস্তুত বুদ্ধের সময়ে ভারতে জ্ঞানমার্গ কর্ম্মমার্গের বিবাদ, সগুণ নির্গুণ ব্রহ্মের বিবাদ, মায়ার অধীন ব্রহ্ম কি ব্রহ্মের অধীন মায়া ইত্যাকার বিবাদ চলিতেছিল। বুদ্ধের মতন উপনিষদ্ "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা।" (মু, ১-২-৮) ভাঙ্গা নৌকা বলিয়া যজ্ঞের বা কর্ম্মমার্গের নিন্দা করিতেছে। ...বুদ্ধ সকল বিবাদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য 'ঝান' বা সাক্ষাৎ দর্শনের ভিত্তির উপরে বুদ্ধ দাঁড়াইয়াছিলেন। সাধু অঘোরনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে "অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বুদ্ধের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমাধির ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া * বিচার করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ভব হয় নাই "

"প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ 'আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ' এবং সেই আষ্টাঙ্গিক মার্গেরও প্রাণ 'সম্যক সমাধি' বা 'চারঝান' বা ধ্যান। সেই 'সমাধির' 'প্রথমঝান' কি ? বুদ্ধ উপদেশ করিতেছেন, বিষয় বাসনা হইতে দূরে থাকিয়া, কুচিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া "চিন্তা এবং বিচারণা" বা "বিতর্ক" এবং "বিচার" করা। এই বুদ্ধোপদিষ্ট "বিচার বা বিতর্ক" ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের প্রথম সূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের (১-১-১) ভাষ্যে শঙ্কর যে বলিতেছেন "নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ" তাহাই বস্তুত বুদ্ধোপদিষ্ট বিচার বা বিতর্ক। কোরাণও কি 'বুদ্ধিমান্' সাধককে 'উলিল্ আলবাবে' বলেন নাই ? —"ইন্না ফি খাল্ কেস্‌সমা-অ-আতে-ও-আল্ আর্দে ও-আখ্ তেলাফে লায়লে ও-আ নাহারে লা আয়তিন্ লে উলিল্ আলবাবে" (৩-১৮৯)—'নিশ্চয় আকাশের এবং পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবারাত্রির পরিবর্ত্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকসকলের জন্য ধর্ম্মোপদেশ রহিয়াছে।' বুদ্ধোপদিষ্ট দ্বিতীয় ধ্যান কি ? চিন্তা এবং বিতর্ক হইতে মুক্ত হইয়া, তাহার ফলস্বরূপ যে আনন্দ এবং আরামের উপলব্ধি হয়, তাহাতে অবস্থান। বুদ্ধের তৃতীয় ধ্যান কি ? আনন্দ

এবং আরামেরও উপেক্ষক হইয়া আনন্দ এবং আরামে বিহার। চতুর্থ ধ্যান কি? সুখবোধ-বিমুক্ত বিশুদ্ধ শান্তির অবস্থা বা পবিত্রতা এবং পরিশুদ্ধতাতে অবস্থান। উহাই নির্ব্বানের পথ। যীশুর উপদিষ্ট স্বর্গরাজ্য, "Thy kingdom come e.t.c". Matth. 6-10 এবং "Not as I will, but as Thou wilt" 25-39 ও কি তাহাই নয়? কোরাণের "সিরাতুল্ মুস্তাকিম্ বা সত্য সরল পথও তাহাই।..."কোরাণ সৃষ্টি বিষয়ক বিচারের যে ফল বর্ণনা করিতেছে "ল্লাজীনা ইয়াজকুরুনা ল্লাহা কিয়ামান্ ও-আ কুদান ওআ-আলা জুমুবে হিম্ ও-আ ইয়াতাফাক্কারুনা ফি খলকে সমা ও-আতে ও-আল আর্দে। রব্বানা মা খালাক্‌তা হাজা বাতেলান্! সুব্‌ হানাকা ফানেকা আজাবান্নার" (৩-১৯০), "যাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, অথবা শুইয়া আকাশ -পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে বিচার করে, তাহারা বলিয়া উঠে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এ সকল বৃথা সৃজন কর নাই। এ সকল তোমারই মহিমা। (ঈশ্বর বিস্মৃতিরূপ) নরকাগ্নিতে বাসের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" বুদ্ধও সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া ঈশ্বর মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, সম্যক্-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া, পরমেশ্বরে আত্মহারা হইয়া, বিখ্যাত বিজয়গাথাতে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বলিয়া উঠিয়া ছিলেন—'গহ কারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি', 'হে দেহগৃহের নির্ম্মানকর্ত্তা, তোমাকে দেখিয়াছি, শরীরে আত্মবোধ এখন হইতে অসম্ভব"। ইহাতে কি আমরা কোরানোক্ত সালাৎ বা আরাধনা এবং বুদ্ধোপদিষ্ট সম্যক্-সম্বোধিকে একই ব্যাপারের বিভিন্ন আকারে প্রকাশ বলিয়া বুঝিতেছিনা?"

২৩। 'উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব' (১৯৪২)

—অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

জীবন দিয়ে জীবনের অধ্যয়ন বা নব অধ্যয়নের যে ধারা ১৮৭৯ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কয়েকজন মাত্র সাধকের ভিতর সঞ্চারিত করেছিলেন, সেই ধারা অধুনাতম কালেও যে কত স্বাভাবিক

গতিতে প্রবাহিত, অধ্যাপক অরুণপ্রকাশের জীবন ও চিন্তা তার জীবন্ত সাক্ষ্য। Comparative Religion ক্রমে সমন্বয় ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গী রূপধারণ করেছে। সমন্বয় ধর্ম্মকে এক সময়ে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ব'লে ধর্ম্মবেত্তারা ও দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দের কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ঐ সকল বিরুদ্ধ মতকে অগ্রাহ্য ক'রে, তাঁর জীবনে যে সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকেই সমন্বয় বিজ্ঞানের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই সমন্বয় ধর্ম্মই আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনন্ 'Recovery of Faith' বইটীতে ঐ সত্যই ঘোষণা করেছেন—সমন্বয়ধর্ম্মই আজ গৃহীত হচ্ছে এবং গণ্ডীগত ধর্ম্ম*অপসারিত হচ্ছে।

অরুণপ্রকাশের জন্ম হয় ২৩শে জুলাই ১৮৯৫ খৃঃ, তাঁর ঠাকুরদা তারিণীচরণের গৃহে, হুগলী ইমামবাড়ার কাছে ও তাঁর জীবন কাটে পিতৃভবনে লক্ষ্ণৌ পীরজলীলে। এঁর পিতা ও পিতামহ দুজনেই উকিল ছিলেন। পিতামহী বিনোদিনী দেবী মহিলা কবি বলে পরিচিত। তারিণীচরণের মধ্যম অগ্রজ স্বনামধন্য স্বদেশভক্ত রেঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চতম শিক্ষালাভ করে ডাঃ ডাফের কাছে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তারিণীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবীচরণের পুত্র ভবানীচরণ Roman Catholic হন ও বিলাতে—Oxford, Cambridgeএ বেদান্ত ও খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভবানীচরণ ব্রহ্মানন্দের ভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের শবদেহ যাঁরা শ্মশানে বহন করে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের অনুগামী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের শিষ্য হয়ে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহন করেন। শেষে হিন্দুভাবে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও "সন্ধ্যা" নামে একটী পত্রিকা রচনা করেন। কবি

* লেখকের অনুরোধে অধ্যাপক অরুণপ্রকাশ আত্মপরিচয় লিখে পাঠান। সেজন্য লেখক কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গঠনে সাহায্য করেন। ব্রহ্মানন্দের নিকট-ভ্রাতষ্পুত্র অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ও ঐ সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সরকারী চাকুরী ছেড়ে দেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নূতন শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। তখন অরুণপ্রকাশের বয়স ছয় বৎসর। ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে বোলপুরে ভর্ত্তি করে দেন। সেখানে তিনি এক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাঁর 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' প্রবন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

তাঁর মাতা স্বর্গীয়া ব্রজবালা দেবী বিদুষী ছিলেন। তিনি বেলুড় নিবাসী গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। অরুণপ্রকাশের মাতৃকুল বৈষ্ণব ও পিতৃকুল শাক্ত ছিলেন। পিতা প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে Alcott সাহেবের প্রভাবে Theosophist হন—মাও পিতার অনুরোধে যোগ দেন। Mrs. Besant-এর সঙ্গে এঁদের খুব যোগ ছিল। অরুণপ্রকাশ লক্ষ্ণৌ Canning College-এ ইতিহাসে এম্ এ পাশ করেন। পরে অধ্যাপনা কার্য্য করবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রে এম্ এ পাশ করেন এবং সরকারী কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। লক্ষ্ণৌ সহরে তিনি কবি অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তার ফলে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা ও তাঁর ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্গে অরুণপ্রকাশের ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। ঐ সময় তিনি 'অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে' যাতায়াত করতেন এবং সেখানে নববিধান-বিশ্বাসী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের (সাধু অঘোরনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৯১৭ খৃঃ অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, অধ্যক্ষ দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি লক্ষ্ণৌ সহরে আসেন। অরুণপ্রকাশ তখন কানপুরে মিশন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বিশেষ নিমন্ত্রণে তিনি এসে তাঁদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দেন। তাঁদের বক্তৃতাদি শুনে তিনি একটী বিশেষ প্রেরণা পান ও সেই ভাবে 'জীবনবেদের পরিচয়' বইটী রচনা করেন। ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ময়মনসিংহে নববিধান বিশ্বাসী সমিতির অভিভাষণে তাঁর

কথা এইভাবে বলেন—

"আবার সেই জুবিলী উৎসবের ভিতর দিয়া এমন একটি ব্যাপার ঘটিয়াছে এমন একটি আশীর্ব্বাদ আসিয়াছে, যাহার উল্লেখ এখানে করিতেই হইবে। সমস্ত উৎসবের মধ্যে বোধ হয় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ। সেটি 'জীবন-বেদের পরিচয়' নামক গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ। গ্রন্থকার একজন যুবক অধ্যাপক। নববিধানের কথা শুনিয়া তাঁর প্রাণে বিশেষ আক্ষেপ হয় যে কেশবের কথা না বলিয়া কেশব জীবনের উল্লেখ না করিয়া, abstract নববিধানের কথা কেন বলা হইল। তাই কেশব-জননীর প্রেরণায় তিনি 'জীবনবেদের পরিচয়' সংক্ষেপে বিন্যাস করিলেন। ......আজ বিধান জননী এই অপরিচিত যুবকের প্রাণে কেশব জীবনরূপ 'জীবনবেদের পরিচয়' পাঠাইয়া আমাদিগকে নূতন পরিচয় লাভের জন্য বিশেষরূপে আহ্বান করিয়াছেন।"*

সাহিত্য ক্ষেত্রে অরুণপ্রকাশের প্রবন্ধ, গান ও গল্প তাঁব নাবায়ণ, ভারতবর্ষ, সারথী, উত্তরা, বিজয়া, তৃপ্তি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'সাকার ও নিরাকার পূজা' (পৌষ ১৩২৬) 'খৃষ্টীয় ভক্তিবাদ' (ভাদ্র ১৩২৯), 'অবতার বাদ' (পৌষ ১৩৩০) ও প্রেমতত্ত্ব (মাঘ ১৩৩১) প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের সময় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় 'উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সেগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন প্রবাসী, Modern Review, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকা তার সাদর উল্লেখ করেন। ইতি-পূর্ব্বে অরুণপ্রকাশ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে 'Keshab's place in the Religious Culture of Bengal' প্রবন্ধটী লেখেন। সেটিও Navavidhan পত্রিকায় January 7, 1926 প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে তিনি বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলি 'জীবনবেদের পরিচয়' বইটির সঙ্গে

* 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ১লা ও ১৬ই কার্ত্তিক ১৩২৪।

সংযুক্ত করে 'কেশব পরিচয়' নামে প্রকাশিত হয়। 'Jesus Christ as the East Knows Him' শীর্ষক আট দশটি প্রবন্ধ ১৯৪২ খৃঃ 'Navavidhan' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইদানীং কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন সম্বন্ধে 'মা ও ছেলে' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়। 'মুণ্ডক উপনিষদ' সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫০ খৃঃ Bombay Illustrated Weekly (Diwali Number) পত্রিকায় 'Is Contemplation nobler than action' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার জন্য তিনি ৫০০৲ টাকার পুরস্কার পান। ঐ প্রবন্ধেও কেশবচন্দ্রের বিশেষ উল্লেখ ছিল। অরুণপ্রকাশ তাঁর স্বরচিত জীবনকথায় বলেছেন —'কেশবচন্দ্রই আমাকে সমস্ত রচনায় ও ধর্ম্মচিন্তায় পথ দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁর কাছে আমার ঋণ পরিশোধ হবার নয়। অবসর প্রাপ্ত জীবনের শেষ খেয়া আমি উপনিষদ্ লইয়াই কাল কাটাই। উপনিষদ্ আমার অন্নজল, আমার শেষ অবলম্বন। তবু গুরুদেবের গানের ছন্দে বলিতে ইচ্ছা করে—

যাবার দিনে এই কথাটী জানিয়ে যেন যাই
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।"

'উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব' বইটীর কোন কোন অংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল—

"এই বাঙ্গলাদেশের রাজদরবারে ও বনানীতে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। এই দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকায় মহাবীর ও বুদ্ধদেব জীবের মুক্তির জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। এখানকার নদীতীরে ও পথে-প্রান্তরে চণ্ডিদাস ও শ্রীচৈতন্যের মধুর ভগবৎসঙ্গীত আকাশে ও বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এই পুণ্যময়ী বঙ্গভূমিতেই শক্তিময়ী মায়ের নাম রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ অবধি সাধকবৃন্দ স্বীয় বুকের ভিতর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানকার দেশপূজার প্রাঙ্গনে, সকল

ধর্ম্মসম্প্রদায় মিলিত হইয়া, দেশমাতার স্বরূপটী জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হ'ন। পরিশেষে এই দেশেই গঙ্গার তীরে সকল ধর্ম্মের ও সকল মহাপুরুষের মিলনভূমি বারবার স্থাপিত হইয়াছিল ও দিকে দিকে এই বার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার ধর্ম্মজীবন গঙ্গানদী ও পারি-পার্শ্বিক দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল ও বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গাসাগরের নিকটবর্ত্তী কলিকাতা মহানগরীতে, বাঙ্গলার যাহাকিছু নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ সমস্তই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবসম্পদ ও ধর্ম্মবিধানের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য বাঙ্গালীর অন্তরকে নিরন্তর আলোড়িত করিতেছে। দেশের নদনদী ও উন্নতিশীল জনপদগুলি যেমন আকার ধারণ করিতে থাকে, সাধনার কেন্দ্রও সেইরূপ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় জাতির মর্ম্মস্থলে ভাসিয়া চলে এবং সেই কারণে বাঙ্গলার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থানও ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার ভৌগলিক পরিবর্ত্তনের সহিত বাঙ্গলার ধর্ম্ম-ইতিহাস স্মরণ করিলে, মনে হয়, বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে পথের শেষ নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা তনুপ্রধান অর্থাৎ শরীরকে প্রথম অবস্থার কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা তন্ত্রের মধ্যে স্বীয় সাধনার পথ খুঁজিয়া পাইবেন। যাঁহারা মনঃসর্ব্বস্ব তাঁহারা পরমেশ্বরের নামরূপ-মন্ত্রপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মে ধর্ম্মজীবনের সূচনার সংবাদ পাইবেন। যাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া অব্যক্তের দিকে তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহারা বাঙ্গলার প্রবর্ত্তিত সাংখ্যদর্শনে বা অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে স্বীয় পরিণতির ধারা অন্বেষণ করিতে পারেন। তাহা হইলে বুদ্ধিরূপ অগ্নিশিখায় স্বীয় সত্তা অঙ্গার হইয়া গেলে শ্রীবুদ্ধের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহারা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে পর, হয়ত অনুভব করিবেন যে, তাঁহাদের গভীরতম সত্তা যাহা তাঁহারা বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করিতে পারেন নাই, সেই

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন অলক্ষ্যে সাধিত হইয়াছে। উপনিষদে বর্ণিত আছে, "ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয় সমূহ বড়, বিষয়-সমূহ হইতে মন বড়, মন হইতে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধি হইতে আত্মা বড়, জীবাত্মা হইতে জগতের বীজ স্বরূপ অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়, পুরুষ হইতে বড় আর কিছুই নাই, তিনি শেষ, তিনি পরাগতি।" (উপনিষদ্ ১।৩।১০-১১) পৃঃ ১১৪-১৬

"উপনিষদে বর্ণিত তিন প্রকার যোগ ও প্রত্যেকটীর উদাহরণস্বরূপ, বাঙ্গালীর নিকট বিশেষভাবে পরিচিত, তিনজন সাধকের যোগসাধন আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণায়ামপ্রধান যোগ, সাধু অরবিন্দের বিজ্ঞানময় যোগ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মসর্ব্বস্ব যোগ—সমস্তই উপনিষদ্ হইতে গৃহীত। অথচ প্রত্যেক পথটী সাধকের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হয়। শরীরের দিক্ হইতে বলা যাইতে পারে, বিবেকানন্দের রাজযোগের উদ্দেশ্য—প্রাণকে জাগ্রত করিয়া সাধনে অগ্রসর হওয়া, অরবিন্দের যোগের তাৎপর্য্য—মস্তকের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যে শক্তিময়ী পরমারাধ্যা দেবী রহিয়াছেন, তাঁহার শরণাগত হইয়া সাধনে নিযুক্ত হওয়া এবং কেশবচন্দ্রের যোগপথের নিগূঢ় মর্ম্ম—হৃদয়রাজকে হৃদয়ে রাখিয়া, সাধু ভক্তজনের সাহচর্য্যে সাধন-জীবনে অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশমত স্থির থাকা। আর একটী বিশেষ পার্থক্যের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিবেকানন্দ বা অরবিন্দের যোগ একটী বিশেষ ইচ্ছার ফলস্বরূপ, তাহা মুক্তিলাভের ইচ্ছা। কেশবচন্দ্রের যোগে সে ইচ্ছাও নাই, ইহা ব্রহ্মময়ী জননীর ইচ্ছামত যোগ ও লীলার, সাধকজীবনে, অপূর্ব্ব সমন্বয়।

তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনার প্রাচুর্য্যবশতঃ এদেশে যে কতপ্রকার যোগবিধি জন্মগ্রহণ করিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের ধর্ম্ম-জীবনে যে প্রকার যোগসাধন প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা

উপনিষদের ব্রহ্মসাধনার সহিত সংযুক্ত ও উপনিষদে বর্ণিত উপরিউক্ত তিন প্রকার যোগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম এবং জগতের সকল প্রকার ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই পথের সহচর হইতে পারিবেন। সাধকের জীবনে যদি ব্রহ্ম ও সংসারের সহিত পরিপূর্ণ যোগ কোন সাধনার দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা এই প্রকার যোগেই সম্ভব। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই সর্ব্বকালে সমান ভাবে ইহার অধিকারী। অন্য প্রকার যোগ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।" পৃঃ ৯২-৯৩

"তবে কি বাঙ্গলার ধর্ম্মচিন্তার চরম অভিব্যক্তির জন্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে হইবে? সেই উপনিষদের যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত কিছু ধর্ম্মসাধনা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট হইবে নাকি? কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন—('পূর্ণধর্ম্মভবিষ্যতে' উপদেশ দেখুন) "তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল করিবে। ...কেহ যোগতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ নীতিতত্ত্ব, কেহ সেবাতত্ত্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নূতন নূতন সত্যামৃত উদ্ধার করিবেন।"

কেশব আবার বলিতেছেন—

" সকলেই ধন, মান, সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতেছে। প্রচারকেরাও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। কিন্তু এমন সব লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, যাঁহারা কি সংসার-সাধন, কি প্রচার, এই দুই পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, তাহা আবিষ্কার করিবেন। ... এস, আমরা সাধক হইয়া সে সকল রত্ন তুলিয়া লই। কতকগুলি লোক যোগ, ভক্তি ও সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, জগতের অভাব। দিবানিশি তোমরা সাধন কর, সাধনে তোমাদের জীবন শেষ হউক।"

২৪। **ধর্ম্মপাল ও 'মহাবোধি সোসাইটী' (১৮৯১)**—
কাল্পনিক কাহিনী ও বিরুদ্ধ ভাব সরে গিয়ে, নববিধানে বৌদ্ধধর্ম্ম কেমন করে স্তরে স্তরে আমাদের ভিতর প্রকাশিত হল, পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কলনে তার পরিচয় পেয়েছি। সর্ব্বপ্রথমে রেনেসাঁর পরবর্ত্তী পুরাতত্ত্ব-চর্চার ফলে, বিভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্র ও ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ও তার নূতন অর্থ প্রকাশিত হল। তারপর ভগবানের বিধানে, রামমোহনের Higher Criticism বা উচ্চ ভূমিতে বিচার, সকল ধর্ম্মের সাধারণ সত্যে ঐ সকল ধর্ম্মের ঐক্য প্রমাণ করলো। পথ প্রস্তুত হলে, নববিধানের অর্থাৎ অখণ্ড মানব-পরিবারের সংবাদ নিয়ে এলেন কেশবচন্দ্র। সকল ধর্ম্মের সাধারণ সত্যের সঙ্গে, বিশেষ সত্যও গ্রহণীয় হল। তখন ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লব এল। অধ্যাত্ম সাধনায় স্বাধীনতা ও সমন্বয় মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করে দিল—প্রথমতঃ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে, তারপর মূল গ্রন্থের অধ্যয়নে, নব চিন্তা, নব দর্শন, নব ভাষ্য ও নব ভাস্কর্য্যের সৃষ্টিতে; সব গুলির মিলিত ফল হল, দৈনন্দিন জীবনে সকল ধর্ম্মের সন্নিবেশ। সেই সঙ্গে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম্মকেও পেলেন।

অনুষ্ঠানরূপে ব্রহ্মানন্দের 'সাধু-সমাগমই' তারসর্ব্ব প্রথম পথ-প্রদর্শক। ঐ অনুষ্ঠানের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলের বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ-তলায়। সেই পবিত্রভূমিতে বসে তিনি সদলে ধ্যান ও প্রার্থনা করলেন, সেখান থেকে তাঁরা প্রস্তর-খোদিত শাক্যমূর্ত্তি সংগ্রহ করে আনলেন। সাধু-সমাগমে তাঁরা বৌদ্ধ হয়ে গেলেন ও শাক্যকে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিতর দেখে ধন্য হলেন। ক্রমে হীনযান-পন্থী 'বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা', 'মহাবোধি সোসাইটী' ও মহাযানপন্থী 'নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ বিহার'* (অন্ধ্রদেশের) প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান এই বৌদ্ধশূন্য ভারতবর্ষে দেখা দিল। তারপর যখন ডাঃ বি আর আম্বেদকার তাঁর অনুগামী পাঁচলক্ষ অনুন্নত জাতির মানুষদের নিয়ে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করলেন, সেই ব্যাপারে যে নূতন কিছু হল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলোনা। হিন্দুসমাজ, এই বিজ্ঞান ও সাম্যের যুগেও, জাতিভেদ এবং

* এঁদের মুখপত্র 'Mahakarunik' একটী নূতন পত্রিকা।

অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারেনি। ব্রহ্মানন্দের ব্রাহ্মসমাজ তার পথ দেখিয়েছিল, কিন্তু পুরাণো সমাজ বিধর্ম্মী হবার ধূয়ো তুলে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের সে পথে যেতে দেয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের 'নর-নারায়ণ' মন্ত্র দেশবাসীর চিত্তকে স্পর্শ করলো, কিন্তু তাকে বাইরের সেবার প্রতিষ্ঠান মাত্র করে রেখে দিল। মহাত্মাজীর হরিজন আন্দোলনে তাদের উন্নত করার ব্যবস্থা হল, কিন্তু সামাজিক-সাম্য বিধান করতে পারলোনা। এখন নূতন করে বৌদ্ধসংঘের গঠনে অনুন্নত শ্রেণীরা নিজ মর্য্যাদা লাভ করবে বলেই আশা করা যায়। কারণ, মূলে বৌদ্ধসংঘ তাদেরই সংঘ ছিল। আর আজ যে এই সংঘ সম্প্রদায় মাত্র হয়ে দাঁড়াবেনা, যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও সমন্বয়ের ভাবে পারিবারিক সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মের সঙ্গে গড়ে উঠবে, সে কথা নিশ্চিত, কারণ আজ সাম্প্রদায়িক ভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব।

আমরা যদি ইয়োরোপের দিকে তাকাই, সেখানেও ঠিক ঐ চিত্রই দেখতে পাই। সেখানেও রেনেসাঁর পরবর্ত্তী পুরাতত্ত্ব চর্চার ধারা ঐ চর্চাতেই শেষ হয়নি, ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে বৌদ্ধ সংঘেরই প্রতিষ্ঠা করেছে। বিখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer (১৭৮৮-১৮০৭) বৌদ্ধধর্ম্মকে দর্শনের মর্য্যাদা দিলেন; প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও চিন্তা যে আজগুবি কল্পনা বা কুসংস্কার মাত্র নয়, তারও একটী গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে, এই কথা তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভিতর প্রচার করলেন। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—একদিনে তার সব কথা জানা যায় না, বোঝাও সম্ভব নয়। সেটা নানা অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। Richard Wagner (১৮৫৬) নাটকে ও সঙ্গীতে বৌদ্ধধর্ম্মে নবজীবন-লাভের কাহিনীগুলি পরিবেশন করলেন। মনীষী Koeppen (১৮৫৯) তাঁর Critical Research আরম্ভ করলেন। Comparative Religion ও Philologyর জনক Friedrich Max Muller (১৮৬৯) নিজ জীবনে বুদ্ধের শিক্ষার সাদৃশ্য দেখে, এক বক্তৃতায় নিজেকে বুদ্ধের অনুগামী

বলে পরিচিত করলেন। অনেক মামুলি কবি বৌদ্ধ-মুদিতা ও মৈত্রীর কাহিনী রচনা করে, বুদ্ধ-চরিত্রকে আরো মনোমুগ্ধকর করে তুললেন। Stefan Zweig, Thomas Mann, Herman Hesse প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকেরা বুদ্ধ-প্রকাশিত অধ্যাত্মরাজ্যের ভিতরের কথা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করলেন। দার্শনিক Herman Oldenberg (১৮৮১) 'Buddha—sein Leben, seine Lehre und seine Gemeidne' বা বুদ্ধের জীবনী, ধর্ম্ম ও সংঘ বইটীতে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করলেন। বইটী ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হল। তাঁরা আর কেবল গবেষণা বা সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর বুদ্ধকে রেখে সন্তুষ্ট হলেন না—নিজেদের ভিতর দেখবার জন্যে উৎসুক হলেন। Karl Seidenstuecker, Karl Eugen Neumann, Wilhelm Geiger বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। আলোচনা-সভা গঠন, পুস্তক প্রকাশ, দর্শন-বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁরা প্রচার আরম্ভ করলেন। ১৯০৫খৃঃ Der Buddhist নামে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হল। তারপর নূতন নূতন পত্রিকা প্রকাশ করে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার চল্ল। ১৯০৩খৃঃ Leipzigএর কাছে Buddhistiche Missionsverain নামে একটী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার সমিতি গঠিত হল। ১৯১১ খৃঃ থেকে ঐ সভা মহাবোধি সোসাইটীর শাখারূপে পরিগণিত হয়েছে। আরেকটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন Walter Markgraf (তাঁর পালি নাম—সমনেরো ধম্মানুসারী), ঐ সমিতির নাম Deutsche Pali-gesellschaft বা জার্ম্মাণ পালি সমিতি। Dr. Bohn গড়লেন 'Bund fuer Buddistische Leben' বা বৌদ্ধপন্থিদল। ১৯৫৫ খৃঃ Frankfurtএ 'Deutsche Buddhistische Gesellschaft' বা জার্ম্মাণ বৌদ্ধ সমিতি গঠিত হল। দুই মহাযুদ্ধে অনেক প্রতিষ্ঠানই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধের চিন্তা অব্যাহত আছে। নূতন নূতন মানুষ নূতন নূতন পত্রিকা, পুস্তক ও ধর্ম্মবিহার গড়ে তুলেছেন। বৌদ্ধেরা এবং যে সব মানুষ বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করেন, ঐ সববিহার তাঁদের কেন্দ্র হয়েছে।

মহাপরিনির্ব্বাণের ২৫০০ বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে, Marburg Universityর কাছে এক গ্রামে তাঁরা এক বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বর্ত্তমান বৌদ্ধদের মধ্যে Paul Dahlke, Georg Grim, Tao Chuen, পণ্ডিতবর Nyanatiloka, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী Hofmann, বিখ্যাত গায়িকা Else Buch-holz (যাঁর পালিনাম উপ্পলাবন্ন) ও ভিক্ষু অনিরুদ্ধের (Rudolf Petri) নাম করা যায়। এঁরা তিব্বত, জাপান, সিংহল, দক্ষিণ ভারত ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন। ভিক্ষু অনিরুদ্ধ এখন Swedenএ। ডাঃ আম্বেদকার এঁর কাছেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নেন। জার্ম্মাণীতে বৌদ্ধধর্ম্ম যে রকম স্থান লাভ করেছে, অন্যদেশে—সে রকম না হলেও—অধ্যয়ন, গবেষণা ও চিন্তার দিক থেকে সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ বৌদ্ধধর্ম্মকে স্বীকার করে নিয়েছে।

তিব্বত, চীন, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, জাপান প্রভৃতিকে বৌদ্ধদের দেশ বলা যায়—কিন্তু সেখানে স্থানীয় আচারের মিশ্রণে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত আকার ধারণ করেছিল। নবযুগের সংঘাতে ঐ সব দেশে ধর্ম্মের ও সংঘের রূপান্তর চলেছে। বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশের প্রতিনিধিদের সংমিশ্রণে আরো পরিবর্ত্তন আনবে, সন্দেহ নেই। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতা বুদ্ধের প্রভাবে গঠিত। আধুনিক সময়েও তাঁরা বুদ্ধকে সমান সম্মানের আসন দিয়ে রেখেছেন। এক সময় চীন সম্রাটদের আমন্ত্রণে ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যেরা তাঁদের দেশে গিয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। বুধিধর্ম্ম চীনে 'চিয়ান্' বা ধ্যান পন্থা আরম্ভ করেন। পারমার্থ ও কুমারজিব বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন; নাগবোধি ও অমোঘবজির 'মিংসুঙ' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিব্রাজক ইৎসিং, ফাহিয়ান, হুয়েনসাঙের কথা সকলেই জানেন। আধুনিক সময়েও দেখা যায়, চীনা সমাজ-সংস্কারক Tai Hsu মহাবোধি সোসাইটীর মাধ্যমে ভারতবাসীদের কত বিষয়ে সাহায্য করেছেন। মহামান্য Fa Fang সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ে চৈনিক ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যাপক হয়ে আসেন। Tan

Youn Shah বিশ্বভারতীর চীনা-ভবনের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাপানও এই ধরণের যোগ বরাবর রেখেছেন। ডাঃ সুজুকি, নোগুচি ও টাকাসুকির কথা সবাই জানেন। জাপানী শিল্পী Kosetsu Nosu সারনাথের মন্দিরের গাত্র-চিত্রগুলির সংস্কার করে ভারতবাসীদের চিরঋণী করে গেছেন। চিরদিন এই ধরণের আদান প্রদান চলে এসেছে। বৌদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে এই যোগ নূতন শক্তি পেয়েছে, এই সব ব্যাপারে মহাবোধি সোসাইটীর দান অশেষ।

অনাগরিক হেওয়াভিতারনি ধর্ম্মপাল্ সিংহলের এক অভিজাত বংশের সন্তান। তাঁর জন্ম হয় কলম্বো সহরের অন্তর্গত পেট্রা গ্রামে, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৪খৃঃ। London Telegraph সংবাদ পত্রের সম্পাদক Edwin Arnold ভারত ভ্রমণ করে ফিরে গিয়ে, নিজের কাগজে বুদ্ধগয়ার 'মহাবোধি-মন্দিরের' দুর্দ্দশার কথা লেখেন। সে সময়ে সিংহলে Theosophistদের প্রভাব। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে এত বেশী নাড়াচাড়া করতেন যে, লোকে দুটীকেই এক জিনিষ বলে মনে করতেন। ধর্ম্মপালের বয়স তখন ২৭ বৎসর, Colombo Buddhist Theosophical Societyতে কাজ করেন। ঐ প্রবন্ধগুলি তাঁর চোখে পড়ে ও তাঁর মনে একটা আন্দোলন আনে। তিনি এক জাপানী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় যান ও নিজের চোখে 'মহাবোধি-মন্দিরের' দুরবস্থা দেখে, ঐ মন্দির পুনরুদ্ধার করার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেন। সিংহলে ফিরে গিয়েই ৩১শে মে, ১৮৯১ খৃঃ কলম্বো সহরে ঐ 'মহাবোধি-মন্দিরের' পুনরুদ্ধারের জন্যে 'মহাবোধি সোসাইটী' প্রতিষ্ঠা করেন; শ্যাম, জাপান, সিংহল, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতিনিধি বেছে নেন; Theosophical Societyর সভাপতি Col. Olcottকে ডিরেক্টর, সিংহলের সুমঙ্গল মহাথেরোকে সোসাইটীর প্রধান নায়ক ও নিজেকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। মুসলমান আক্রমণের পর থেকেই ঐ মন্দিরের দুর্দ্দশার আরম্ভ হয়। ক্রমে মন্দিরটী হিন্দু মহন্তদের হস্তগত হয় ও মন্দিরে বুদ্ধের নীতি-বিরুদ্ধ জীবহত্যা প্রভৃতি

হতে থাকে। বহু আন্দোলন, মামলা মোকদ্দমা করেও মন্দিরটী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই মহন্তদের ব্যাপার খুবই অদ্ভুত এঁরা ধর্ম্মসমাজের জমিদার। শিখদের বহু মন্দিরও এই মহন্তরা হস্তগত করেছিলেন এবং এখনও অধিকার করে আছেন।

'মহাবোধি সোসাইটীর' কাজকর্ম্ম ধীরে খুবই ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯০৪ খৃঃ সোসাইটীর কর্ম্মকেন্দ্র কলম্বো থেকে কলিকাতায় সরিয়ে আনা হয়। ১৯০৮ খৃঃ প্রাচীন তক্ষশীলা ও ভট্টিপ্রলুতে বুদ্ধদেবের তিনটী পুণ্যাস্থি আবিষ্কৃত হয়। তখন ঐগুলির সুব্যবস্থা করা বৃটিশরাজের একটা সমস্যা হয়েছিল। আরও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল—সেটা হল তিব্বতের দালাইলামার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। এই দুটী কাজের ভারই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর তাঁরা ন্যস্ত করেছিলেন। দালাইলামার অভ্যর্থনার জন্য ভারতের নানা স্থানে যে সব বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁদের একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই জন্যই 'বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভার' জন্ম। এঁরা অনেক কাজ করে থাকেন। এঁদের মুখপত্র 'জগজ্জ্যোতি' একটী ভাল পত্রিকা। আর, পুণ্যাস্থির ভার 'মহাবোধি সোসাইটীকে' দেওয়া স্থির হয়—এই সর্ত্তে যে, কলিকাতা, সারনাথ ও তক্ষশীলায় তাঁরা তিনটী বিহার নির্ম্মাণ করবেন। বহু চেষ্টা, অধ্যবসায় ও বহুজনের দানের ফলে ঐ বিহার নির্ম্মাণ সম্পন্ন হয়। স্যার জন মার্শাল অজন্তা মন্দিরটীর অনুকরণে নক্সা তৈরী করেন ও বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী এম, এম, গাঙ্গুলী মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে মন্দির-গঠনের তত্ত্বাবধানের ভার নেন। এই সকল কাজের জন্য ১৯১৫ খৃঃ সোসাইটীকে আইনমত রেজিষ্ট্রী করতে হয়। ১৯২০ খৃঃ ২০শে সেপ্টেম্বর ঐ চৈত বিহারের উদ্বোধন হয়। অগণিত বৌদ্ধভিক্ষু—ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, জাপান, শ্যাম দেশীয় হাজার হাজার বৌদ্ধ ও হিন্দু এক বিরাট শোভাযাত্রা করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিনিধি হিসাবে সবার আগে আগে গরদের কাপড় পরে, গরদের চাদর গায় দিয়ে, খালি পায়ে চলতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপাল

ও মিসেস বেশান্ত ছিলেন। লাট ভবনে গিয়ে, লাট সাহেবের হাত থেকে স্যার আশুতোষ ঐ পুণ্যাস্থি নেন ও ধর্ম্মপালের হাতে এনে দেন। ধর্ম্মপাল ছ-ঘোড়ার গাড়ীর উপর স্থাপিত সিংহাসনে ঐ অস্থি-আধারটী রেখে, শোভাযাত্রা করে ধর্ম্মরাজিক বিহারে এনে নবনির্ম্মিত স্তূপের ভিতর স্থাপন করেন। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লর্ড রোনাল্ডসে। তখন রাজা কামহমেহরের বংশধর এক হাওয়াইয়ান্ মহিলা মিসেস্ মেরী ফষ্টারের সঙ্গে ধর্ম্মপালের পরিচয় হয়। ঐ মহিলাটী এই সব কাজে দশ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি তাঁর নিজ পৈত্রিক সম্পত্তির প্রায় চার লক্ষ টাকা এই সব কাজে ব্যবহার করেন। এঁদের ইংরাজী মুখপত্র 'Mahabodhi' পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছে। সম্প্রতি তাঁরা হিন্দি ও বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। সারনাথের মন্দিরটীরও সংস্কার করা হয়েছে। সেখানে মহামান্য বিড়লার অর্থ-সাহায্যে একটী বিরাট যাত্রিনিবাস, তা ছাড়া গ্রন্থাগার, কলেজ, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, পান্থশালা, প্রভৃতিও নির্ম্মিত হয়। ক্রমে বুদ্ধগয়া, দিল্লী, বম্বে মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, গয়া, কালিকট, নৌতনওয়া, সাঁচি, আজমীর কটক, ভুবনেশ্বর, কালিমপঙ, লণ্ডন ও জার্ম্মাণীতে শাখা স্থাপিত হয়। সর্ব্বত্র যোগ্য ভিক্ষুরা কার্য্য পরিচালনা করে থাকেন। সম্প্রতি 'ধর্ম্মদূত' নামে কর্ম্মি-সংঘ গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক শাখায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, পান্থশালা সেবাব্রত সংযুক্ত আছে। এঁরা বিভিন্ন ভাষায় বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। পবিত্র জীবনব্রত সুসম্পন্ন করে কর্ম্মবীর ধর্ম্মপাল ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩ খৃঃ সারনাথে পরলোক গমন করেন।

তারপর যোগ্য হস্তেই কার্য্যভার পড়েছে। বর্ত্তমান কর্ম্মী শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ, জিনরত্ন থেরো ও সংঘরত্ন থেরোর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা বলে শেষ করা যায় না। ঐ সঙ্গে আমার সহপাঠী, ভারতমাতার সুযোগ্য পুত্র, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বহু বৎসর সভাপতিরূপে সোসাইটীর যে উন্নতিসাধন ও সাহায্য করেন, তার কথাও বলা উচিত। স্যার আশুতোষ একদিন বুদ্ধদেবের পুণ্যাস্থি বৃটিশ সরকারের হাত থেকে নিয়ে মহাবোধি সোসাইটীর

হাতে এনে দিয়েছিলেন; তেমনি ১৯৪৯ খৃঃ ভারত সরকার London Museum এর কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে, অর্হন সারিপুত্র ও মোদ্‌গল্যানের পুণ্যাস্থি আনিয়ে নিলে, ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ খৃঃ এক বিরাট সভায় কলিকাতা ময়দানে সেই পুণ্যাস্থি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের হাতে দেন ও তিনি সেটী মহাবোধি সোসাইটীর হাতে দেন। মহাবোধি সোসাইটী তার কতকাংশ সাঁচিতে রাখেন; কতকাংশ সিংহলকে দান করেন; ও অবশিষ্ট অংশ ব্রহ্মদেশকে দান করেন। ঐ পুণ্যাস্থি নিয়ে, মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিনিধিরা তিব্বত, সিকিম, নেপাল, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি দেশে যান ও সেই দেশ-বাসীরা ঐ পুণ্যাস্থির পূজা অর্চ্চনা করে কৃতার্থ হন। ১৯৫৬-৫৭ খৃঃ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে মহাবোধির প্রতিনিধিরা থাইল্যাণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশে গিয়ে নূতন করে ভালবাসার আদান প্রদান করে আসেন। বুদ্ধের শিক্ষায় ও সাধনায়, বুদ্ধের কীর্ত্তিরক্ষায়, বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-স্থাপনে আজ কেবল ভারতবাসী নয়, ভারত সরকারও নিযুক্ত। আর অনুন্নত শ্রেণীরা বৌদ্ধসংঘে নিজস্ব সামাজিক অস্তিত্ব ফিরে পাওয়ায়, ভারতবর্ষ যেন একটী নষ্ট অঙ্গ ফিরে পেয়েছে। ১৮৯১ খৃঃ ধর্ম্মপাল যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এদেশে বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান ছিলনা। একমাত্র ব্রহ্মানন্দ-প্রবর্ত্তিত সমন্বয়-ধর্ম্মের প্রভাবে ও পরিচালনায় বুদ্ধের শিক্ষা ও সাধনার পুনঃপ্রবর্ত্তন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রকাশ-কার্য্যের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর সহসাধকেরা সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করে, তার বিষয় পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তা এখন ইতিহাসের পর্য্যায়ে গণ্য হবে। সাধু অঘোরনাথের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন যিনি মোসলমান ধর্ম্মের অধ্যেতারূপে বহু আরবী, পারসী, উর্দ্দু গ্রন্থ এবং কোরান্ শরীফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন, তিনি ব্রহ্মদেশে প্রচার-কার্য্যে গিয়ে বর্ম্মায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন ও সেই সকল বৃত্তান্ত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এবং 'মহিলা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ

করেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে একটী সুন্দর বই হতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ যখন মহর্ষির সঙ্গে সিংহল-ভ্রমণে যান, সেখানে শত শত বৌদ্ধদের মিলিত মণ্ডলীগত (congregational) ত্রিশরণ পাঠ দেখে মুগ্ধ হন ও মহর্ষির সঙ্গে পরামর্শ করে, সেই রীতি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গীভূত করেন। তখন থেকেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং....' ও সাধারণ প্রার্থনার মন্ত্র একত্র উচ্চারণ করা আরম্ভ হয়। রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মকে মঠ ও গিরিগুহা থেকে সহরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ সেই ধর্ম্মকে সংসারে ও দৈনন্দিন কাজে কর্ম্মে যুক্ত করেন ও ধর্ম্মের বেড়া ভেঙ্গে দেন। জীবে দয়া, সেবাধর্ম্ম ও আতিথ্য ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। বুদ্ধের শিক্ষায় এইগুলি আরো উন্নততর রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্মের বহিষ্করণের সঙ্গে সে ভাব চলে যায়। নবযুগে ব্রহ্মানন্দই এইগুলিকে কেবল ব্যক্তিগত ভাবে পালন করা নয়, প্রতিষ্ঠান গঠন করে পালন করার আদর্শ ধরে, সেবাকে জাতীয় জীবনে আবার একটা উন্নততররূপ দান করেন। এই ভাব নবযুগের প্রভাব কিম্বা পাশ্চাত্য বা খৃষ্টীয় প্রভাব, সেকথা বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যে এই ভাবের প্রবর্ত্তনে জাতীয় জীবনকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করে দেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৬১ খৃ: থেকে মানবের সেবার জন্য—দুর্ভিক্ষত্রাণ, সংক্রামক রোগের চিকিৎসা, জনসাধারণকে শিক্ষাদান, স্বেচ্ছাসেবকরূপে যাতায়াত করা আরম্ভ করেন। দেশ বিদেশে কর্ম্মী ও সাহায্য পাঠান আরম্ভ হয়। ক্রমে এই কাজ প্রতিষ্ঠানের আকার নেয়—অনাথ আশ্রম, আতুরালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভারত সংস্কার সভা, পান্থশালা বা ধর্ম্মশালার অভিব্যক্তিরূপে ভারত আশ্রম, ব্রাহ্মনিকেতন, প্রচারাশ্রম, পল্লীসংঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। আমার পিতৃদেব পূজ্যপাদ ডাক্তার হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন সমাপ্ত করে, প্রথমেই অমরাগড়ী গ্রামে গিয়ে, এই রকম

এক দাতব্য চিকিৎসালয় সংগঠনের কার্য্যের ভার নেন। ঐ চিকিৎসালয় এখন একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে। পরবর্ত্তী জীবনেও যখন শালিখা ঘুস্থড়ীতে এক বড় প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এই দাতব্য চিকিৎসার কাজ করে জনগণের বহু উপকার করে গিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠকে বহু সাহায্যও করেন। আমার মাতুল ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এবং আমার পত্নীর পিতামহ রায় বাহাদুর ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও, বহু পরিবারে ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে স্ত্রী-চিকিৎসা করে জনসাধারণের উপকার করেছেন দেখেছি। ইনি 'কাশীপুর নর্থ স্থবরবণ হাঁসপাতালের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরে ইঁহার তৃতীয় পুত্র আমার পত্নীর পিতা শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সভাপতিরূপে বহু উন্নতি করেন। সহজ সেবার ভাবে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় সস্ত্রীক একটী অনাথাশ্রম গঠন করেন। ঐ অনাথাশ্রম আজ একটী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এইরূপ বহু পাব্‌লিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে তার জন্মের ইতিহাস ব্রহ্মানন্দের এই নূতন জাতীয়-সেবাব্রতের ভিতর পাওয়া যাবে!

সেই শুভমুহূর্ত্তে একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ চারিদিকে সেবার কাজ আরম্ভ করেন, অন্যদিকে ধর্ম্মপাল মহাশয় বুদ্ধের নাম নিয়ে এদেশে উপস্থিত হন। Theosophical Societyর মাধ্যমে তিনি নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ সূত্রে ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন ও শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। ভাই প্রতাপ-চন্দ্রই এই উৎসাহী যুবককে Chicago Parliament of Religionsএ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। তখন তাঁরাই এঁর পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁরাই সর্ব্বপ্রথম Liberal পত্রিকায় বুদ্ধগয়ার মহাবোধি-মন্দিরের মামলায় ধর্ম্মপালকে সমর্থন

করেন। পরে ১৮৯৬ খৃঃ ধর্ম্মপাল মহাশয় কলিকাতায় 'মহাবোধি সোসাইটীর' কর্ম্মকেন্দ্র সরিয়ে আনেন ও ক্রীক রো স্থিত একটী গৃহে তার কাজ আরম্ভ করেন। সেখানেই তিনি থাকতেন। ব্রহ্মানন্দের মাতৃদেবী সারদাসুন্দরীকে তিনি 'মা' বলতেন। তাঁর কাছে এসে আহারাদি করতেন। তাঁকে কাপড় দান করে প্রণাম করতেন। নিজের মা, বাবা ও এক ভাইকেও সঙ্গে করে তাঁর কাছে এনেছিলেন। এই ভাইটী পরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে সিংহলে নিহত হয়। ধর্ম্মপালও ভাইয়ের সঙ্গে ইংরাজ-বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত, সন্দেহ হওয়ায়, বহুদিন ভারতে বহিষ্কৃত (Externed) হয়ে থাকেন। ধর্ম্মপালের সঙ্গে Mongolian Grand Lama সেন মহাশয়ের গৃহে আসেন। কলুটোলা বাড়ীর উঠানে ধর্ম্মপাল মহাশয় বুদ্ধদেবের জন্মদিন অনুষ্ঠান করেন। তার পর প্রতি বৎসর সেখানে প্রদীপ জ্বেলে উৎসব করতেন। ঐ সময়ে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারীর এক কন্যার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মপাল মহাশয় এসে দেহের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে, 'পরিপূর্ণম্ তদস্তু তে' উচ্চারণ করে, শান্তিবাচন করেন। এই পরিবারের একটী সন্তানকে বৌদ্ধধর্ম্মে নেবার জন্য তিনি অতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। ধর্ম্মপাল মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত একটী চিঠির ফটোচিত্র এখানে দেওয়া হল—

Jyotish Prakash Sen Esq
Krishna House
Bhowani Charan
Datt St.

My dearest Jyoti,

I shall leave this place at 10.30 or 11. a.m.

I hope I shall have the pleasure of seeing your mother and getting her consent to have Asoka as my "spiritual son".

Yours Ever

Anagarika Dharmapala

29. V. 2451

1907

মূল চিঠি ও ধর্ম্মপাল মহাশয়ের সঙ্গে এই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কথা শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন মহাশয়ের নিকট পাওয়া যায়। সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিশ্বভারতী' (১৮৯১-১৯৪১ খৃঃ)—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভিতরেও ঐ সুমিষ্ট সম্বন্ধ অটুট ছিল। ৬ই মে, ১৮৬১ খৃঃ জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ঐ সময় ব্রহ্মানন্দ সস্ত্রীক তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। সেই পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করেই ব্রহ্মানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখে * জানিয়েছিলেন—

Uttarayan,
Santiniketan,
17th November, 1937.

The first opening of my eyes to the light of the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chunder Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for some time at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. Since then I have journeyed on across a long stretch of time through the vicissitudes of amazing experiences of creative religion in Bengal which greatly owes its evolution to the dynamic power of the devotional genius of Keshub Chunder, till at last the opportunity is given me nearly at the end of my days when I could bring the offering of reverent homage in my own name and in that of my countrymen to the sacred memory of Brahmananda on the occasion of his centenary celebrations.

RABINDRANATH TAGORE.

অবস্থার চক্রে ঐ ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য এক সময় দূরত্বে পরিণত হয়েছিল। আবার সময়ের সঙ্গে কবির দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটেছিল ও তিনি ব্রহ্মানন্দের সেই উদার আদর্শকে গ্রহণ

* Vide: Navavidhan December 8, 1938

করে ধন্য হয়েছিলেন। এই সকল কথা কবি তাঁর একটী বক্তৃতায় ব্যক্ত করেছেন (২৪ পৃঃ দ্রঃ)। কবির সমগ্র রচনায় অন্যত্র ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে কোন কথাই আমরা দেখতে পাই না। সে যাহাই হোক, কবির জীবন আলোচনা করলে বহু ক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়। প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার ভাব * কবির রচিত বহু 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পূর্ণ করে আছে। স্বাধীনতা ও শিষ্যপ্রকৃতি দুজনেরই জীবনকে প্রথম থেকে অনন্ত উন্নতির ও সামঞ্জস্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল। নৈতিক ফলাফল বিচার দুজনেরই কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের রীতি ছিল। তার ফলে তাঁরা কাজে কর্ম্মে যেমন দূরদর্শিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি আবার সেই জন্যই, দুজনকেই সময়ে সময়ে সাধারণের কাছে নির্য্যাতিত হতে হয়েছিল।

দুজনেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়-সাধনে যত্নবান ছিলেন। একদিকে তাঁরা ইংরাজের গুণান্বেষী ও মিত্রতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অন্যদিকে ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়ের দোষের স্পষ্ট ও নির্ভীক সমালোচনা করতেও তাঁরা কখন পশ্চাৎপদ হননি। বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জ্জাতিকতা দুজনেরই বৈশিষ্ট ছিল; অথচ জাতীয়তার শাশ্বত রূপ দুজনেরই চরিত্রকে পুষ্ট করেছিল। জাতীয়তা অর্থে তাঁদের দুজনের কেউই রাজনৈতিক বিরোধ বা আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তার থেকে দুজনেই দূরে থাকতেন। অথচ তাঁরা দুজনেই জাতীয়তার পুষ্টি-সাধনের জন্য জাতির ঐতিহ্যের চর্চ্চা, সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা, সত্যাগ্রহ, নৈতিক সংস্কার ও জনসেবার গঠনমূলক কাজ করে গেছেন। দুজনেই বিলাতী মুক্তিফৌজের (Salvation Army) উদার কর্ম্মপন্থা সমর্থন করেছেন। জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে দুজনেই সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করেছেন। বিবাহের আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে দুজনেই অতি উচ্চে স্থান দিয়েছেন। বাল্যবিবাহ এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ যাতে না হয়, সেজন্য দুজনেই সামাজিক

* 'জীবনবেদ' দ্রষ্টব্য।

মত গঠন করেছেন। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করে গেছেন। দুজনেই বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষার ভিত্তি করেছিলেন। দুজনেই উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয়কে সমাজ-জীবনের শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কেবল উচ্চাঙ্গের ধ্যান ধারণায় নয়, মানবসমাজের, ইতিহাসের ও প্রকৃতির প্রেমে তাঁদের ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়েছিল। তাঁদের উচ্চ রূপকের (Symbolism) ব্যবহার তারই ফল। দুজনেই ছিলেন ঋষি-কবি। মানুষ ও উচ্চাঙ্গের কর্ম্মিদল গঠনে দুজনেরই অসামান্য প্রতিভা ছিল। আবার, ব্রহ্মানন্দ নববিধানে যে সমন্বয়ধর্ম্ম ও নব অধ্যয়নের প্রবর্ত্তন করেন, সেই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের বহুদিন পর পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এমনভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পাশ্চাত্য জগতের উপরেও ছড়িয়েছিল, যে তার থেকে দূরে থাকা কারো সম্ভব ছিলনা—বিশেষতঃ কবির মত একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাপুরুষের। Thomson লিখেছেন*—

"His (Keshub's) direct influence on Rabindranath was not great, but his figure was so important during these formative years that his career can not be altogether passed over. Without him the poet must have been born into a poorer heritage of thought and emotion".

"In no other family than that of the Tagores could all the varied impulses of the time have been felt so strongly and fully. These impulses had come from many men. Rammohun Roy had flung open doors; Derozio and others had thrown windows wide; Keshub came and intellectual and religious horizons were broadened. The tide of reaction had been set flowing by the neo-Hindu school, in battle with whom the poet was

---

* 'Tagore— Poet and Dramatist'
—Edward Thomson.

to find his strength of polemical prose etc. Rabindranath was fortunate in the date of his coming".

Thomson রবীন্দ্র-জীবনীতে আরও লিখেছেন—

"Nearly fifty years before, Keshub Chunder had demanded, against the Maharshi's party, that the Vedi (preaching seat) be open to members of all castes, and the demand had disrupted the Samaj. Now (1907-8) the Maharshi's son renewed Keshub's attack".

সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই ব্রহ্মানন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ওঁ

আমাদের দেশে আশীর্ব্বাদ করে শতায়ু হও।

সে আশীর্ব্বাদ দৈবাৎ হয়তো কখনো ফলে, কখনো ফলে না। কিন্তু বিধাতা যাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি দেহযাত্রার সীমা অতিক্রম ক'রে শত শত শতাব্দীর আয়ু লাভ করে থাকেন। সেই বর লাভ করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। উপনিষদ বলেন— য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁরা তাঁকে জানেন, তাঁরা মৃত্যুর অতীত হন, সেই অমৃত তাঁর জীবনে পেয়েছেন কেশবচন্দ্র, সেই অমৃত তিনি বিশ্বজনকে নিবেদন করেছেন, সেই তাঁর প্রসাদ স্মরণ করে তাঁর আগামী বহু শতবার্ষিকীর প্রথম শতবার্ষিকীর দিনে সেই অমিতায়ুকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

১৩ই পৌষ, ১৩৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপহৃত, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল প্রশস্তির প্রতিলিপি]

Edward Thomson এবং অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের মিলিত চেষ্টায় রচিত রবীন্দ্র-প্রতিভার মনোজ্ঞ আলেখ্যটী পাঠ করলেই দেখতে পাওয়া যায়, যে রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু কেবলমাত্র কবি নন, তার অপেক্ষাও তিনি বড় মানুষ। ১৮৮৩ খৃঃ তাঁর বিবাহ হয়

এবং বিবাহের পর থেকে কবির জীবনে সকল বিষয়ে অন্তর্মুখীনতা অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। এ বিষয়েও ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। 'মানসী' রচনার পর থেকে তাঁর চিন্তার গভীরতা, দার্শনিকতা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি, সমাজ-সংস্কারের চিন্তা, ধর্ম্মের বিষয়ে দায়িত্ব ও নিজস্ব মতামত বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কেবল কবিতায় নয়, 'চিত্রাঙ্গদা', 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতি নাট্যেও তার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে।১৮৯১খৃঃ 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের পর তার দ্রুত ক্রমপরিপক্বতা দেখা যায়। প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ঐ সময়ে যে সব ধর্ম্মতত্ত্ব ও পুরাতন মতবাদ নূতন করে প্রচার করেছিলেন, তিনি তার প্রতিবাদ করেন। নববিধান-মণ্ডলীর শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে তিনি ঐ সময়ে নূতন করে যাতায়াত আরম্ভ করেন*। তাঁদের প্রবন্ধ 'সাধনা'পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন,শ্রদ্ধেয় প্রমথলাল সেন, মহারাণী সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী, মণিকা দেবী প্রভৃতি সাধক, সাধিকা ও মনীষীদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। মোহিতচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও সাহিত্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করে, রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষিত জগতের কাছে পরিচিত করেন। কবি ঐ সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে কেন্দ্র করে নূতন ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ করেন।

'সাধনা' পত্রিকাটী মাত্র চার বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমালোচনা, বিজ্ঞান, ভ্রমণ ও নূতন চিন্তা-ধারায় ঐ পত্রিকা সমৃদ্ধ। কবি 'ভাণ্ডার' নামে আরেকটী পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকা-পরিচালনার জন্য তাঁকে নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। ফলে, নিজের মৌলিকতার সঙ্গে এই অধ্যয়নের মিলনে কবির চিত্ত ও দৃষ্টি অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করেছিল। ঐ সঙ্গে দেশবাসীর সঙ্গে, সাধারণ মানুষের

---

* 'শান্তিনিকেতনের কথা'—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
'বিশ্বভারতী পত্রিকা'

সঙ্গে পরিচয়-লাভের জন্যও তিনি সচেষ্ট হন। 'সোনারতরী' ঐ সময়ের রচনা। তার ভিতর জীবন-দেবতার ও বিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব দেখা যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার সমন্বয়ে, বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ ও ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের মিলনে, বিজ্ঞানের স্বর্গীয় স্পর্শে তাঁর চিত্তে এক অপূর্ব্ব আনন্দ এনে দিয়েছিল। ব্রহ্মানন্দের সাধনা যে সমন্বয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কবির জীবনে এই সময় থেকে সেই ধারা প্রবল-বেগে প্রবাহিত হতে থাকে—তখন তিনি নব অধ্যয়নের পথের পথিক হন ও অধ্যাত্মরাজ্যের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের পর তাঁর 'মালিনী' নাটকে আরও নূতন ভাব প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় এই নাটকে। সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে নূতন আহ্বান এসেছিল, মনে হয়, কবি তাই যেন বৌদ্ধধর্ম্মের নামে ঐ নাটকে চিত্রিত করেছেন। ক্রমে 'চৈতালির' ভিতর কবি সৌন্দর্য্য, ধ্যান ও আত্মসংযমের সমুদ্রে ডুব দেন। এই সংসারে থেকেও সংসারের উর্দ্ধে বিচরণ করায়, ঐ সময় থেকে সসীম ও অসীম, রূপ ও অরূপের সামঞ্জস্য তাঁর সমগ্র রচনাকে এক নূতন আধ্যাত্মিকতার স্তরে উত্থিত করেছিল। 'গীতাঞ্জলি' তারই ফল।

মানুষের মনকে যুগের উপযুক্ত করে জাগিয়ে, যুগোপযোগী আকার দান করেন যাঁরা, তাঁরাই সে যুগের ঋষি। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের ঋষি। সংস্কার এবং অভ্যাস হতে মুক্ত হয়ে, অতীতের ও বর্ত্তমানের, দেশের ও বিদেশের সমন্বয়ে যে মহামানবজাতি গড়ে উঠছে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই তাঁরা চলেছেন। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক বা ভৌগোলিক রূপের ভিতর তাঁরা আবদ্ধ থাকেন নি। কবি 'বিশ্বভারতীর' আদর্শ বর্ণনা করে লিখেছেন—

"Visva-bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-bharati acknow-

ledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others".

বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য তার নিয়মাবলীর ভিতর এইরূপ লিখিত আছে—

"To study the mind of man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view. To bring into more intimate relation with one another through patient study and research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity. To approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia. To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of World Peace, through the establishment of free communications of ideas between the two hemispheres".

"And with such ideals in view to provide at Santiniketan a centre of culture, where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilizations may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realization, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste".

'বিশ্বভারতী' ও 'শ্রীনিকেতন' ধীরে ধীরে নূতন মানুষ ও নূতন পল্লী-গঠনের কেন্দ্র হল—কবি "An Eastern University" বক্তৃতায় বলেছেন—

"Men should be brought together and full scope given to them not only for intellectual exploration but for vital creation as well; and the teaching should be the overflow of this spring of culture, spontaneous and inevitable. Moreover, education should be in touch with our complete life, economic, aesthetic, intellectual, social and spiritual. It must not only think and feel but act and produce".

কবি আরো বলেছেন—

"It should be a perpetual creation by the co-operative enthusiasm of teachers and students, growing with the growth of their soul; a World in itself, self-sustaining, independent, rich with ever-renewing life, radiating life across space and time, attracting and maintaining round it a planetary system of dependent bodies. Its aim lies in imparting life breath to the complete man, who is intellectual as well as economic, bound by social bonds, but aspiring towards spiritual freedom and final perfection".

কবি আগে থেকেই এই আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। Count Leo Tolstoyর (১৮২৮-১৯১০) চিন্তার প্রভাব ঐ সময়ে নূতন মানুষ গড়ে তুলছিল— সেই প্রভাব একদিকে যেমন মহাত্মা গান্ধীকে, অন্যদিকে তেমনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। ব্রহ্মানন্দের আদর্শ ও শিক্ষা তার ভিতর নবজন্ম লাভ করলো। রচনার পর রচনায় কবি তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ করতে থাকেন; কেবল রচনায় নয়, তাঁর কর্ম্মেও তার প্রকাশ দেখা দিল।

১৯০১ খৃঃ শান্তিনিকেতনে চারটী মাত্র ছাত্র নিয়ে কবি 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐখানে ১৮৬৩ খৃঃ মহর্ষি একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি এতদিন পিতার জমিদারীর তত্ত্বাবধানের কাজে বাঙ্গলার নদীর ধারে ধারে ঘুরেছেন; এখন তিনি তাঁর পিতৃদেবের অধ্যাত্ম-সাধনার পুণ্যভূমি শান্তিনিকেতনে এসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গঠন করার জন্য স্থিতি করলেন। নির্ম্মল মুক্ত আকাশের নীচে ও বৃক্ষের ছায়ায় ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা হল। বাল্যকাল থেকেই ছাত্রদের প্রকৃতির উৎসব, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, পৃথিবীর সকল মহাপুরুষকে গ্রহণ করে, অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্ম্মের আস্বাদ দেবার ব্যবস্থা হল। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে একে একে সাধু পণ্ডিত মনীষীরা এসে যোগ দিলেন—অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সতীশচন্দ্র রায়,

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর এলেন জগদানন্দ রায়, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, দিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, নন্দলাল বসু. অসিতকুমার হালদার, কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্র ও কর্ম্মীদের সঙ্গ কবিকে এক নূতন প্রেরণা দান করলো। ১৮৮৫ খৃঃ 'জাতীয় মহাসভার' (Indian National Congress) জন্ম। তারপর থেকে নানারকম জাতীয় আন্দোলন ও সভাসমিতি বেড়ে উঠতে লাগলো। ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে বিরাট স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হল। তখন তার নেতা ছিলেন জাতীয়তার জনক সুরেন্দ্রনাথ। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে তিলকের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হল। সেই সময় বাঙ্গলার তিনজন চিন্তানায়কের উদয় হয়—রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র। তাঁরা জাতিগঠনের নানান সূক্ষ্ম উপকরণের কথা জাতির সামনে উপস্থিত করতে লাগলেন। বক্তৃতা ও পত্রিকাই ছিল তাঁদের প্রচারের উপায়। স্বদেশী আন্দোলনে এই সব বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথের আরেকটী দান ছিল, সে হল তাঁর কবিতা ও স্বদেশী গান। ভাবুক বাঙ্গালীকে ঐ গান ও কবিতা মাতিয়ে তুললো। তার প্রভাব ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। কালের সীমা পেরিয়ে পরবর্ত্তী কালের তরুণ বিপ্লবী দেশসেবকদের ঐ গান অশেষ শক্তি ও প্রেরণা দান করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই জাতীয় কবি রূপে ভারত-বাসীর হৃদয়ে আসন পেলেন। ঐ সময় তিনি শান্তিনিকেতনের কাজ সবে আরম্ভ করেছেন, সেখান থেকে কলিকাতায় এসে স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্য করতেন। ক্রমে ঐ আন্দোলন ঘোলাটে হয়ে গেল। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য নিজেদের ভিতর যে সব সংস্কার ও উৎকর্ষের প্রয়োজন, তার কথা ভুলে, সহজে কার্য্যসিদ্ধির পথ খুঁজলো। যেন তেন প্রকারেণ দল-বৃদ্ধির জন্য, জাতীয়তার নামে লোক-ক্ষ্যাপানো, হিংসা, হুজুগ, গোঁড়ামী, মিথ্যার আশ্রয়

নিল। কবি তখন তার থেকে বিদায় নিলেন ও শান্তি-নিকেতনের কাজে মন দিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শ, জাতীয় শিক্ষার চিন্তা, জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার, ব্রহ্মসঙ্গীত-রচনা ও 'শান্তিনিকেতন' নামে পরিচিত তাঁর নিবেদন-গুলিই বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। মোহিতচন্দ্রের স্থানে, তখন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রবীন্দ্র-রচনার ব্যাখ্যাতার কাজ করছেন। সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হল এবং ১৩১৪ সন থেকে 'প্রবাসী' ও ১৯০৭ থেকে Modern Review পত্রিকা কবির চিন্তা ও সাহিত্যের প্রচারের প্রধান উপায় হল।

১৩১৫ সাল থেকে তিনি উপনিষদের কথা উপলব্ধির দ্বারা সকলকে নিয়ে মণ্ডলীগত ভাবে ব্যক্ত করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ নিবেদনগুলি 'শান্তিনিকেতন' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে তার প্রভাব ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়লো। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই তার প্রভাব তখন যা কিছু পড়েছিল। কবির প্রেরণাময়ী বাণী ও তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত যেন নূতন জীবনের সংবাদ আনলো। তরুণদের ভিতর সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, যতীশচন্দ্র সেন, জীবনময় রায়, অমল হোম, কালিদাস নাগ, সরোজকুমার দাস, জিতেন্দ্রমোহন সেন, সত্যানন্দ রায় প্রভৃতি ঐ নিবেদনে আকৃষ্ট হন এবং পরেও এঁদের কেউ কেউ কবির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-সংগঠনে সহায়তা করেন। ১৩২১ অবধি ঐ উপদেশগুলি ১৭ খণ্ড পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। তার পরের ধর্ম্মব্যাখ্যান-গুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময়ে 'ভক্তবাণী' তিন খণ্ডে মধ্য যুগের সেণ্ট ও আধুনিক ভারতীয় সাধকদের বাণী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত হয়। তখন কেবল কবি বা লেখক-রূপে নয়, তাঁর প্রভাব চিন্তানায়করূপে ছড়িয়ে পড়লো।

সুভাসচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের উপর কবির প্রভাব যেমন দেখা যায়,

তেমনি ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ হুমায়ুন কবীর, ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন প্রভৃতি তরুণ প্রতিভাশালী ছাত্রদের উপরেও সমান প্রভাব দেখা যায়। কবি তরুণদের জন্যেই বীরবলের (প্রমথনাথ চৌধুরী) সাহায্যে 'সবুজপত্র' (১৯১৪ খৃঃ) প্রকাশ করেন। তার প্রভাব এঁদের খুব প্রভাবান্বিত করেছিল এবং ইদানীং এঁরাই কবির চিন্তা ও রচনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। কবির উৎসাহেই আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী অধ্যাপক অনাথনাথ বসু বিলাতে শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীর 'বিনয়-ভবনের' সেবায় নিযুক্ত। গুরুদেব এই ভাবেই ভারতের সেবার জন্য বহু কর্ম্মী গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করে গেছেন।

১৯১২ খৃঃ কবি ইয়োরোপ-ভ্রমণে বেরুলেন। তাঁর রচনা ও ভাবের আদর হল—তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। ১৯১৫ খৃ: তাঁকে স্যার উপাধি দেওয়া হল। C. F. Andrews ও W. W. Pearson-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; এখন তাঁরা এদেশে এসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমটীকে গড়ে তোলার জন্য কবির সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৯১৪ খৃঃ দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজের সঙ্গে মহাত্মাজী শান্তিনিকেতনে এসে রইলেন। কবির সঙ্গে মহাত্মাজীর এই যোগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রমে গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে আসতে আরম্ভ করলো। তখন কবি শান্তিনিকেতনকে সর্ব্বভারতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করতে ব্যস্ত হলেন। সেই হল বিশ্বভারতীর প্রথম সূচনা।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে Sylvain Lévi, M. Winternitz ও Leonard Elmhirst সস্ত্রীক এসে কাজে যোগ দিলেন। পরে অধ্যাপক নোগুচি, জাপানী ভিক্ষুর দল, চীনা অধ্যাপক ও শিল্পী, দেশবিদেশের সাধক মনীষীরা শান্তিনিকেতনের অতিথি হলেন।

কবি ১৯১৮ খৃঃ জাপান ও আমেরিকা গেলেন। তখন কবির মনে একটা নূতন ভাবের উদয় হল।

'Asia's Message to Europe' বক্তৃতায় ১৮৮৩ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ এশিয়ার যে বাণীর কথা ঘোষণা করেছিলেন, সেই বাণীই যেন তাঁর মনে নূতন করে বেজে উঠলো। ১৯১৯ খৃঃ থেকে তাঁর বিদ্যালয়ে সেই ভাবের কাজ আরম্ভ হল। বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধসাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, তিব্বতীয়, চৈনিক, জৈন, পার্সি, ইসলামিক সভ্যতার অধ্যয়ন ও গবেষণা চল্ল। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের আধ্যাত্মিক অবদানকে বর্ত্তমানের সঙ্গে জীবন্ত যোগে যুক্ত করার জন্য কবি সচেষ্ট হলেন। সঙ্গীত, নাট্য ও কলাকে কবি এই কার্য্যের সাধনে উচ্চ স্থান দিলেন।

এই ভাবে যখন তাঁর বিদ্যালয়টী, কেবল সমস্ত ভারতের নয়, সমস্ত এশিয়ার ভাব-সম্পদে পূর্ণ হতে লাগলো, সেই সময় কবির জীবনে এক অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত হল। তার ভিতর হল 'বিশ্বভারতীর' জন্ম। একদিন এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়েই ব্রহ্মানন্দ 'নববিধানের' সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কবি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। একদিন স্বদেশী আন্দোলনে, জাতীয় শিক্ষা-গঠনে, জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে তিনি নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। ১৯১৯ খৃঃ জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ কবি নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু এই স্বাদেশিকতার ভিতরেও একটা বৈশিষ্ট ছিল, যাকে ব্রাহ্ম আদর্শ বলা যায়। 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' ও 'ঘরে বাহিরে' রচনাগুলি পাঠ করলে সেই বৈশিষ্ট সহজেই বুঝা যায়। জালিয়ানওয়ালা বাগের পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ঐ আন্দোলন অহিংস হলেও, ঐ সঙ্গে জাতির চিত্ত পাশ্চাত্যের প্রতি একটা তিক্ত বিরূপতা পোষণ করেছিল। কবি ঐ ভাবকে যুগধর্ম্ম-বিরোধী ও ক্ষতিকর বলে বোধ করলেন এবং তার স্পষ্ট প্রতিবাদ করলেন। বিক্ষুব্ধ জাতি অন্ধ উত্তেজনায় কবির প্রতি

নানান কুৎসা, অপবাদ ও নির্য্যাতন আরম্ভ করলো। তাঁর সঙ্গীত, নাট্য, কলার বিদ্রূপ করা হল। কবি আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হয়েও অটল রইলেন। মহাত্মাজী কবিকে ও তাঁর জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। কবিকে তিনি 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথকে তিনি 'বড়দাদা' বলতেন। তাঁদের কাছে তিনি তাঁর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে পরামর্শ নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। তাঁদের কাজেকর্ম্মে সহায়তা করার বহু চেষ্টা করতেন। তার ফলে জাতির মনে কবির প্রতি যে ভুল ধারণার উদ্রেক হয়েছিল, তার উপশম হল। কবি সেই পরীক্ষার ভিতর, জাতির যে প্রয়োজনকে বড় করে দেখতে পেয়েছিলেন, সেই আদর্শকে 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯২১ খৃঃ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এক অনুষ্ঠানে তার উদ্বোধন করলেন। ঐ বৎসরেই তাকে নিয়মাবলীসহ রেজিষ্ট্রী করা হল। তাকে গড়ে তোলবার কাজগুলি ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ নীরবে করে যেতে লাগলেন। ক্রমে পাঠ-ভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, কলাভবন, সঙ্গীত-ভবন, চীনাভবন, হিন্দীভবন, গ্রন্থন-বিভাগ প্রভৃতি গড়ে উঠলো। 'বিশ্বভারতী' গঠন করে কবি বিশ্বমৈত্রীর নব নব প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন এবং বার বার দেশ বিদেশে গিয়ে, দূরকে নিকট বন্ধু করলেন ও পরকে ভাই করলেন। নববিধানের অখণ্ড পরিবারের আদর্শ 'বিশ্বভারতীর' ভিতর বাস্তবরূপ গ্রহণ করলো। 'বিশ্বভারতীর' আদর্শ—

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (Where the world makes its home in a single nest) সার্থক হল।

কবির পরলোক-গমনের পর ১৯৫১ খৃঃ ভারতরাষ্ট্র 'বিশ্বভারতীকে' বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্য্যায়ে গণ্য করেছেন।

কবির জীবনই * বিশ্বভারতীর জীবন্ত আদর্শ। কর্ম্ম-সাফল্যের চেয়ে, আদর্শের জয়ের দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর

* 'রবীন্দ্র জীবনী'—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

চতুর্দ্দিকে যাঁরা কর্ম্মসূত্রে একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতরেও তার উজ্জ্বল প্রকাশ। তাঁদের সকলের ভিতরেই শিক্ষা ও জীবন, জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছিল। বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা কবিকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করেছিল। দুঃখ তাঁর কাছে নির্ম্মম ভাবে বারবার এসেছে— তিনি দুঃখকে জয় করে, আনন্দময় শান্তস্বরূপের কাছে আশ্রয় নেবার জন্যে বিশ্বাসভরে অগ্রসর হয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সাধনা তাঁকে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই। তার ভিতর তিনি খৃষ্ট ও বুদ্ধকেও বিশেষ-ভাবে আশ্রয় করেছিলেন। বুদ্ধের ধ্যান, বুদ্ধের পারমিতা, বুদ্ধের করুণা, বুদ্ধের শান্ত-আত্মস্থতা, যা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ-স্বরূপ, তাই দিয়ে কবি নিজ জীবনকে পূর্ণ করার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর ভিতর তাই তিনি প্রকাশ করে গেছেন। 'কথা' বইটীতে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি কবিতায়, বুদ্ধের আদর্শের ভিতর মানবের উচ্চতম প্রকৃতির আকর্ষণের বস্তু যা, তার পরিচয় কবি দিয়েছেন। 'পরিশেষ' কবিতাগুচ্ছে বুদ্ধের ত্রিশরণমন্ত্র কি ভাবে দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে গিয়ে, শ্যাম প্রভৃতি দেশকে জয় করেছিল, তার পরিচয় কবি দিয়েছেন। বুদ্ধের নাম ভারতকে পৃথিবীর চক্ষে মহামহিমময় করে তুলে যে গৌরবের আসন দিয়েছে, সে জন্য কবির চিত্ত দেশবাসীর হয়ে তাঁর চরণে প্রণতি জানিয়েছে। মহাত্মাজী যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতর নূতন করে 'হরিজন' সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হলেন, তখন কবি তাঁর জন্যে 'চণ্ডালিকা' রচনা করলেন। কেবল তাই নয়, কবি বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ নির্দ্ধারণ করে, হিন্দুজগতের সম্মুখে উপস্থিত করে গেছেন। 'মালিনীর' ভিতর যার আরম্ভ, তাকেই ক্রমে উপদেশ, কবিতা, নাট্য, অনুবাদ, বক্তৃতা ও গানের ভিতর দিয়ে একটী চমৎকার মাল্যরূপে গ্রথিত করে, সিদ্ধার্থের উদ্দেশ্যে কবি উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি ধম্মপদের কতকাংশ বাঙ্গলা কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। ঐগুলি

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৫৫) প্রকাশিত হয়েছিল। তার অনেক আগে 'বঙ্গদর্শন' নবপর্য্যায় ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'ধম্মপদ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সার্ধদ্বিসাহস্রিক পরিনির্ব্বাণ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে, বৈশাখী পূর্ণিমা, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ খৃঃ বন্ধুবর শ্রীপুলিনবিহারী সেন বুদ্ধদেব-সম্পর্কে কবিগুরুর রচনাবলী সংগৃহীত করে, বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশ করেছেন। কবি কি ভাবে বুদ্ধের সাধনা, জীবন ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে জীবনের দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন—এই বইটীতে তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের প্রভাবকে আধুনিক জীবনে তিনি কি ভাবে বিস্তারিত করতে সহায়তা করেছেন, তাও বুঝতে পারা যায়

কবির পরেই আমাদের চোখে পড়ে পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়কে। কবি চেয়েছিলেন যে, এঁর প্রভাবে ছাত্রেরা পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা করে, বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেই কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বাংলায় অনুবাদ করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের 'পালিপ্রকাশ' বইটী বহুজন-পরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা ১৯৩২ খৃঃ তাঁকে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তা' নিযুক্ত করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন, সেগুলি 'The Basic Conception of Buddhism' নামে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতাগুলি তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও শাস্ত্রে প্রবেশের পরিচয় দেয়। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাঁর চীনীয় ও তিব্বতীয় গবেষণার ভিতর বহু নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের পুনরুদ্ধার করেছেন। ইনি অল্পদিন বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যও হয়েছিলেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'ধর্ম্মপদ' বিষয়ে গবেষণা করেছেন। চীন ও জাপানের পণ্ডিত ও ভিক্ষুরা এসে শান্তিনিকেতনে বাস করে, বৌদ্ধ-জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করে গেছেন। কবির বৃহত্তর-ভারতের পরিকল্পনা এবং

তীর্থ-ভ্রমণের মত সব বৌদ্ধদেশে পর্য্যটন, বুদ্ধের সুবিস্তৃত প্রভাবের সঙ্গে জীবন্ত যোগের সৃষ্টি করেছে। তার ভিতর দিয়ে কেবল বৌদ্ধ প্রভাবের নয়, খ্রীষ্টীয় প্রভাব, মুসলমান প্রভাব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রভাবের সমন্বয়ে বৃহত্তর জীবন গড়ে উঠেছে। 'মহাবোধি সোসাইটী' যেমন অসাম্প্রদায়িক-ভাবে সকলের মিলিত চেষ্টায় 'বৌদ্ধ-সংঘ' গঠন করেছে, তেমনি 'বিশ্বভারতী' নববিধানের আদর্শে, এক অখণ্ড পরিবার রচনা করে, অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্রে বৌদ্ধ-সাধনা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে বিশ্বসমাজের গঠনে সহায়তা করেছে।

বিংশশতাব্দী রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার কাছে যে কত ঋণী, সে কথা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়; তবু বলতে হয় যে, তাঁর প্রভাব কেবল বাঙ্গলায় নয়, সমস্ত ভারতের ও পৃথিবীর সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। আর জীবনের আদর্শের দিক দিয়ে যদি দেখা যায়, তবে আমরা দেখতে পাই যে, কবির ও বিশ্বভারতীর আদর্শ একদিকে যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মগোষ্ঠীর স্বাভাবিক সংকীর্ণতা ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতাকে ভেঙ্গে দিয়ে জীবন-ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করার এবং অখণ্ড জীবনের আদর্শকে জয়যুক্ত করার পথ তৈরী করেছে, তেমনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুঁথিগত অর্থকরী শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণতাকে ভেঙ্গে, বহুচিত্তে জীবনের আলোক দিয়ে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার পথ রচনা করে গেছে।

২৬। স্যার আশুতোষ ও 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯০৬-১৪)—

ভারতের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংরাজ শাসনের বিশেষ আশীর্ব্বাদ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে দেশীয় রাজা, জমিদার ও নবাগত ইংরাজ, সকলেই যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কলার প্রচলন বা উন্নতির চিন্তায় মনোযোগ দেবার সময় পেতেন না। নিজেদের রাজকার্য্য পরিচালনার প্রয়োজন মত এদেশীয় কিছু লোককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন মাত্র। আমরা দেখতে পাই, ওয়ারেণ হেষ্টিংসই এ বিষয়ে

প্রথম হাত দেন। ১৭৮২ খৃঃ কলিকাতার মাদ্রাসা আরবী শিক্ষার জন্য এবং ১৭৯১ খৃঃ বারাণসী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৩ খৃঃ Charter Act অনুসারে, দেশীয় প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সরকারী তহবিল থেকে প্রথম অর্থ ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সময়েই এদেশীয় এবং বিদেশীয় কয়েকজন জনহিতৈষী মহাত্মা ব্যক্তি বেসরকারীভাবে দেশীয় প্রণালী ও দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য প্রণালীতে ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অগ্রসর হন। মহাত্মা রামমোহন রায়, মহামতি ডেভিড হেয়ার, ডাঃ আলেক্জাণ্ডার ডাফ্ প্রভৃতির নাম তার ভিতর গণ্য করা যায়। তাঁদের চেষ্টায় কলিকাতায় হিন্দু কলেজ ও বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টান স্কুল ও কলেজ গঠিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ লর্ড মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সপক্ষে তাঁর বিখ্যাত আলোচনা প্রকাশ করেন। পরে ১৮৫৪ খৃঃ স্যার চার্লস উডের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব মত কোম্পানীর Court of Directors স্থির করেন যে, সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে কলিকাতা, বম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হউক। তখনও সিপাহী-বিদ্রোহের প্রজ্বলিত অগ্নির ধূম সম্পূর্ণ অপসারিত হয়নি, তারই ভিতর ১৮৫৭ খৃঃ ঐ নির্দ্ধারণ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় তিনটী প্রতিষ্ঠিত হয়*। "The Advancement of Learning" তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লর্ড ক্যানিংকে তার প্রথম Chancellor নিযুক্ত করা হয়। স্যার আশুতোষ বলেছেন—(১৯০৭)

"The fundamental conception which lies at the root of the Act of Incorporation of 1857 was that the University was to be a purely examining body".

---

*আশ্চর্য্য যে এই বৎসরেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র দেশের সেবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

লর্ড মিণ্টোর এক ভাষণে আরেকটী কথা জানা যায়—

"The entire absence of religious teaching is a defect in our system of education—and yet it is a defect with which the absolutely necessary religious neutrality of British administration renders it impossible for the Government of India to deal".

ঐ সঙ্গে আরো দুটী কুফলের কথার উল্লেখ পাই—ইংরাজী শিক্ষায় বিজাতীয় ভাবের অনুকরণে জাতীয় ভাবের ও জাতীয় জ্ঞান এবং সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা; (২) মুখস্থ বিদ্যার ফলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। এই বিষয়ে ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল কারণের জন্যই শিক্ষিতদের ভিতর একটা শূন্যগর্ভ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। সেই Young Bengal কে সম্বোধন করেই ব্রহ্মানন্দ 'Young Bengal—This is for you' বক্তৃতা দিয়ে, তাঁর কর্ম্মজীবনের আরম্ভ করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

প্রত্যেক জাতির জীবনে শিক্ষার স্থান যে কত বড়, তা ইতিহাসের প্রতি ছত্রে প্রকাশ পায়। শিক্ষা ব্যবস্থার যে রূপ, জাতিও সেই রূপ চিরদিন ধারণ করে এসেছে ও চিরদিন করবে। সেই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঐরূপ কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন বিধিবদ্ধ করার জন্যই ১৯০৪ খৃঃ University Act হয় এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে যোগ্যতম ব্যক্তিবোধে, ১৯০৬ খৃঃ ৩১শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor পদে আনা হয়। তিনি একাক্রমে আট বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে ঐ New Regulation কার্য্যে পরিণত করেন। পরে আরেকবার জাতির বিশেষ সঙ্কটকালে,

১৯২১ খৃঃ এক বৎসরের জন্য তাঁকে ঐ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিল।

তাঁর জীবনকথা সকলেই জানেন। তার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর বিবিধ গুণ ও কর্ম্মশক্তির প্রতি সমাদর স্বরূপ তাঁকে Doctor, Kt. C. S. I., সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। শিক্ষার উন্নতি-বিধানে স্যার আশুতোষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লর্ড মিণ্টো বলেছিলেন (১৯০৮)—

"Fifty years have passed by since then, and to-day an Indian gentleman, a distinguished Scholar and Jurist, brings to bear on the conduct of its affairs a patriotic zeal for the promotion of higher education among his fellow countrymen which is only equalled by his experience and administrative ability. * * * I know of no pilot more capable of steering the ship of learning—through educational shoals and quicksands than Dr. Mookerjee, and I have no need to prophesy as to the future".

স্যার আশুতোষ Vice-Chancellor পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার সময় লর্ড কারমাইকেল বলেছিলেন—

" He has shown himself able to grasp large schemes, and at the sametime has shown himself able to grasp and workout the most minute detail. He has an infinite capacity for taking pains. Ready in debate, prompt and firm in giving decisions, he has, I believe, been a most expert chairman at meetings, he has been practical, he is open to conviction, even if, he be hard to convince. * * * Universities must move with times. None is more anxious than Sir Ashutosh is, to watch and closely study educational movement in the western world, and thus learn to judge better what our movement aught to be".

কার্য্যভার গ্রহণ করে, প্রথম বছরের Convocation বক্তৃতায়, আশুতোষ যে কথা বলেন, তার এই কয়েকটি কথা থেকেই তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মরীতি ও দৃঢ়তার পরিমাপ করা যায়—

"Our academic work has been the completion of the New Regulations. I have not the remotest desire to

re-open controversies which have been laid at rest for the present, because in all efforts at reform, a period is ultimately reached, when debate and discussion must be closed and solid work undertaken".

আশুতোষের জন্ম ১৮৬৪ খৃঃ এবং মৃত্যু ১৯২৪ খৃঃ। তাঁর পিতা বিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মানন্দের সমসাময়িক এবং কলিকাতারই মানুষ ছিলেন। স্বভাবতই ব্রহ্মানন্দের প্রভাব আশুতোষের উপর এসে পড়েছিল। তাঁর Convocation বক্তৃতাগুলিতে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বক্তৃতা, রচনা, চিঠিপত্র ও কার্য্যাবলীর বিশেষ আলোচনা আজও হয়নি। তাঁর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও ধর্ম্মপ্রচারের বক্তৃতার কথাই আমরা জানি। কিন্তু যিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে 'Young Bengal—This is for you' রচনা করেছিলেন, তাঁর যে শিক্ষা-বিষয়ে ও স্বাধীনতা-বিষয়ে সুস্পষ্ট দান আছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। জাতি-গঠনে ও জাতির জীবনে নবজীবন-সঞ্চারে ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষার স্থান যে সবচেয়ে বড়, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, এই তিনটী এক সঙ্গে চলে ও জীবনই এই তিনটীর আধার। জীবনকে রূপান্তরিত করা ভিন্ন ধর্ম্ম, নীতি বা শিক্ষার অন্য কোন মূল্যই নাই।

১৮৬১ খৃঃ তিনি 'The Promotion of Education' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতায় শিক্ষার ক্ষেত্র ও নীতি বিশ্লেষণ করে, এ দেশীয় এবং বিদেশীয় জনসাধারণকে নবশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে আহ্বান করেন। সরকারের উপর দোষারোপ বা সরকারের উপর নির্ভর করার কথা তাঁর বক্তৃতায় একেবারেই দেখা যায় না। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র ৪ বৎসর এবং তাঁর নিজের বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। বিশ্লেষণ ও কর্ম্মসূচী দেখে, দেশীয় বিদেশীয় চিন্তানায়কেরা এই যুবকের দূরদৃষ্টির পরিচয়

পেয়েছিলেন। আবার যখন তিনি দেশের ও বিদেশের গুণী ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের ক্রমশঃ মিলিত করে, ঐ কাজকে শক্তিশালী করে তুল্লেন, * তখন তাঁর নেতৃত্বশক্তি সকলকেই মুগ্ধ করলো।

ঠিক সেই সময়ে বিলাতে Church ও State-কে ক্রমে ক্রমে পৃথক করার চেষ্টা চলেছিল। ধর্ম্মান্ধতার হাত থেকে শাসন-ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার মুক্তি-সাধন ও আধুনিকতার প্রতিষ্ঠাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ আধুনিকতা ক্রমে আদর্শবাদ ও নীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অতিরিক্ত Secular হয়ে পড়ায়—পাশ্চাত্য জড়বাদের ও নাস্তিকতার জন্ম হয় এবং যুদ্ধ, বিগ্রহ ও মারণাস্ত্রের আবিষ্কার দিয়ে নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বের চেষ্টা চলতে থাকে। এই সম্ভাবনা ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। ধর্ম্মভাবকেই তিনি ভিত্তি করেছিলেন এবং প্রথম থেকেই বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য-সাধন ব্রহ্মানন্দের একটী বিশেষ দান।

ব্রহ্মানন্দ শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটী দ্রুত-পদ্ধতি নির্ণয় করেছিলেন—এইটী তাঁর আরেকটী বিশেষ দান। এই প্রসঙ্গে তাঁর শিক্ষা-নীতির বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল জীবনের একটী অঙ্গ, কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থাও ছিল একান্ত স্বাভাবিক। আমরা জানি, ছাত্রাবস্থায় তিনি পাড়াপড়শীদের ভিতর যারা বিদ্যালয়ে যেতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাঁদের ভিতর জ্ঞান ও শিক্ষা বিতরণের জন্য, সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে Colutola Evening School গঠন করেন (১৮৫৫-৫৭ খৃঃ)। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল চিত্তাকর্ষক Demonstration, বৈজ্ঞানিক experiment, অভিনয়, আবৃত্তি

---

* 'Biography of A New Faith' by Dr. P. K. Sen Vol. II, Appendix II—VII 'Reports of the Indian Reform Association' দেখুন।

দিয়ে শিক্ষার প্রতি সকলের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নাট্যসমাজে' বিধবাবিবাহ নাটক, হ্যামলেট প্রভৃতি অভিনয় করা হত। তাতে কেবল নিরক্ষরতা দূর করা নয়, সমাজ-সংস্কার ও লব্ধজ্ঞানকে জীবনের উন্নতি-সাধনে ব্যবহার করতেও শেখান হত। আবার সহপাঠীদের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের চর্চ্চার জন্য British India Society, Goodwill Fraternity, সঙ্গতসভা, ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি গড়ে তোলেন। কোনটীতে সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা. কোনটীতে প্রার্থনা, কোনটীতে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, কোনটীতে ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হত। মাননীয়, জ্যেষ্ঠ, সুপণ্ডিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের সাদরে এনে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা হত। এইভাবে ক্রমে একটী নূতন কর্ম্মিদল গড়ে উঠলো। কেশবচন্দ্র তাঁদের নিয়েই উপযুক্ত সময়ে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্রেরা সাধারণতঃ এই ধরণের কাজে অগ্রসর হতেন না। কিন্তু কেশবচন্দ্র তাতে পশ্চাৎপদ না হয়ে, যথোপযুক্ত কর্ম্মিদল নিজেই গঠন করে নিলেন। ঐ সকল নিঃস্বার্থ নির্ভীক মানুষেরা Young Bengal এর সম্মুখীন হয়ে, ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের শিক্ষানীতি আলোচনা করতে হলে, ঐ বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, তার সম্পূর্ণ সঙ্কলন আজও প্রকাশিত হয়নি। যাহাই হউক, স্থানে স্থানে * শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর যে সকল

---

* 'Essays—Theological and Ethical'
'Discourses and Writings'
'Lectures in India'
'Nine Letters on Educational Measures'
'Keshub Chunder Sen in England'
'Biography of a New Faith' Vol. II. by Dr. P. K. Sen—Appendix 'Reports of Indian Reform Association', 'Reports of Normal School for ladies'
'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলিত
'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ'— ঐ

রচনা পাওয়া যায়, এখানে তার একটী তালিকা দেওয়া হল।

১। 'Young Bengal—This is for You' (June 1860).

২। 'The Promotion of Education' (October 8, 1861).

৩। 'A Call to Educated India' (1864).

৪। 'An Appeal to Young India' (1865).

৫। Lectures at the Bethune Society (1865).

৬। Lectures in England (1870):
   Interview with Sir Erskine Perry (May 4).
   Words to Ragged Schools (May 9).
   Female Education in India (May 13).
   England's Duties to India (May 24).
   and other Lectures.

৭। 'সুলভসমাচারের' প্রবন্ধাবলী (১৮৭০)
   'ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতালাভের উপায় কি?
   —১ম হিন্দীভাষা, ২য় অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা।'
   'শিক্ষাপ্রণালী'
   'বাঙ্‌লা ভাষা'
   'শিল্পবিদ্যালয় ও কারিকরদিগের জন্য বিদ্যালয়'
   'ভৃত্য-শিক্ষা'
   'সামান্য লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা'
   'কেশবচন্দ্র সেন ও স্ত্রীশিক্ষা'

৮। Lectures at the Bengal Social Science Association (1871).

৯। Nine Letters to Lord Northbrooke on Educational Measures (1872).

১০। 'The Study of Science' (1873).

১১। 'The Temple of Science' or Dr. Mahendra Lal Sircar's Indian Association for the Cultivation of Science.

১২ Indian Reform Association:
   Normal School for Ladies.
   Workingmen's Institution.
   Ragged School for the Poor and Destitute.

১৩। 'অশ্লীলতা-নিবারণী সভার' বক্তৃতা

১৪। Prospectus of Higher Education for Women: Victoria Institution (1882).

প্রথম দুই বক্তৃতার পর তিনি কয়েকটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৮৬২ খৃঃ 'কলিকাতা কলেজের কাজ আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরেই 'কলুটোলা শিশু-বিদ্যালয়' ও 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার' কাজও আরম্ভ করেন। ঐ সময়েই কয়েক জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ত্তসেবার ব্যবস্থা করেন। সেবার ভাবে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা-দানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

দানের উপর এই সকল কাজ চলতো। যাঁরা শিক্ষকতা করতেন, তাঁরা হয় অবৈতনিক, নয়তো অতি অল্প বেতনে কাজ করতেন। মানুষের কল্যাণ-চিন্তা তাঁদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। সকলের কল্যাণ-সাধনই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিল। ঐ সব শিক্ষকদের ভিতর সামান্য কয়েক জনের নাম আমরা জানি, যথা, বিখ্যাত বক্তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, সাংবাদিক উমানাথ গুপ্ত, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তারপর নাম করা যায় শিক্ষকপ্রবর কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রদ্ধেয় জয়কৃষ্ণ সেন, শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র দত্ত। এ ছাড়া অন্য বহু শিক্ষক ছিলেন, যাঁদের নাম আমরা কখনো শুনিনি। জাতিগঠনের ইতিহাসে ঐ সকল Pioneer দেশসেবকদের নাম চির-অপরিচিত থাকলেও, জাতির জীবনের অক্ষরে অনন্তকাল লিখিত থাকবে।

নারীশিক্ষার উপরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মত আচার্য্য কেশবচন্দ্রও বেশী জোর দিয়েছিলেন। নারীকল্যাণব্রতী মহারাষ্ট্রের ডাঃ ধন্দকেশব কার্ভে গত ১৮ই এপ্রিল একশত বর্ষ পূর্ণ করেন। তাঁর কাজকর্ম্মে পশ্চিম ভারতের নারীদের দুরবস্থার কথা জানা যায়। সে সময়ে বাল্যবিবাহ ও পর্দ্দার প্রচলন থাকায় নারীদের শিক্ষার বিশেষ বাধা ছিল। ফলে শিক্ষা-বিষয়ে পুরুষ ও নারীর মস্ত পার্থক্য দাঁড়িয়েছিল। অথচ

স্কুলে কলেজে পুরুষদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থাই নারীদের অনুসরণ করতে হত। ঐ ব্যবস্থা তখনকার নারীদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। তার ফলে নারীদের ভিতর শিক্ষা প্রবেশ করছিলনা। উপযুক্ত নারীশিক্ষা উদ্ভাবনের জন্য কেশবচন্দ্র ব্যস্ত হন। আজকাল শিক্ষার অঙ্গরূপে Seminar, Association, সভা-সমিতি দেখা যায়। সেই ৮০ বৎসর আগেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র তার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। সেইজন্যই তিনি বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নারীদের জন্য 'বামাবোধিনী সভা' (১৮৬২), ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫), 'বামাহিতৈষিণী সভা' (১৮৭১) 'ভারতাশ্রম' (১৮৭২) 'আর্য্যনারী সমাজ' (১৮৭৯) গঠন করেন। পুরুষদের জন্যও 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা' (১৮৬৩), 'নিকেতন', 'ভারতসংস্কার সভা' (১৮৭৯), 'আশালতা' বা (Band of Hope), 'এলবার্ট হল' (১৮৭৬) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। নারীদের নিয়মিত শিক্ষার জন্য 'অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষার' প্রসারকল্পে উচ্চশিক্ষিতা এদেশীয়া এবং বিদেশিনী মহিলাদের সাহায্য নেন। শিক্ষয়িত্রীর একান্ত অভাব থাকায়, ঐ অভাব পূরণের জন্য Normal School for Ladies গঠন করেন। তিনি আরেকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন—সেটী হল বাল্যবিবাহ বন্ধ করা। সেইজন্য বহু পরিশ্রম করে, বহু বাধা বিরুদ্ধতা অতিক্রম করে Act III of 1872 বিধিবদ্ধ করান।

নারীদের শিক্ষার জন্য ভারতাশ্রমের বিদ্যালয়, সাধনকাননের বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটন বিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের কথা আমরা সবাই জানি। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী তাঁর লেখা Prospectus ও কার্য্য-বিবরণীতে পাওয়া যায়। পুরুষদের শিক্ষার জন্য 'কলিকাতা কলেজ' ছিল প্রধান। ঐ প্রতিষ্ঠানটী পরে 'এলবার্ট কলেজ' নামে পরিচিত হয়। ঐ সঙ্গে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়', 'বেদবিদ্যালয়', 'নীতিবিদ্যালয়', 'আশালতা' প্রভৃতি সংযুক্ত ছিল। ব্রহ্মানন্দ কৃত-শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং যার যা

উপযোগী, সেইরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। Nine Letters on Educational Measures পুস্তিকায় তার পরিচয় পাই।

দ্রুত-শিক্ষা-ব্যবস্থার উপায় স্বরূপ তিনি বক্তৃতা ও পত্রিকা পরিচালনা অবলম্বন করেছিলেন। যখন যেমন দরকার, সেই রকম পত্রিকা প্রকাশ করতে তিনি সময় বিলম্ব করতেন না। আমরা ১২টী পত্রিকার কথা জানি—'Indian Mirror' (1861), 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৬৭), 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩), 'সুলভসমাচার' (১৮৭০), 'মদ না গরল' (১৮৭০), 'ধর্ম্মসাধন' (১৮৭২), 'পরিচারিকা' (১৮৭৯), 'বালক-বন্ধু' (১৮৭৯), 'বিষবৈরী' (১৮৮০), 'The New Dispensation' (1881), 'The Liberal' 1882)। পূর্ব্ববঙ্গে, বিহারে, উড়িষ্যায়, পাঞ্জাবে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে ও মাদ্রাজে তাঁর অনুবর্ত্তীরা বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে ঐ কাজকে শক্তিশালী করে তুলেন। তার ফলে একদিকে শিক্ষার, নূতন চিন্তা ও জীবনের আদর্শের প্রচার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কার ও জনমত গঠিত হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে আরেকটী কাজ হয়, সেটী হল প্রাদেশিক ভাষার গঠন—ভাষাগুলি আধুনিক ভাবে ও সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইটী একটী বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্র।

বক্তৃতা ও সংবাদপত্র ছাড়া, পুস্তিকা প্রচার ছিল তাঁর আরেকটী উপায়। ছোট ছোট কয়েক পৃষ্ঠার পুস্তিকায়, এমন কি পোষ্টকার্ডে তাঁর শিক্ষণীয় বক্তব্যটী সহজ ভাষায়, সহজ ভাবে, অল্প কথায় লিখে তিনি চতুর্দ্দিকে বিতরণ করতেন। এগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। তার ভিতর কয়েকটীর নাম দেওয়া হল—Tracts for the times নামে ১৩টী ইংরাজী পুস্তিকা, ছোট ছোট প্রার্থনা, 'কতকগুলি প্রশ্নোত্তর', 'ধর্ম্মকথা', 'কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ', 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ', 'সুখী পরিবার'; এবং শেষ জীবনে ১৯২০টী

পুস্তিকা দেশ বিদেশে পাঠান। তার ভিতর শেষ পুস্তিকা ছিল 'Epistle to all the great nations in the world e.t.c. ঐ পত্রে তিনি সমস্ত পৃথিবীকে সমন্বয়ের পথে মিলিত হবার জন্য আবেদন জানান। তার অনেক সুন্দর সুন্দর উত্তর এসেছিল এবং বেশ ফলপ্রদ হয়েছিল।

সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কথাই তাঁর চক্ষের সম্মুখে থাকতো। গ্রামবাসী বা কৃষকদের কথা তিনি ভোলেন নি। সহরের মানুষের জন্য তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন। নারীজাতির কথা তাঁর মনে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছিল। শিশু ও বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি যেমন ব্যগ্র, তেমনি বয়স্ক চাকুরীজীবীদের হাতের কাজ শিক্ষা দিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য সমান ব্যগ্র ছিলেন। তারপর ভৃত্যশ্রেণী ও শ্রমজীবীদের উপযোগী অবৈতনিক—সাধারণ ও নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দুঃস্থদের জন্য Ragged School for the Poor and Destitute (1867), তাদের সকল ব্যয়ভার বহন করে শিক্ষার আয়োজন করেন। কেবল উপদেশ বা বক্তৃতা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, নিজের সাধ্যানুসারে কাজ আরম্ভ করতেন এবং সরকার ও ধনী জমিদারদের এ বিষয়ে অবহিত হবার জন্য নিবেদন জানাতেন।

'সুলভ সমাচারের' একটী লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। এর থেকে তাঁর ভাবটী চমৎকার রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়—

"গরিব-দুঃখী চাষা, দোকানদার যতদিন গরিব-দুঃখী থাকিবে, যতদিন তাহাদের দুরবস্থা দূর না হয়, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। জ্ঞান বিনা, ধর্ম্ম বিনা লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিতেছে। কুসংস্কার ব্যভিচারে কোটি কোটি লোক মরিতেছে। তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করে এমন লোক কোথায়? তাহাদের নিকট পরিত্রাণের সংবাদ দেয়, এমন দয়াবান কে? আমি বলিতেছি না যে, এ দেশে জ্ঞানালোক আসে নাই। আলোক আসিয়াছে,

কিন্তু দুই-পাঁচটি ধনী-মানী-জ্ঞানী লোকের মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিয়াছে। যদি দেশকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে যাঁহারা কিছু জ্ঞান পাইয়াছেন, তাহা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে এবং নগরে নগরে বিলাইতে হইবে। কি জ্ঞান প্রচার করিবে? যাহাতে দেশ রক্ষা পায়, ভাই-ভগ্নীদের দুঃখ চলিয়া যায়, এমন জ্ঞান চাই।"

বিলাতে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতায় এই সব বিষয়ে যা বলেন, তারও কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হল—

"Sir Robert Montgomery introduces me to Sir Erskine Perry, the President of the political committee of the Secretary of State's Council, and I have a long conversation with him chiefly on the education cess question in his rooms at the India Office. He reads to me portion of a letter addressed to him by Lord Mayo in which His Lordship speaks of me in kind terms, and asks him to see me and consult me about the education question. I gladly take the opportunity to explain my views fully, in which Sir Erskine concurs."

—*Diary in England, May 4.*

"The first great duty which the British nation owes to India is to promote education far and wide. It is desirable that you should establish railways and telegraphs, that you should open up works of irrigation, and that you should try in all possible ways to promote the material prosperity of the country. All these certainly are desirable; but, after all, these are only external refinements of civilization, for unless the heart of the nation is reformed and purified, there cannot be anything like true and lasting reformation."

—*England's Duties to India : Lectures in England.*

"I am glad to bear testimony to the fact that the British have never been slow to acknowledge the importance of national education in India. As soon as the necessity of this work was rendered apparent, the British Government set to work at once. The true intellectual emancipation of the country, on something like a national scale, dates from 1854, when the grand charter of India's intellectual liberty was granted. Since that

time, schools and colleges have multiplied on all sides."

"The work of education has been carried on to a great extent, and the inevitable result is, India has been brought to something like an *educational crisis*. Have the Government carried out fully the spirit of that famous despatch to which I have referred? Has education spread among all classes of the people, or are the blessings of true knowledge confined only to the upper ten thousand? Those are the great questions which demand an answer from all who are interested in the country. Have we succeeded in bringing the light of knowledge to the homes of the poorer people, or is it only the richer class who enjoy the benefits of European science and literature? Are the educated people of India endeavouring to constitute a new caste among themselves—a new race of Brahmins?"

"We have too long confined that light to the higher classes, and the time has come for opening our educational establishments, our institutions and schools, to the poor, as well as to the rich. (Applause). If this is admitted, as it does appear generally to be, a serious responsibility rests on the shoulders of the Government to devise some means for carrying out that great object. I do not speak as a statesman or as a politician; I do not pretend to dive into politics; but I look to the ethics of the question. For the sake of the moral elevation of the masses of India, for the sake of truth and good, those millions of poorer people must be blessed with the light of knowledge and wisdom."

"You can not do in India without English education; but if you wish to educate the people, you must educate them through the *Vernaculars* of the country—I also urge upon you the necessity of adopting measures for the purpose of giving instructions in those things which would enable the poor people to receive the light of literature and science, and at the sametime make them proficient in industrial occupations."

"In most cases you must use the *Vernaculars* as the medium of instruction."

"As it is the duty of every Government to promote general education, it is the special duty of the British

Government to educate the females of India. Unless the women are educated, the education of India be partial, and at best superficial, for the women of the country conserve all the traditions, all the errors and prejudices, and all the injurious institutions that exist in the country. If you don't endeavour to give India good mothers you will not be able to save the rising generation from those evils which have always acted as a curse in India; if you educate the females, you give my country good mothers, who will train up their children in the fear and in the love of God, and in the appreciation, and enjoyment of truth, and in that way our people will not only become intelligent men but will have intelligent and happy homes. By giving education to one sex only, you are creating a broad gulf between it and the opposite sex."

'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সাহায্যে তিনি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারের আয়োজন করেছিলেন। All-India Education Conference এ Adult Education বিষয়ে সভাপতির ভাষণে (১৯৫৩) অধ্যাপক অনাথনাথ বসু 'সুলভ সমাচারের' কথা উল্লেখ করেন। এই পত্রিকাটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের উপযোগী ছিল। নানা হিত উপদেশ, সংবাদ, আমোদজনক গল্প, ইতিহাসের কথা, জীবনী, সাধারণ আইন, এমন কি, চাউল ডাইলের দর, বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলি এতে প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথমেই লেখা থাকতো—

"ধন মান লাভ করি সকলেই চায়;
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে উঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম্ম চাও যদি অবারিত দ্বার;
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

আচার্য্য স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় ১৯৫০ খৃঃ সভাপতির ভাষণে এই পত্রিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই পত্রিকার মাধ্যমে এক Correspondence Course ব্যবস্থা করেছিলেন। যে সব মহিলা তাতে যোগ দিতেন, তাঁদের ডাক যোগে প্রশ্নপত্র পাঠানো হত। আবার

ডাকযোগে উত্তর এলে পরীক্ষার ফলাফল ও পুরস্কার ঘোষণা করা হত।

এ ছাড়া তাঁরা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীর সেবা, গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করেছেন, তাও দেখা যায়। মোড়পুকুর 'সাধন-কানন', বেলঘোরিয়া 'তপোবন' প্রভৃতি কেবল নিজেদের সাধনভজনের জন্যই যে গঠন করেছিলেন, তা নয়। ঐ সুযোগে তিনি সপরিবারে ও সবান্ধবে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশতেন, গ্রামের রাস্তা তৈয়ারী, পুকুর জঙ্গল পরিষ্কার করা, ফুলবাগান তৈয়ারী করা, স্বাস্থ্য ও নিরক্ষরতা দূর করা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কাজও করতেন। ঐ সঙ্গে নীতি ধর্ম্মের প্রচারও ছিল।

তারপর 'পদযাত্রার' কথা। আজ আমরা সকলেই বিনোভাজীর পদযাত্রার কথা শুনি। মহাত্মা গান্ধীর 'পদযাত্রার' কথাও আমরা এখনো ভুলিনি। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 'পদযাত্রা' বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরব-কাহিনী। এত বড় শিক্ষা-ব্যবস্থা বুঝি আর হয় নাই। ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ-দলও তাঁদের প্রচার-কার্য্য মুখ্যতঃ 'পদযাত্রার' দ্বারাই করেছিলেন। তখন মোটর, বাস, ট্রেণ, ষ্টীমার বা এরোপ্লেনের দিন ছিল না। পায়ে হেঁটে বা নৌকায় গ্রাম থেকে গ্রামে যেতে হত। যেটুকু ট্রেণে সম্ভব, সেইটুকুই ট্রেণে যেতেন। ১৮৭৯ খৃঃ তাঁরা একবার 'পদযাত্রায়' বের হন। তার বিবরণ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল *। জাতীয় শিক্ষায় ও জাতীয় ঐক্য-সাধনে এর দান অশেষ। বিশেষ করে এই প্রচার-যাত্রায় তাঁরা এক নূতন ভাব নিয়ে বের হয়েছিলেন। Mirror পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রার্থনার অংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"'The Mother, The Mother, The Mother'—This is the battle cry! Ye shall go forth from city to city and from village to village, singing my mercies and proclaiming me unto all men that I am India's Mother."

---

* 'The Book of Pilgrimage'—Keshub Chunder Sen

'মা' নামকে উল্লাসবাণী রূপে গ্রহণ করে, জাতির সেবায়, এবং জাতীয়তার উদ্বোধনে 'মা' নামের সেই প্রথম ব্যবহার। একথা সে সময় পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মনে হয় * তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' রচনা করেছিলেন।

ঐ সময়েই তিনি 'নবঅধ্যয়নের' প্রবর্ত্তন করেন। তার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা ও ফলাফল নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। সে সময় স্কুলে কলেজে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের জন্য একই রকম শিক্ষা-প্রণালী ও কেবল পুস্তকগত বিদ্যারই ব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার কথা ধ্যান করেই আচার্য্য কেশবচন্দ্র এত রকম ভাবে, এত রকম দিকে সকল শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ও তাঁর ধ্যানলব্ধ সম্পদকে তিনি দেশবাসীর হাতে নিবেদন করে গেলেন। তখন বাঙ্গলা দেশে ও বাহিরে যে সকল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রভৃতি, সকলের সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত ছিলেন। তাঁরাও আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত রেখে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন। আমরা দেখি, তিনি বেথুন কলেজের সভ্য ছিলেন, Social Science Association এর স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সভাপতি ছিলেন, বেথুন সোসাইটীর সভ্য ছিলেন, Indian Association for the Cultivation of Science এর সভ্য ছিলেন, এরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে ও কমিটীতে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর অনুগামীদের ভিতর অনেকেই পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়ে নূতন আদর্শ সঞ্চারিত করেন।

---

* 'আনন্দমঠ' ১৮৮০-৮১ খ্রীঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের Liberal পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে মুদ্রিত হয়েছিল।

১৮৯০ খৃঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন প্রথম দেশীয় Vice-Chanceller পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন ভাই প্রতাপচন্দ্র সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই Society for the Higher Training of Young Men or Calcutta University Institute গঠিত হয়। তাঁর সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ ১৯০৯ খৃঃ বলেন—

"Another endowment deserves special mention, as it will serve to keep alive the memory of one of our most honoured colleagues, the late Protap Chunder Mozoomdar, who had devoted a life-time to maintain a healthy atmosphere among our students."

ব্রহ্মানন্দের তিরোধানে তৎকালীন Vice-Chancellor Hon'ble Justice H. J. Reynolds মহাশয় Convocation বক্তৃতায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, সেটী এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—

"We meet now and then with a man, in whose character the various elements are so genially mixed, that while the powers of a capacious intellect are cultivated to their fullest development, the soul remains as pure as the soul of a child, and the heart as tender as the heart of a woman. When such a man has the divine faculty of impressing others with the great truths which permeate his own soul, he becomes a leader of men, and *his appearance inaugurates a new era in the spiritual and mental history of the world.* Such was Sakyamuni probably the greatest man whom this country has ever produced. But Sakyamuni, you will perhaps say, is a semi-mythical personage; his age is too far removed from ours; the conditions of modern life are different; to us of the present day he is little more than an abstraction and a name. Well,—*this country has produced, in the present century, a man cast in a very similar mould,* a man who has lived and worked among us, whose features were familiar to us all, and whose words are still fresh in the memory of many who are present today. I will not attempt to determine the exact rank which history will assign to Keshub Chunder Sen in the noble band of thinkers, reformers, and philanthropists. The full

measure of his greatness we of the present generation are perhaps unable to appreciate; just as a traveller, standing at some mountain's foot, cannot truly estimate the height of the eminence which towers above him. On this point, the next age will form a more accurate judgment than is possible now. But I think we shall not err in saying that when the verdict of posterity is passed upon the life and work of Keshub Chunder Sen, *four characteristics in his career* will be marked out for prominent notice."

"*First*, the marvellous harmony with which his mind united some of the noblest products of Western culture and civilization, with the depth and thoughtfulness of the Oriental intellect. *Secondly*, the just proportion which his temperament maintained between the domain of thought and the sphere of action. Penetrated as he was with the spirit of devotional religion, he was yet no visionary mystic, his periods of seclusion and meditation were but intervals in which he gathered inward strength for the active prosecution of the work to which his energies and his life were devoted. *Thirdly*, the catholic spirit which led him to recognise the germs of truth in all religious systems, and to assimilate the loftiest and most ennobling principles of them all. *Fourthly*, the generous and large-hearted charity which made his career a crusade against all forms of ignorance, oppression and wrong. The amelioration of suffering, the extension of education, the advocacy of temperance, the discouragement of child-marriage, the emancipation of the Hindu widow,—these were the *practical aims by which he sought to lighten the burdens and elevate the condition of those around him*, no less than by the speculative truths of the pure and lofty theism which he taught."

"I have dwelt at some length upon this topic, partly because, in such an assembly as this, it is natural to refer to so momentous an event as the death of *one of India's noblest sons*, and also because the subject is one which seems to me not inappropriate to the occasion which has called us together today. For, though much of Keshub Chunder's greatness was peculiarly his own, the distinctive character of his teaching was largely influenced by his education and training. It is a rare

thing for a great religious reformer to be a tolerant man. A religious reformer must be thoroughly in earnest; and a thoroughly earnest man, from the depth of his own convictions, is apt to be impatient with those who differ from him, and to be blind to the merits of any other system than his own. The breadth of view which distinguished Keshub Chunder Sen, the catholicity of mind which gave him earnestness without intolerance, and faith without dogmatism, was due (if I mistake not) to his study of history, to his knowledge of the rise and progress of other theological systems, to his acquaintance with the phenomena of religious thought in other ages and other countries. He was an illustrious example of that culture which it is the aim and the end of this University to foster, the development of the Eastern mind through the science and the literature of the West. And there is another reason why, before such an audience as is gathered here today, I should speak of the great man whom India has lost. *The life of Keshub Chunder Sen is a pledge and an assurance that Providence has yet a great destiny in store for this land.* The age and the country which has produced such a man may well look forward with hopeful anticipation to the next scene of the drama in which he played so distinguished a part. But it is not enough merely to wait and to hope. It remains for you, the students of this generation, to follow in his footsteps, to complete his work, to show yourselves worthy to be called his follow-countrymen !"

ব্রহ্মানন্দের শিক্ষানীতি ছিল স্বাভাবিক ও জাতীয় ভাবে দ্রুত-শিক্ষা-পদ্ধতি, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য যথোপযোগী শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা করা, নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা, চিত্তের বিকাশ, শিক্ষাকে জীবনগত করার ব্যবস্থা করা, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার করা, ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং 'নব অধ্যয়ন' বা সকল চিন্তা, সকল ধর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল মহাপুরুষের জীবন অধ্যয়ন করে তার সামঞ্জস্য সাধন করা। নববিধান বা সমন্বয়-ধর্ম্ম ছিল ব্রহ্মানন্দের সর্ব্বোচ্চ বার্ত্তা। পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল নীতি কি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে

প্রভাবান্বিত করেছিল, এখন সংক্ষেপে তার আলোচনা করবো।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে যে নূতন শিক্ষার আয়োজন ও চলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তার সুফল শীঘ্রই দেখা দিল। ১৯০৪ খৃঃ নূতন University Act বিধিবদ্ধ করা হল। ১৯০৬ খৃঃ স্যার আশুতোষকে Vice-Chancellor পদে নিযুক্ত করে ঐ Act কে কার্য্যকরী করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষেরা ব্যবস্থা করলেন। তখন আশুতোষের বয়স মাত্র ৪২ বৎসর। তিনি পূর্ণ উদ্যমে ঐ কাজ হাতে নিলেন। বহু তর্ক বিতর্ক আলোচনার ভিতর তিনি নূতন কর্ম্মনীতি (New Regulations) সম্পূর্ণ করলেন এবং আট বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে ঐ ব্যবস্থাকে কার্য্যে পরিণত করলেন। ১৯০৭-১৪ খৃঃ প্রতি বৎসর, Convocation Address এ, স্যার আশুতোষ ঐ সকল বিষয় সর্ব্ব-সমক্ষে বিশদভাবে উপস্থিত করতেন। বক্তৃতাগুলি অতি মূল্যবান।

১৯০৭ খৃঃ বক্তৃতায় দেখা যায় যে, Recognised স্কুল ও Affiliated কলেজগুলির পরিচালনা, পাঠ্যবিষয় (Course of Studies) ও শিক্ষাপদ্ধতি (Method of Teaching) স্থির করার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর স্থাপিত হল। তখন থেকে স্কুল কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে পরিগণিত হল। কাজটী খুবই কঠিন ও জটিল ছিল, কিন্তু তাহা যে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা বিষয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দায়িত্ব এল। পাশ্চাত্য Residential College ও প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে শিক্ষা-ব্যবস্থার মত ব্যবস্থাই তাঁদের আদর্শ ছিল। গুরু শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার সহজ সম্বন্ধ সাধন ছিল তাঁদের লক্ষ্য। একদিকে পরীক্ষা-পদ্ধতি সহজ করা হল, শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষার ব্যবহার গৃহীত হল; অন্যদিকে আধুনিক

জগতের সঙ্গে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগরক্ষার এবং ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থাও রইলো। ছাত্রদের চিত্ত ও বুদ্ধির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের উপযুক্ত করে পাঠ্য বিষয় স্থির করা হল। উচ্চশিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার জন্য University Lecturers ও Doctorate উপাধি প্রভৃতির ব্যবস্থা হল। ঐ ব্যবস্থায় ক্রমে বিস্তৃত Post-Graduate Departments of Arts and Science গড়ে উঠলো—পাঠ্য বিষয়ে বাংলা ভাষার স্থান হল এবং দেশ-বরেণ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার সি ভি রমণ, ডাঃ গণেশপ্রসাদ, ডাঃ P. Bruhl, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে বসান হল। এই সব ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে নববিধির অধিকাংশ মূলনীতি কার্য্যকরী হয়ে উঠলো ; যথা—১। স্কুল ও কলেজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন, ২। জ্ঞানকে জীবনগত করা যায়, এমন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন, ৩। জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে নৈতিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধন, ৪। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষার কেন্দ্র না রেখে, জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের কেন্দ্রে পরিণত করা। এর ভিতর দিয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শিক্ষানীতি কতকাংশে সফল হল।

স্যার আশুতোষ ছাত্রদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার ভিতরেও ব্রহ্মানন্দের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল—

"You must be your own teachers and self-education will become to each one of you a sacred task and solemn duty".

"It ought to be your pleasant duty, as it is your proud privilege, to be the interpreters of Western culture to the Eastern mind. Assimilate, therefore, all that is best and of abiding value and interest in Western literature, Western philosophy and Western science, and communicate the result to those amongst your countrymen who have not been favoured like yourselves and have not enjoyed the benefits of an English education. At the sametime, though steeped in the culture of the West, disregard not all that is most sublime in Indian thought and all that is best in Indian

manners and customs. Neglect not in the glare of Western light, the priceless treasures which are your inheritance. In your just admiration for all that is best in the culture of the West, do not, under any circumstances, denationalize yourselves. Do not fail to rise above the petty vanities of dress and taste. Above all, sedulously cultivate your *vernaculars*, for it is through the medium of the vernaculars alone, that you can hope to reach the masses of your countrymen."

"You ought to be the trusted *interpreters* of the West to the East and of the East to the West".

"May you be faithful representatives of England's goodwill to India and of India's claim on England, and may in this manner, remove distrust and misconception and spread mutual confidence and mutual light".

'Evade not difficulties when they face you, but solve them to the best of your ability. Satisfy not yourselves with convenient or comfortable doctrines, merely because they appeal to your feelings or imagination and are propounded with an air of authority or dogmatism. Sternly examine them and accept them only if they stand the test of truth and reason. But at the sametime, be tolerant of the opinion of others, and be charitable in your interpretation of their motives and action; for remember that true independence of character is perfectly consistent with a feeling of reverence where reverence is justly due".

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খৃঃ বিশ্ববিত্তালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড নর্থব্রুককে নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে লিখেছিলেন—

"It is not theological teaching for which I contend, but moral education. The former is wisely interdicted in all schools and colleges supported by the State, as it would convert these institutions into proselytising agencies and cause serious and unwarrantable interference with the prejudices and feelings of the subject population. There is nothing, however, in the educational charter of India to prevent moral training, in which all classes are equally interested and which all would hail with alacrity. Hindus, Mohammedans, Parsees and Christians would all be delighted to see their children brought up in the knowledge and practice of virtue,

and far from feeling disaffected would feel profoundly grateful for blessing. It may be asked—can we teach morality without religion? Certainly not. A belief in God is the foundation of morality; without such belief it would be as absurd and hopeless to engraft moral ideas and habits in the youthful mind as to build a solid fabric on a sandy basis. No student would accept the obligations of morality if he did not recognize the Supreme Moral Governor. It is therefore beyond all cavilling and controversy that it is impossible to upbuild moral reformation on an absolutely secular and godless basis. We must then eschew sectarian and dogmatic theology, and yet not banish God from our scheme of moral edification. In other words it whould be godly but not dogmatic. I am fully persuaded that if the Government were to follow such a plan, the object in view would be gained".

"In the first place I should recommend the study of Natural Theology, not as a separate subject, but in connection with the various branches of the physical sciences which are at present taught".

"Secondly, special attention should be devoted to ethics. The candidates for matriculation should learn the elements of the science, its higher branches being reserved for the advanced classes".

"Thirdly, such books or extracts should be introduced into the University course as may appear to competent judges to be well-calculated to instill high moral principles, such as honesty, veracity, charity, courage, sobriety and patriotism in the youthful mind"

"Fourthly, as no scheme of moral teaching can be successful unless the teachers possess unexceptionable character and can set good examples".*

ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আশুতোষ ১৯০৮ খৃঃ যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে আচার্য্যদেবের কথার কত ঐক্য দেখা যায়—

"It is however undesirable that, as His Excellency has so appropriately pointed out, no system of education which is purely intellectual and which leaves severely

---

* 'Nine letters to Lord Northbrooke on Educational Measures'—Keshub Chunder Sen.

alone the moral and religious elements of life, can satisfy the national want or promote the growth of healthy manhood".

"But there is no reason why, meanwhile, moral and religious training should not be coincident with intellectual discipline. If this is fundamental to all real progress, as I firmly believe it to be, it is surely our duty to see that while our youths are forming their habits of body and mind, they are also forming their habits of moral and spiritual life, and that they are taught, not necessarily in the college, but simultaneously with their college lessons, to build on firm foundations their ethical conduct and their religious faith"

ক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধার্ম্মিকদের কথা, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের ইতিহাসের চর্চ্চা আরম্ভ হল। এই বিষয়ে আশুতোষ ব্রহ্মানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নবঅধ্যয়নকে দৃঢ়মূল করে গেছেন। ১৯০৭ খৃঃ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'পালিভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ে অধ্যাপক কোসাম্বী, 'বেদ' শিক্ষার জন্য অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী ও 'বেদান্তদর্শন' শিক্ষার জন্য অধ্যাপক রামাবতার শর্ম্মাকে নিযুক্ত করা হয়। মৌলবী খোদাবক্স মুসলমান শাসনকালের পারসিক সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেন ও পাটনায় একটী গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। পালি চর্চ্চা আরম্ভ হলে, ১৯০৮ খৃঃ জার্ম্মান অধ্যাপক Pischel এসে প্রাকৃত ভাষার চর্চ্চা ও গবেষণা আরম্ভ করলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হয় এবং অনুরাগ দেখা যায়। ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ঐ বিষয়ে অনেক কাজ করেন ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯১২ খৃঃ জাপানী অধ্যাপক য়ামাকামী 'Systematic Buddhism' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। Jacobi, Sylvain Lévi প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং ঐ বিষয়ে ধারাবাহিক চর্চ্চা আরম্ভ হয় ও বহু সুন্দর সুন্দর গবেষণা এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইদানীং ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের পরিচালনায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার উপর শিক্ষক ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রভাব বিষয়ে ১৯১০ খৃঃ বক্তৃতায় আশুতোষ উল্লেখ করেন। ছাত্রেরা রাজনীতি ও কূটনীতি(Politics) থেকে দূরে থাকবে, এই কথা তিনি ঐ বক্তৃতায় বিশেষ করে বলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে সদস্য বা অধ্যাপক নিয়োগ করতেন, তার থেকেও বুঝতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে তিনি কত মনোযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি কত প্রখর ছিল, তার উদাহরণ স্বরূপ একটী কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। মাননীয় ডাঃ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে, তাঁর দ্বিতীয়া ভগিনী অমলা দেবীর সঙ্গে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যখন বিবাহ স্থির হয়, তখন স্যার আশুতোষ কিছু দিনের জন্য ভাবী জামাতাকে বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের জন্য সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় ব'লেই অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের শিক্ষাধীনে রেখেছিলেন।

'শিষ্য-প্রকৃতির' কথা ব্রহ্মানন্দ তাঁর জীবন-বেদের এক অধ্যায়ে বলেছেন। শিষ্য-প্রকৃতি একটী বিশেষ সাধনের বস্তু। ১৯১১ খৃঃ বক্তৃতায় আশুতোষ বলেন—

"India, indeed, cherishes with pride the memories of times long gone by when she was a seat of high intellectual and spiritual culture, and of a learning developed in many directions. But that ancient glory has faded away, and we fully realize that at the present time and probably for a long time to come, we have to occupy the position of learners".

বিদেশের মনীষী, সাধক ও যশস্বী অধ্যাপকদের কথা তিনি প্রতিবৎসর Convocation বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন এবং দু-একজনকে Hony. Doctorate উপাধি দিয়ে ও তাঁদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করে সম্মানিত করেছেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ভিতর যাতে সত্যানুরাগ সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে, সেজন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। কেবল তাই নয়, জীবনে যা-কিছু মিথ্যা, তাকে বর্জ্জন করার শক্তি এবং সত্যকে গ্রহণ করার সাহস যাতে

আসে, তার জন্যও তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১১ খৃঃ বক্তৃতায় আশুতোষ বলেন—

"What we require, are investigators of our past, fully fair-minded, but at the sametime, fully clean-eyed and brave-hearted men animated by generous sympathy for what we were and what we accomplished in old times, but, on the other hand, fully prepared to point out where we achieved little or failed altogether; ready to acknowledge, without shrinking, weak points of national character and their disastrous consequences; unwilling to hide defects of ancient modes of thought, institutions, customs, practices,—men, in short, who are brave in the bravery of their conviction and do not hesitate to acknowledge and stand by historical facts, even if they should be highly unpalatable".

ব্রহ্মানন্দ দেশবাসীকে জাগ্রত করার জন্য যে ভাবে তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে ভাল মন্দ উভয়ই দেখিয়ে দিতেন, সেই কথাই যেন আশুতোষের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞীকে যে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় (১৯১২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী), তার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হল—এর ভিতর ব্রহ্মানন্দের মতই আশুতোষ ইংরাজ-শাসনে বিধাতার হাত দেখেছিলেন—

"The inestimable advantages and blessings, for which India is indebted to its connexion with Great Britain, are of so manifold a nature that we cannot undertake even to touch on them as a whole; but there is one boon, and this surely one of the greatest, to which the representatives of the universities feel entitled, nay bound, to refer specially—we mean the access which the union of the countries has given us to the priceless treasures of modern western knowledge and culture, literature and science".

"When therefore, appearing before our gracious king-emperor, who symbolizes to us in his own person as it were the happy union between Great Britain and India and all the blessings springing from it, we, the representatives of the Indian Universities, feel strongly urged to give expression to a feeling of deep gratitude—gratitute to *providence* for *kind dispensation* which has

tied fates of India to those of a Western country so advanced and enlightened as Great Britain".

"We humbly request permission to assure your Gracious Majesties that the Indian Universities, which are the leaders in the great intellectual movement that at present is reshaping India, are vividly conscious of the very weighty responsibilities which this their place and function impose on them".

"They rejoice in the thought that it may be given to them to contribute their share towards the successful accomplishment, under *Providence*, of that great task which the world-wide British Empire has taken upon itself for the good of Humanity".

সম্রাট একটী মনোজ্ঞ উত্তর দেন এবং তার ভিতর বলেন—

"It is to the universities of India that I look to assist in that gradual union and fusion of the culture and aspiration of Europeans and Indians on which the future well-being of India and the World so greatly depends".

"You have to conserve the ancient learning and simultaneously to push forward Western science. You have also to build up character, without which learning is of little value. I bid you godspeed in the work that is before you. Let your ideal be high and your efforts to pursue them unceasing and under *Providence*, you will succeed".

এই ভাবে স্যার আশুতোষ জাতীয় বিবর্ত্তনের ধারাকে যথোচিত অনুসরণ করেন এবং তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তির বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে নূতন রূপ দান করেন। যে প্রতিষ্ঠানে কেবল মাত্র অল্পসংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ক্রমে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হল। দারভাঙ্গার মহারাজার বদান্যতায় বিরাট গ্রন্থাগার গঠিত হল। স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থ-সাহায্যে Science College গড়ে উঠলো। কেবল College গড়ে উঠলো নয়, ছাত্রসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হল। ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার

সেন, ডাঃ এস্ ভাটনগর, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডাঃ কে এস্ কৃষ্ণন্, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ও আমার সহপাঠী ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি কৃতী ছাত্রেরা দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করে, বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখোজ্জ্বল করলেন। স্যার আশুতোষ উৎসাহিত হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে, বিজ্ঞানশিক্ষার মান আরো উন্নত করে তুল্লেন। আগে সমস্ত উত্তর-ভারত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ, ঢাকা, পাটনা ও উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হল। স্যার আশুতোষের নিষ্ঠাবলে ও কর্ম্মকৌশলে আজ শিক্ষার কত প্রসার হয়েছে, তা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা গণনা করলেই বুঝতে পারা যায়।

এই কাজে অর্থের অনটন, কর্ম্মীর অভাব চিরদিন ছিল। সেজন্য কিন্তু স্যার আশুতোষ কোন দিন শাসকদের কাছে মাথা নত করেন নি, বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মতন্ত্রের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মত শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে তিনি চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯০৪ খৃঃ লর্ড কার্জ্জন দেশের শিক্ষিতদের মতের বিরুদ্ধে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সংস্কারের যে আইন গঠন করেন, স্যার আশুতোষ ও মাননীয় গোখলে তখনকার সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য হিসাবে তার আপত্তিকর অংশের প্রতিবাদ করেছিলেন, যদিও তাঁদের সে চেষ্টা তখন বিফল হয়েছিল।

স্যার আশুতোষ যে সময় ভাইস্-চ্যান্সেলার হন, তখন ভারতের রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ১৮৮৫ খৃঃ থেকে, জাতীয় মহাসভার আন্দোলনের ফলে, দেশের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু শাসকেরা আশানুরূপ সাড়া না দেওয়ায় শাসক ও শাসিতের ভিতর একটা বেভার দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৯-১৯০৫ খৃঃ লর্ড কার্জ্জন

বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি নানান ভাবে দমননীতি আরম্ভ করেন; যথা—১। সরকারী দপ্তরের কাজের গোপনতা-রক্ষার আইন, ২। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী অধিকার স্থাপনের আইন ৩। বঙ্গদেশকে দুভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা। ছোটোলাট স্যার ব্যমফিল্ড ফুলার ঐ সব নীতি নির্ম্মমভাবে প্রয়োগ করায়, অশান্তি তীব্রতর হয়ে উঠে। বাঙ্গালা দেশে Anarchism ও গুপ্ত সমিতি দেখা দিল। ছাত্রসমাজ তখন ঐ ভাবে ভরপূর।

তার পরেই আশুতোষ ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন। নূতন বড়লাট লর্ড মিণ্টো ধার্ম্মিক এবং মডারেট-পন্থী হলেও, তাঁর সময়েও বুরোক্রেসীর দমননীতির প্রয়োগ চলেছিল। একদিকে শাসকদের তীব্র দমননীতি, অন্যদিকে দেশবাসীর অশান্ত উত্তেজিত মনোভাব—এই দুয়ের ভিতর দিয়ে স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে,যে চরিত্রবল ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা' অতুলনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে, তিনি অনুরূপ আরো কয়েকটী প্রতিষ্ঠানের কাজের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন; যথা, মহাবোধি সোসাইটী, এশিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ। তাঁরই নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটীর অঙ্গরূপে 'ভারত বিজ্ঞান মহাসভার' (Indian Science Congress) প্রতিষ্ঠা। এগুলির সঙ্গে তিনি কেবল যুক্ত ছিলেন বল্লে অন্যায় হয়, তিনি এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

এত কর্ম্মব্যস্ততার ভিতরেও স্যার আশুতোষ তাঁর গার্হস্থ্য কর্ম্মে পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্র কন্যাদের খুব ভাল ভাবে মানুষ করেছিলেন। নিজের সাধাসিধা পোষাক ও চালচলন, নিয়ম ও নিষ্ঠা ছেলেরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রধান-বিচারপতি মাননীয় ডাঃ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনীষা ও

অমায়িক ব্যবহারের সঙ্গে সবাই পরিচিত। মধ্যম পুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বাগ্মী ও দেশনায়করূপে বিখ্যাত হন। অন্য পুত্র দুটীও নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছেন স্যার আশুতোষ ছেলেমেয়েদের কেবল ভাল করে মানুষ করেছিলেন, তাই নয়, তাঁর নিজের প্রাণ দিয়ে গড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করার জন্য তাঁদের অল্প বয়স থেকেই উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে পড়ার সময় আমরা বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদের কাছে ঐ সব কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ডাঃ রমাপ্রসাদ চিরদিন সমানভাবে নীরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করে এসেছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ভাইস্‌চ্যান্সেলর হয়ে পিতার কয়েকটী অপূর্ণ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করে যান। জামাতা ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ভাইস-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। স্যার আশুতোষ মাতৃদেবীর নামে 'জগত্তারিণী-পদক' এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা দেবীর নামে 'কমলা লেক্‌চার' ও বক্তার পারিতোষিকের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। স্যার আশুতোষের নিজস্ব বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। তার কতকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাকী অংশটুকু কলিকাতা National Library তে রক্ষিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষার অর্থে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বুঝতেন, এমন শিক্ষা যা' ভারতবর্ষে একটী নূতন জাতি গড়ে তুলবে। ঐরূপ জাতীয় শিক্ষা রচনা যে কত বড় ব্যাপার এবং কত সময়-সাপেক্ষ, সে কথা বলে শেষ করা যায় না। ভারতের বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা ও বহু শাসনের সমস্যাই ভারতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল করে ফেলেছিল। ইংরাজদের আগমনে নূতন জ্ঞানের আলোক এদেশে প্রবেশ করে ও এক শাসনের প্রতিষ্ঠায় পরাধীনতার ভিতরেও এক-জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করে তোলে। ইংরাজী ভাষা বিজাতীয় হলেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির শিক্ষিতদের ভিতর আজও ভাবের আদান প্রদানের নূতন প্রণালী-স্বরূপ

হয়ে রয়েছে। নূতন যুগের নূতন জাতি কূপ-মণ্ডূক হলে চলবে না—চিন্তায় ও কাজে তাকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সহযোগী হতে হবে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী ভাষা বিজাতীয় হলেও, বিধাতার ব্যবস্থারূপেই ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়ে ভারতবর্ষকে বহির্জগতের সঙ্গে মিলিত করেছে। একদিকে জাতির নিজের চরিত্র গঠন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্গে মিলন সাধন খুবই কঠিন কাজ। ঐ সাধনে প্রেম ও জ্ঞান দুই প্রয়োজন। একদিকে বিশ্বপ্রেম, অন্যদিকে স্বদেশপ্রেম। নবযুগে এর ভিতরে Democracy, Secularism প্রভৃতি বহু নূতন ভাবধারা বর্ত্তমানকে আলোড়িত করে তুলেছে। অতীতে বহু ধর্ম্ম ও চিন্তা মানব-সমাজকে পুষ্ট ও উন্নত করেছিল। মানুষ সেই সকলকে কালের গতিকে সরিয়ে দিয়েছে বা বিস্মৃত হয়েছে। নূতন ও পুরাতন—উভয়কেই সত্য ও সহানুভূতির সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করার সমস্যা বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হয়েছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই সমস্যার সমাধানের জন্যই নূতন শিক্ষার ভিতর Science ও Philosophy, Ethics ও Religion-এর সমাবেশে নূতন 'ধর্ম্মবিজ্ঞান' ও 'সমাজবিজ্ঞান' রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

ঐ বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় * একটী কর্ম্মপদ্ধতি প্রকাশ করেছিলেন। সেটী এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল। পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, এই বিষয়ে জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি এখনো কত দূর অপূর্ণ রয়েছে।

OBJECTS OF THE NEW DISPENSATION.

Unless people know the sundry important purposes which the Church of the New Dispensation is designed and destined to subserve in the economy of Providence, they can hardly form a correct idea of the nature of

* 'The New Dispensation', Dec, 9, 1881.

this great movement in India. Those who look upon it as a mere Hindu reformed Church or a Hindu edition of Western Deism must make endless blunders and hazard absurd opinions regarding its past, present and future. Nor can those critics form a correct estimate of it who regard it as a man-made system of faith, a product of human ingenuity. The New Dispensation is Heaven's gift to the world in the fulness of time. And Providence in giving to a sinful world this heavenly faith has certain deep and important objects to fulfil. Let us see what these purposes are. It is the object of the Church of the New Dispensation:—

1. To reconcile and harmonize the various systems of religion in the world.

2. To make all churches in the East and the West one undivided and universal Church of God.

3. To trace the unity of all Dispensations.

4. To trace the line of logical succession among all the prophets in ancient and modern times.

5. To reduce the truths of all scriptures to one eternal and unwritten scripture.

6. To establish universal brotherhood by uprooting caste.

7. To give a rational explanation of the symbolism and the sacramentalism in which the ideas of great minds are fossilized.

8. To construct the Science of Religion by adopting the comparative method.

9. To find Christ's kingdom of Heaven.

10. To kill idolatry by taking its life and spirit out of it.

11. To explain pantheism and polytheism, and monotheism in relation to each other.

12. To explain the mystery of the Trinity and to show unity in Trinity.

18. To reconcile ancient faith and modern science.

14. To reconcile philosophy and inspiration.

15. To reconcile asceticism and civilization.

16. To reconcile pure Hinduism and pure Christianity.

17. To harmonize the East and the West, Asia and Europe, antiquity and modern thought.

18. To keep ever open the portals of Heaven's inspiration.

19. To establish the doctrines of atonement, incarnation, communion of saints, scriptural infallibility, apostolical succession, yoga and inspiration upon a new basis.

20. To turn men's hearts from physical to moral miracles.

21. To make science supersede supernaturalism.

22. To preach Christ as the son of God, as the Logos in all prophets before and after him.

23. To honour Socrates as the teacher of self-knowledge, Moses as the teacher of Old Tastament ethics, Buddha as the teacher of Nirvana, Mahomet as the teacher of the Unity of God, Chaitanya as the teacher of loving devotion.

24. To educate man and woman and give them a sweet and a heavenly home.

25. To bring down religion from the clouds to man's daily life on earth.

26. To make the home and the bank as sacred as the church.

27. To put down all manner of sin and promote all manner of purity by the power of prayer.

28. To exalt purity above doctrine, life above profession, spirit above letter.

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সুযোগ্য পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে নূতন Syndicate ও Syllabus গঠন করে, নূতন শিক্ষানীতির পত্তন করেছিলেন। ঐ ধারা ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পরেও বহু বৎসর অসংখ্য আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে দেশের কল্যাণ সাধন করেছে। সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। তার ফলেই ভারতের ব্যাবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের স্থান, অর্থনৈতিক ও সাংসারিক উন্নতি; বহু-জাতি-ধর্ম্ম-সমাকীর্ণ সামাজিক জীবনে নূতন সংস্কৃত বলিষ্ঠ একটী জাতির অভ্যুদয়; বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম পারিবারিক সম্বন্ধে মিলিত হয়ে সকলের অধ্যাত্ম জীবনকে পুষ্ট

করেছে। সকল ধর্ম্মের এই নূতন ভাবে, এক পরিবাররূপে পুনরুত্থান, এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার সন্দেহ নাই। বিধাতার নৈতিক নিয়মই এ সমস্তের ভিত্তি। তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখতে না পারলে এই আপাত উন্নতি ও মিলনই সংঘর্ষ ও ধ্বংসের কারণ হবে, সে কথা আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্পষ্ট করে বলে যান। Dr. Albert Schweitzer তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Decay and Restoration of Civilization এবং Civilization and Ethics বই দুইটীতে সেই কথাই স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই নূতন পথে চালনা করার দায়িত্ব বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র শিক্ষাব্রতীদের মনোযোগী করে তুলেছিলেন। ঐ আন্দোলন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সজাগ করে তুলেছিল। পরে তার ভিতর অনেক ক্ষেত্রেই স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। তবে কয়েকটী বিষয়ে তিনি হাত দিয়েছিলেন মাত্র, বলা যায়; যথা—স্ত্রী-শিক্ষা*, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গঠন, Adult education, Vocational education, শ্রমজীবি-বিদ্যালয়, দুঃস্থ-বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস গঠন, Social বা মেলামেশার সুযোগ। ১৯১৯ খৃঃ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য একটী কমিশন গঠিত হয়। স্যার মাইকেল স্যাডলার তার সভাপতি ছিলেন। স্যার আশুতোষ তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ঐ কমিশনের রিপোর্টে স্যার আশুতোষের দীর্ঘ-অভিজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তা ও মন্তব্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার ভার আজ উপযুক্ত সময়ে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের উপর এসে পড়েছে। রাষ্ট্রের সুযোগ্য কর্ণধারেরা ঐ কাজ পূর্ণ করার জন্য প্রাণপণ আয়োজন করছেন এবং তার জন্য আজ স্যার আশুতোষের মত একজন একনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের যে কত প্রয়োজন, সেকথা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছেন।

---

* 'Prospectus of Higher Education for Women' ২৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।

২৭। মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীন ভারত (১৯১৭-১৯৪৭)—

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খৃঃ ও ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃঃ দুটী গৌরবময় দিন। প্রথম দিনটীতে সুদীর্ঘ ও বহুপ্রকার সংগ্রামের পর ভারতবাসী 'ভারতীয় ইউনিয়ন' ও 'পাকিস্তান' নামে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে, স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হন। অন্য দিনটীতে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র গ্রহণ করেন।

প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্ত্তন একটী চিরন্তন ব্যাপার। যেমন ভৌগোলিক জগতে পরিবর্ত্তন চলেছে, তেমনি মানব-জগতে, সমাজে ও রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তন চলেছে। রাষ্ট্র-বিষয়ক সমস্ত ধারণাই আজ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। স্বাধীনতা অর্থে আজ আর কেবল রাজনৈতিক অধিকার বা জাতীয় স্বার্থ বোঝায় না ; সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে, নিজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বোঝায়। তার উপায় কেবল ধনসমৃদ্ধি বা বাহুবল বোঝায় না ; ভগবানের নৈতিক নিয়ম তার প্রধান উপায়—এই কথাই বোঝায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, তেমনি সম্পদ ঐশ্বর্য্যে ভারত পূর্ণ। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কতবার গৌরবময় যুগ দেখা দিয়েছে ; আবার কত সংঘর্ষ, কত উত্থান, কত পতনও হয়েছে। পৃথিবীর কত জাতি এখানে এসেছে ও নিজ নিজ রাজ্যশাসন ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম, বি।ভন্ন ভাষা, বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতাকে এ দেশ স্থান দিয়েছে। তার ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহও হয়েছে। এ দেশ-বাসীর উপর অন্যজাতি আধিপত্যও বিস্তার করেছে। এই ভাবেই বৈচিত্রের সংমিশ্রণে এই ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে। অথচ ভারতবর্ষের ধ্বংস হয়নি—সমস্ত অতীতকে বক্ষে নিয়ে, বর্ত্তমানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ নূতন দৃষ্টিতে, এই সমগ্রতার ইতিহাস রচনা করতে হবে।

রেনেসাঁর পর থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নূতন সংযোগ হয়েছে। ১৭৫৭ খৃঃ পলাসীর ক্ষেত্রে ইংরাজ

শাসনের আরম্ভ। ক্রমশঃ আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা প্রাচ্যে প্রবেশ করেছে। সেই নূতন আলোকে জেগে উঠে, ভারতবাসী ধাপে ধাপে সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তা-বোধ, নব জাতিগঠন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের পথে এগিয়ে গেছে। এ পথ পাশ্চাত্যেরই প্রদর্শিত পথ। স্বাধীনতার যে রূপ সম্মুখে নিয়ে ভারতবাসীরা * রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, আজ তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে। আজ আর কেবল পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের চলবেনা। সেইজন্যই স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ নেতা মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা ও পরিচালনা-প্রণালী বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন। আর, মহাত্মা গান্ধীকে বুঝতে পারলে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ও সেই ধারার অন্যান্য মহাত্মাদের শিক্ষা ও পরিচালনার অর্থ বোঝা যাবে এবং নূতন রাষ্ট্র-গঠন সম্ভব হবে।

১৭৫৭ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ইংরাজ শাসনের আরম্ভ করেন; ১৭৭৩ খৃঃ রেগুলেটিং এক্ট দ্বারা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা তার পরিচালনার উপর ক্ষমতা লাভ করেন, ১৭৮৪ খৃঃ পিটস্ ইণ্ডিয়া এক্ট দ্বারা বৃটীশ পার্লামেণ্টের সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থার যোগ স্থাপিত হয়। যতই হোক, ইংরাজ শাসন হ'ল, বিদেশীয় শাসন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের ভিতর সেই কারণেই অসন্তোষের বহ্নি জ্বলে উঠেছিলো। কেউ কেউ সিপাহী-বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলেছেন। ঐ বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃঃ ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর Proclamation দিয়ে একটা সামঞ্জস্যের পথ দেখান। বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু শাসক ও বহু আইন-কানুনকে এক সাম্রাজ্যের এক নিয়মে পরিবর্ত্তিত করা এবং তার ভিতর ইংলণ্ডের স্বার্থ বজায় রাখা সহজ কথা নয়। নিত্য নূতন সংঘর্ষ ও অশান্তি দেখা দিতে লাগলো—জাতীয় আত্মসম্মান-বোধে আঘাত লাগলো, অর্থনৈতিক

দুর্গতি দেখা দিল, কৃষ্ণকায়দের প্রতি শ্বেতকায় শাসকবৃন্দের অসম আচরণ চল্‌লো, স্বার্থপর বৈদেশিক বাণিজ্যনীতির ফলে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের অবনতি ঘট্‌লো, ঘনঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, জনসাধারণের দুঃখ অশান্তি বেড়েই চল্‌লো। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত দেশবাসী নিজেদের কার্য্যক্ষমতা বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন এবং এই পরিস্থিতিতে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হল।

আমার পূজ্যপাদ পিতামহ শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করার প্রস্তাব করায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন "সুরেন্দ্র, ও পথে যেও না। ওপথে দেশকে পঞ্চাশ বৎসর পেছিয়ে দেবে।" এর অর্থ এই নয় যে, কেশবচন্দ্রের ইংরাজ-মোহ ছিল। লালমোহন ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি রাজনীতিবিদ্ ধুরন্ধরেরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। Indian Mirror ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট, ইংরাজদের অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশিত প্রতিবাদ প্রবন্ধগুলি অতুলনীয়। কিন্তু তার প্রতিকার বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। তাঁর পথ আবেদন নিবেদনের পথও নয়, যুদ্ধ বিগ্রহের পথও নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাস যে বিদ্রোহ-কৌশল শিক্ষা দিয়েছিল তা গ্রহণ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতের নিজস্ব পথ তিনি ধরেছিলেন। তিনি বলেছেন—

"At three places I had to sell my freedom. I had to sell my freedom to my country; and then to my Church, and all that was left, the residue of my independence, was swallowed up by the all-conquering and all-absorbing grace of God".

তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ কি ছিল তার বিষয় এখন দেখা যাক্। Indian Mirror ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সম্পূর্ণ সংগ্রহ থাকলে এই কাজ সহজ হ'ত। আজকাল রাজনীতিতে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান স্বীকার করা হয়না; তিনি কিন্তু স্বীকার

করতেন। New Dispensation পত্রিকায় Our Politics শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৮১ খৃঃ) তিনি বলেছেন—

"We do not dabble in politics. It is beyond our province. But so far there is religion in politics, we are bound to uphold and vindicate it".

তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী অগ্রজের চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলেন—

"What are politics? Politics are nothing else than 'character'. Politics do not consist in representative Government, Legislative Council, Viceroys and Lieutenant-Governors, or in any institution whatever, but in character; character such as is given by religion, by philosophy, by the habits of daily life and the like. ... We might have all that could be desired in the way of institutions and organisations, but if the character of the people remain untouched all these things will be nothing; we need to form a character which will resist evil, embrace truth, oppose tyranny, welcome reform; a character fired with the love of country and all aglow with a passion for justice. A spirit of fairness, of toleration, of liberty must be infused into the vast masses of people before so much as the idea of reform can touch them".*

আজকাল বিধান-সভা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়া এবং সেখানে ক্ষমতা অধিকার করার নাম হল politics ; ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সহযোগীদের কাছে এই ধরণের প্রস্তাব বহুবার এসেছিল, কিন্তু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—জাতির মেরুদণ্ডকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলে সবল করাকেই তাঁরা জীবনের ব্রত করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে অন্তরকে সত্যের আলোকে আলোকিত করে, গৃহ-পরিবারে, পরস্পরের প্রতি আচরণে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই নৈতিক শক্তিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অপেক্ষা শক্তিশালী করে তুলতে পারলেই, নবযুগের অংশীদার হওয়া সম্ভব। অতীত ও বর্ত্তমানের ভাবধারার সামঞ্জস্যের ভিতরেই

* 'Political Education of India' by K. B. Sen, M. A. 1887.

জাতির ও জগতের কল্যাণ। দেখা যায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র একহাতে সত্য এবং অন্যহাতে রাজভক্তি ধারণ করে রাষ্ট্র ক্ষেত্রে চলেছেন। বাইশ বৎসর বয়সে, সিপাহী বিদ্রোহের দু তিন বৎসর পরেই, তাঁর কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। 'Young Bengal—This is for you' (১৮৬০) তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—

"Inspired with unconquerable enthusiasm by the Almighty, they (Indians) would have, with mind and soul, intellect as well as will, manfully endeavour to promote their own best interests and those of their country".

তাঁর 'An appeal to Young India', 'A call to Young India', প্রভৃতি প্রথম বয়সের এবং পরিণত বয়সের অন্যান্য বক্তৃতায় ঐ একই বাণী তাঁর কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল যে, বিধাতার ইঙ্গিত অনুসরণ করে, রাজা সম্রাটের মুকুট পদতলে রেখে, অগ্রসর হও। *

আধুনিক চিন্তাশীল মণীষিদের ভিতর Harold Laski তাঁর 'Dangers of Obedience and other Essays' পুস্তকে বলেছেন—

"No State is ever securely founded save in the conscience of its citizens".

"The supremacy of that last inwardness of the human mind which resists all authority save its own conviction of rectitude".

Bertrand Russel তাঁর 'Justice in Wartime' পুস্তকে বলেছেন—

"Physical liberty may be taken from a man, but spiritual liberty is his birth-right which all the armies and governments of the world are powerless to deprive him without his co-operation".

Dr. Albert Schweitzer তাঁর বিখ্যাত বই 'Civilization and Ethics' বইটীতে এই বিষয়টী চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন। সত্যের বিষয় ধারণা ও চিন্তাকে

---

* 'আরতি'—আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উপদেশ ১৮৮১ খৃঃ।

সুগঠিত করার প্রয়োজন যে কত বেশী এই কথাই তিনি বিশেষ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সত্যের অর্থ কেবল মাত্র অন্যের অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ নয়; সত্যের স্বরূপ জানা এবং নিজের ভুল ধারণা ও ভুল আচরণ সংশোধন করাও সত্যের দায়িত্ব।

সত্যের প্রতি অনুরাগে একটা চ্যালেঞ্জ আছে—আবার একটা তপস্যাও আছে। মানুষের চিত্ত এই দুদিক দিয়েই সত্যের প্রতি অকৃষ্ট হয়। কিন্তু পরাধীন দেশে, বিদেশী রাজার প্রতি রাজভক্তি এবং রাজন্যবর্গের প্রতি প্রীতির সম্বন্ধ রক্ষা করার কথা স্বভাবতই চিত্তকে বিমুখ করে। সেই ভাব থেকে, সাধারণত তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম বিদ্রূপ করা হয়। কিন্তু নববিধানের আচার্য্য কেশবচন্দ্র এর ভিতর যে নূতনের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন সেই ইঙ্গিত আমরা দেখবার চেষ্টা করিনি। মধ্যযুগের অন্ধ-রাজভক্তি এবং সংকীর্ণ-স্বাদেশিকতার উপরে যারা উঠেনি তাদের পক্ষে সেই ইঙ্গিতের ধারণা করাও সম্ভব নয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণের সময় দিল্লীর দরবারে (১৮৭৭খৃঃ) রাজভক্তি ব্যাখ্যা করে কেশবচন্দ্র বলেছিলেন—

"Loyalty in the Hindu mind is a deep sentiment of personal love and attachment to the head of the Government. . . . The Hindu householder loves the father as the head of the house and affectionately obeys his authority; so he loves his sovereign as the father of the State and obeys him as such. That the sovereign is father and mother of the subject population is essentially a Hindu idea. The Hindu idea is also the right idea".

'রাজভক্তি' ও 'স্বাধীনতার' অর্থ চিরদিন এক ভাবে চলে আসেনি। ক্রমে ক্রমে তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। স্বাধীনতা অর্থে আজ বুঝা যায় সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজের দেশে নিজের রাষ্ট্র-আদর্শটাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। একশত বৎসর আগে সিপাহী বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ইংরাজদের বিদায় করে দিয়ে শেষ মোগল বাদশাহকে

রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। এই বিদ্রোহকে আজও কেউ কেউ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন, কারণ এটী ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই সকল ঐতিহাসিকেরা স্বাধীনতার অর্থের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলে ঐ কথা বলতেন না। আরও আগের কালে, প্রজাদের স্বাধীনতা বিষয়ে কোন মতামতই ছিলনা। যিনি রাজ্যের অধীশ্বর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখাতেই তাদের সন্তোষ ছিল। এর অর্থ তবু বুঝা যায়। ক্রমশঃ রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্ম হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দী থেকে প্রজার মঙ্গল-সাধন ও প্রজার অধিকার বিষয়ে রাজারা মনোযোগী হন। ক্রমে প্রজাদের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সংস্কারেও তাঁরা হাত দেন। একে একে 'আমেরিকার স্বাধীনতা' ও 'ফরাসী বিপ্লব' দেখা দিল এবং ইংলণ্ডে 'গণতন্ত্র' আত্ম প্রকাশ করলো। গণতন্ত্রকেই এখন স্বাধীনতার নামান্তর বলা চলে। এতদিন ছিল রাজা থেকে প্রজার বা উপর থেকে নীচের কল্যাণ ব্যবস্থা। এখন নিম্ন স্তরেই নিজেদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা দেখা দিল। প্রাচীন অনুষ্ঠান, সংস্কার ও স্থানীয় অভ্যাস থেকে মুক্তির আহ্বান তাদের নিজেদের ভিতর এসে পৌঁছল। ব্যক্তিগত ও দলগত ভাবে নীতি ও অধ্যাত্ম বোধের জাগরণ হল। এই বোধ যুগের বোধ—এর ভিতর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নেই। এর উপরেই নব সমাজ, নব পরিবার, নব গোষ্টি, নব রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টি এই যুগধর্ম্মের উপর নিবদ্ধ ছিল। তখন অন্য কোথাও গণতন্ত্রের বিশেষ প্রসার হয়নি। ইংলণ্ডেই তার প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই ইংলণ্ড যখন বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রে ভারতের শাসনভার হাতে নিল, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কারণবশতই সেই ব্যবস্থাকে অন্তরের সঙ্গে ভগবানের ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আদর্শবাদী হলেও স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতেন না। শতধা ভারতে, মোগল শাসনের শেষে,

অজ্ঞানতা, পুরাতন আচার ব্যবহার ও অরাজকতার ভিতর যখন আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও গণতন্ত্রপদ্ধতি নিয়ে, ইংরাজেরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন—তখন তিনি তার ভিতর এক অদৃশ্য মঙ্গল হস্ত ও মহৎ সম্ভাবনাই দেখেছিলেন—ইংরেজেরা বিদেশী বলে বৈরীভাবে আত্মবিহ্বল হননি। আসন্নপ্রায় আন্তর্জাতিকতা ও One World কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিল।

"The great work which is going on in India, under the auspices of the British Government, is a work of revolutionary reform—of thorough-going radical reform. This is not man's work, but a work which God is doing with His own hand, using the British nation as His instruments. . . . Certainly the early British rulers in Hindoostan were corrupt, certainly the means often employed by the early settlers were questionable, but I look not to the human agency that was employed but dive beneath it, and see the finger of the all-wise providence working for the redemption of my country. I forget and forgive all that individual Englishman did to injure the cause of Indian redemption, and standing upon the universal basis of humanity, see how in history God employed special agencies to elevate and exalt my countrymen".*

আরও দেখা যায় যে কেবলমাত্র স্বদেশের স্বার্থেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিলনা; এই ব্যবস্থার ভিতর তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলনের সম্ভাবনাও দেখেছিলেন।

"If God then in the inscrutable designs of his providence, has kint together politically these great representatives of Asia and Europe—of the East and the West—namely India and England—is there no moral significance in the fact".*

"Heaven demand's reconciliation, let the earth obey. Let us avail ourselves of all opportunities which God's merciful providence vouchsafes unto us to cement the ties of international fellowship. . . . Whether it is

* **'Lectures in England'—K. C. Sen.**

politics or trade, pleasure or business, that brings the European and the Asiatic races together, I see only the gradual formation of a diversified congregation in the New Church of Atonement which the Lord has upreared in our midst. Everything seems to hasten the day of reconciliation''.†

বিধাতার ব্যবস্থাকেই তিনি রাজভক্তির অর্ঘ্য দিয়েছিলেন—জাতীয় উন্নতির ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায় বলেই তাকে দেখেছিলেন—মানব জাতির মিলনের সোপান ও পরস্পরের বৈশিষ্টের আদান প্রদানের পথ বলেই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে নব রাজভক্তি এই সব নূতন চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল—সেই চ্যালেঞ্জই তিনি দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। আমরা যখন সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মোহনদাস প্রমুখ পরবর্ত্তী চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার ভিতর প্রবেশ করি তখন দেখতে পাই যে কেশবচন্দ্র ছিলেন নূতন রাষ্ট্র-চিন্তার পুরোধা। আবার যখন স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ Commonwealth এর ভিতর স্থান গ্রহণ সিদ্ধান্ত করলেন তখন দূরদর্শী ব্রহ্মানন্দের রাষ্ট্র-উপলব্ধি স্মরণ করে মস্তক স্বতই শ্রদ্ধায় অবনত হয়।

তিনি এক হাতে সত্য এবং অন্য হাতে নব-রাজভক্তি নিয়ে চলেছিলেন। শাসকদের মানবীয় দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার কথা তিনি জানতেন এবং তাঁদের সে বিষয় সচেতন করে দিয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহ যে ইংরাজদের আত্মসংশোধনের জন্যই ঘটেছিল, এই কথা তিনি মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"Now (*after and as a result of the Mutiny*) she (*England*) has come to a right appreciation of that mission and the solemn responsibilities which it involves."

রাজভক্ত, বিশ্বপ্রেমিক, নির্ভীক, সত্যবাদী কেশবচন্দ্র বিলাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শাসকবৃন্দের সম্মুখে যে সব কথা

† 'Asia's Message to Europe'—K. C. Sen

বলেন এখানে তার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করা হল—

"Sedition is rebellion against the authority of God's representative, and therefore against God. It is not merely a political offence, but sin against Providence".

ঐ সঙ্গেই বলেন যে—

"If you rulers are prepared to do your duty, I hope and trust that that merciful God, who has called you to govern that nation, will give you wisdom and strength, faith and piety, enough to rule our race properly; if not, India will not long be in your hands. You will be forced to leave India to herself, and we shall do our business in the best way we can."

ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ও দর্শন, ভারতের যোগ ও ভক্তি যে পাশ্চাত্য জগতের একান্ত অভাব এবং এই মিলনের ভিতর দিয়ে তাঁরা যে ভারতের এই শাশ্বত সম্পদের অংশীদার হবেন, দিব্য চক্ষে এই চিত্র দেখেই তিনি তাঁদের বলেছিলেন—

"And on the other hand, behold England sits at the feet of hoary-headed India to study the ancient literature of the country. All Europe seems to be turning her attention in these days towards Indian antiquities, to gather the priceless treasures which lie buried in the literature of Vedism and Buddhism. Thus while we learn modern science from England, England learns ancient wisdom from India. In the advent of the English nation to India we see a re-union of parted cousins, the descendants of two different families of the ancient Aryan race. Here they have met together, under an over-ruling providence, to serve most important purposes in the divine economy. The mutual intercourse between England and India, political as well as social, is destined to promote the true interests and lasting glory of both nations".

এই নৈতিক গঠন ও স্পষ্টবাদীতার জন্যই ইংরাজ শাসকদের চক্ষে কেশবচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে সামান্য রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত তাঁকে বন্ধুভাবে নিয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতেন,

তাঁর মতামতকে সম্মান করতেন। নীলকরদের অত্যাচার, ইংরাজ সৈনিকদের অনাচার, শিক্ষার প্রসার, দেশবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করা, মদ আফিং প্রভৃতি বন্ধ করা, নূতন বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তন করা, পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা, ইংরাজ ও দেশীয়দের সমানভাবে বিচার ব্যবস্থা, রাজা জমিদারদের দ্বারা শাসন সংস্কার করান এবং তাঁদের দাবী মান্য করা, পৌর-প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা, মুটে, মজুর, চাষা, তাঁতী প্রভৃতি যারা কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত তাদের জন্য সুব্যবস্থা, নারীদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যে সব কথা তিনি বক্তৃতায় ব্যক্ত করতেন বা পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখতেন সে সমস্তই সুফল প্রসব করেছিল। তিনি যখন বিলাতে বক্তৃতা দিয়ে সে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন তখন স্বদেশের কেউ কেউ হিংসা পরবশ হয়ে নানা বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করেন—তাঁদের উদ্দেশ্যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন—

"কেশববাবু ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহা সমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাঁহার বক্তৃতা শক্তিও চমৎকার আছে, ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন। এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপণে সমর্থন না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই।" (২১শে জুলাই ১৮৭০)

১৮৬০ খৃঃ থেকে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ এবং ১৮৮৪ খৃঃ তিনি ইহ জগত থেকে বিদায় নেন। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রভাব জাতির জীবনে যে কতখানি শক্তির সঞ্চার করেছিল, তার পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। ১৮৮৫খৃঃ 'জাতীয় মহাসভার' (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠা তার ভিতর একটী প্রধান পরিচয়। তার আয়োজন

হয় তাঁরই কলুটোলা ভবনে ; W. C. Bonnerjee প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সেখানে মিলিত হয়েছিলেন। তারপর ১৮৮৩ খৃঃ আচার্য্য কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত Albert Hall গৃহে প্রথম National Conference এর অধিবেশন হয়েছিল। এ দেশের দুরবস্থা ও অশান্তি লক্ষ্য করে ইংলণ্ডের মহানুভব জনহিতৈষীরাও ভারতের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। তার ভিতর মহারাণীর ঘোষণা পত্র ও লর্ড রিপণের নূতন শাসন-নীতি প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের 'Young Bengal this is for you' (১৮৬০ খৃঃ) এর মত Allan Octavius Hume তাঁর বিখ্যাত পত্র 'To the Graduates of the Calcutta University লিখলেন ১লা মার্চ্চ ১৮৮৩ খৃঃ—

"If you, the picked men, the most highly educated of the nation, cannot, scorning personal ease and selfish objects make a resolute struggle to secure greater freedom for yourselves and your country, a more impartial administration, a large share in the management of your own affairs, then we, your friends, are wrong and, our adversaries right, then are Lord Ripon's noble aspirations for your good fruitless and visionary, then at present at any rate all hopes of progress are at an end, and India truly neither lacks nor deserves any better government than she enjoys. Only, if this be so, let us hear no more factions, peevish complaints that you are kept in leading strings and treated like children, for you will have proved yourself such. *Men* know how to act. Let there be no more complaints of Englishmen being preferred to you in all important offices, for if you lack that public spirit, that highest form of altruistic devotion that leads men to subordinate private ease to the public weal, that patriotism that has made Englishmen what they are,—then rightly are these preferred to you, rightly and inevitably have they become your rulers. And rulers and task-masters they must continue, let the yoke of their rule gall your shoulders never so sorely, until you realise and stand prepared to act upon the eternal truth that *self-sacrifice* and *unselfishness* are the only unfailing guides to freedom and happiness".

প্রধানত এঁর চেষ্টাতেই জাতীয় মহাসভা গঠিত হয় এবং এঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই প্রতিষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে গড়ে উঠে। ক্রমবিকশের ভিতর দিয়েই জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) জন্ম। এই সভা গঠনের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও ব্যবস্থা করা; কিন্তু কার্য্যত দাঁড়ালো রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা ও তার সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করা। * মহাসভার প্রথম বিবরণীতে দেখা যায়—

"So far as the union was constituted there was absolute unanimity that unswerving loyalty to the British crown was the keynote of the institution, prepared when necessary to oppose by all constitutional methods all authorities, high or low, here or in England, whose acts or omissions are opposed to those principles of the Government of India as laid down from time to time by the British parliament and endorsed by the British sovereign".

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় জমিদারদের জন্য British Indian Association, জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য Indian Association ও এ দেশের মোসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য National Mohamedan Association গঠিত হয়েছিল। এই তিনটি সভাই 'জাতীয় মহাসভা' গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ঐ সভা একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গৃহীত হল। জাতীয় মহাসভার সুদীর্ঘ কাহিনী তার ইতিহাসে ও কার্য্য-বিবরণীতে পাওয়া যায়। তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেবার চেষ্টা করা হল।

'জাতীয় মহাসভার' প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বোম্বাই প্রদেশে ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৮৫ খৃঃ, গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের হলে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবরেণ্য W. C. Bonnerjee এবং উপস্থিত ছিলেন— A. O. Hume, Subramania Iyer, K. T. Telang, Norendra

* 'Indian Politics'—published by G. A. Natesan (1898)

Nath Sen, Girija Bhusan Mukerjee, Janaki Nath Ghosal, Ramkali Choudhury, Dadabhai Naorojee, Pherozeshah Mehta, Rahimatulla Sayani, Dinshaw Wacha, Gangaprosad Varma, Lala Murlidhar, Rangiah Naidu, Ananda Charlu, S. Mudaliar, Veera Raghabachariar, K. L. Nulkar, S. H. Chiplonkar, D. S. White, Raghunath Rao, Mahadev Govinda Ranade, Lala Baijnath, Prof. A. V. Kattawatha, Prof. K. Sundararaman, R. G. Bhandarkar প্রভৃতি ৭০ জন। এই সব নেতাদের নাম আজকাল আর শোনাই যায় না। এঁরাই কিন্তু জাতীয় মহাসভার আরম্ভ করেন। ঐ সভায় বহু রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা হয়েছিল—যথা, ভারতীয় শাসন পদ্ধতির অনুসন্ধানের জন্য রাজ-কমিশন নিয়োগ; শাসন ব্যবস্থার কোন কোন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন; এদেশে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা; ব্রহ্মদেশকে পৃথক করা। সমস্ত আলোচনার ভিতর যে গভীর অধ্যয়ন, অন্তর্দৃষ্টি, এবং শান্ত, গম্ভীর ও স্বাধীন ভাব ফুটে উঠেছিল তার বিবরণ আজও সকলকে মুগ্ধ করে। সভাপতি মহাশয় ভাষণের শেষে বলেন—

"She (Britain) had given them order, she had given them railways and above all she had given them the inestimable blessings of western education. But a great deal still remained to be done. The more progress the people made in education and material prosperity the greater would be the insight into political matters and the keener the desire for political advancement. . . . Desire to be governed according to the ideas of Government prevalent in Europe was in no way incompatible with their thorough loyalty to the British Government. All that they desired was that the basis of the government should be widened and that the people should have their proper and legitimate share in it".

প্রথম অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কেশবচন্দ্রের শিক্ষা ও নীতির পথের সাদৃশ্য তাঁদের ভিতর ছিল। পরের বৎসর কলিকাতা Town Hall এ দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে অধিবেশন হয়। ঐ সভায় পণ্ডিতবর ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ষ্টীমার পার্টির আয়োজন করেন। বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন রাজভবনে সভ্যদের সম্বর্দ্ধনা করেন। মাদ্রাজে তৃতীয় অধিবেশন হয়। ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর ও বরোদার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী রাজা স্যার টি মাধব রাও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও বদরুদ্দীন তায়েবজী মূলসভার সভাপতি ছিলেন। বড়লাট জনহিতৈষী লর্ড কোনেমারা অভ্যাগত সভ্যদের রাজভবনে আপ্যায়িত করেন। এই দুই অধিবেশনের উদ্যোক্তারাও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। নৈতিক শাসন, রাজভক্তি ও পরস্পরের কল্যানের ভাব তাঁদের সকলের ভিতর প্রবল ছিল। চতুর্থ অধিবেশন হয়, ১৮৮৮ খৃঃ এলাহাবাদে। ছোটোলাট স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন এংলো-ইণ্ডিয়ান মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন—ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবী তাঁর মনঃপূত ছিলনা। তিনি দূরে থাকবার জন্য ঐ সময়ে এলাহাবাদ ছেড়ে সফরে চলে যান। কোন কোন রাজা মহারাজা তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য মহাসভার কাজে অসহযোগীতার ভাব দেখান। সে যাহাই হোক, সাধারণ দেশবাসী এবং দারভাঙ্গার মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিং প্রভৃতির উৎসাহে অধিবেশন ভালই হয়।

এলাহাবাদের ঘটনায় শাসক শাসিতের বিরোধের সূচনা করে। সেই বিরোধ ক্রমে বেড়ে উঠলো। ভারতীয় দাবী ছিল—Judical ও Executive বিভাগের পৃথকীকরণ, Legislative Council এর Reform ও Expansion, পরে দুই অধিবেশনে ওয়েডেরবর্ণ ও আলফ্রেড ওয়েব মহাসভার সভাপতিত্ব করেন। Irish Home Rule আন্দোলনের নেতারা এবং পার্লামেণ্টের কোন কোন সভ্য মহাসভার সমর্থন করতে লাগলেন। একবার বিলাতে মহাসভার অধিবেশনের প্রস্তাব হয়, কিন্তু সম্ভবপর হয়নি। আন্দোলনের ফলে লালমোহন ঘোষ ও দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সভ্য হলেন। এদিকে শাসনকর্ত্তাদের বিরক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তাঁদের হুকুমে রাজকর্ম্মচারীদের মহাসভার অধিবেশনে যোগদান রহিত করা

হল এবং দুটী অন্যায় আইন (Jury Notification ও Legal Practitioners Bill) প্রবর্ত্তন করা হল। ১৮৯৫ খৃঃ পুণায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় এই সকল অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে ভারতের দাবীগুলি প্রকাশ করলেন ও দেশবাসীকে উত্তেজিত করে তুল্‌লেন। শাসকেরাও বিনাবিচারে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে দেশান্তরীণ করলেন; আসামের কুলী-চালান-নীতি, University Bill, বঙ্গ-ভঙ্গ আইন, Official Secrets Bill, আসামে হেনরী কটনের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনা দ্বারা দেশবাসীর মনে বিদ্রোহের ভাবকে বাড়িয়ে তুল্‌লো। এই অবস্থায় নেতৃত্ব করার জন্য কলিকাতার অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করা হল। ঐ সভায় ১৯০৬ খৃঃ তিনি এক নূতন কথার ঘোষণা করলেন—"স্বরাজ"। ঐ সঙ্গে তিনি জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার ও বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব করলেন। তাঁর ভাষণে জাতীয় মহাসভা নূতন কর্ম্মপদ্ধতির ইঙ্গিত পেলো। এর পর একে একে Self-Determination, Home Rule, Swaraj ও পূর্ণস্বাধীনতার চিন্তা জাতির চিত্তে উদ্ভাসিত হল।

জাতীয় মহাসভার জন্মের ভিতর যেমন একটী ক্রমবিকাশের ধারা আছে—তার গঠনের ভিতরেও বিশিষ্ট ক্রমবিকাশের ধারা দেখা যায়। তাঁদের সবই নূতন করে গঠন করতে হয়েছিল—নূতন মানুষ, নূতন কার্য্যপ্রণালী নূতন উপকরণ। ধীরে ধীরে মহাসভার নিয়মাবলী সুগঠিত হল—সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হল। Hume সাহেব ১৮৮৫-১৯১২ খৃঃ সম্পাদকের কাজ করেন। যুগ্ম সম্পাদকরূপে সুযোগ্য পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ, আনন্দ চার্লু, দিনস ওয়াচা, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, দাজী আবাজী খের প্রতিষ্ঠানটিকে তিলে তিলে গড়ে তুল্‌লেন। ১৮৮৯ খৃঃ W. C. Bonnerjee, Pheroz Shah Mehta ও Ananda Charlu আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা মনোনীত হলেন।

পাশ্চাত্য রাজনীতির পথ অনুসরণ করেই জাতীয় মহাসভা গড়ে উঠেছিল। তার গঠনে দুটি নীতি বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে—প্রথমঃ জাতীয়তা এবং দ্বিতীয় নৈতিক বন্ধন। ব্রহ্মানন্দ ধর্ম্ম ও নীতিকে জাতীয়তার বন্ধন স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে জাতিবর্ণ-বৈষম্যশূন্যতা, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম্মসমন্বয় ও নৈতিক উৎকর্ষ দেশবাসীর জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব জাতীয় মহাসভার প্রচেষ্টাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এখন তাঁরা ভারতবাসীর রাজনৈতিক অভাববোধ, আইন সংস্কারের চেষ্টা, অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি সাধনের ঐক্যকে জাতীয়তার বন্ধন স্বরূপ গ্রহণ করলেন। রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-প্রশ্ন তখনও আসেনি। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বেশভূষাধারী, বিভিন্ন আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষেরা মহাসভার প্রতিনিধিরূপে একই জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র দেশের উন্নতির প্রশ্নকে নিজেদের প্রশ্ন করে নিয়েছিলেন। বৈধ উপায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, রাজভক্তি ও জাতীয় নেতাদের অনুসরণ করা—এই তিনটি নীতিকে জাতীয় মহাসভা দৃঢ় ভাবে ধরলেন। জাতীয়ভাব ও নৈতিক বন্ধন—এই দুই কারণে দেশে ও বিদেশে জাতীয় মহাসভা বরাবরই ভারতের রাজনৈতিক প্রতিভূরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯১১ খৃঃ সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ দিল্লী দরবারে জাতীয় মহাসভার প্রদত্ত মানপত্র গ্রহণ করে তার জাতীয়-প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ খৃঃ বৃটিশ পার্লমেণ্টে জাতীয় মহাসভার হাতেই ভারতের শাসনভার ন্যস্ত করে গেলেন। স্বাধীনতা গ্রহণের পরেও এই নৈতিক বন্ধনের জোরে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত-বর্ষের পক্ষে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ হয়েছিল।

শাসকদের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার লাভ বিষয়ে বিশেষ সাফল্য না দেখা দিলেও, মহাসভার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে জাতীয় চরিত্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে—জাতীয় আত্মসম্মান বোধ, আত্মনির্ভরশীলতা,

আত্মত্যাগ, কর্ম্মশক্তি, সভতা ও নৈতিক বলের সঞ্চার করেছে। বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের আন্দোলনে অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের দিকে জাতির দৃষ্টি পড়েছিল। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনও দেশের চিত্তকে আলোড়িত করেছিল। প্রতি প্রদেশে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষদের উদ্ভব হওয়ায় এবং তিনটি স্বাধীন রাজ্য নিজ নিজ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করায় ভারতবাসীর মনে আত্ম-বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল এবং পৃথিবীর লোকদের মনে ভারতবাসীর যোগ্যতায় প্রত্যয় হয়েছিল। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে রাজ-নৈতিক লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তার ফলে, ব্রহ্মানন্দের প্রবর্ত্তিত নৈতিক আন্দোলনে দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষায় যে নূতন প্রাণ ও সাম্যভাব দেখা দিয়েছিল সেই দিকটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্তই উদ্দেশ্যমূলক, বাহিরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, উন্নত-অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থ, প্রাদেশিক স্বার্থ প্রভৃতি মাথা তুল্‌লো এবং জাতীয় জীবনকে জর্জ্জরিত করে তুল্‌লো। ব্রহ্মানন্দ স্বরেন্দ্রনাথকে যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হল।

অন্যদিকে আশানুরূপ রাজনৈতিক অধিকার লাভ না করায় জাতির ভিতর অসন্তোষ দেখা দিল। লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি জাতীয়-আকাঙ্ক্ষা-বিরোধী শাসননীতি অবলম্বন করায় দেশবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। জাতীয় মহাসভার ভিতর নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের সৃষ্টি হল। প্রথম দল ধৈর্য্যের সঙ্গে মহাসভার নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন; অন্য দল ইংরাজ বিদ্বেষ, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ও সেজন্য 'no means too mean' বুলি ধরলেন। 'লাল—বাল—পাল' অর্থাৎ লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের নাম এই চরমপন্থীদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। স্বদেশী আন্দোলন ও শোভাযাত্রার আরম্ভ এই সময়। গণ-আন্দোলনকে তাঁরা স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় স্বরূপ ধরলেন। তখন কিন্তু জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা ও চিন্তার প্রসার খুবই কম হয়েছিল, কাজেই

অন্ধ গণশক্তি নিয়ে খেলা আরম্ভ হল বলা যায়। ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভিতর প্রাণ-শক্তির অভাব ছিলনা। জীবনে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলেই তাদের ভিতর লক্ষ্যশূন্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্ব্বে এই সকল বিদ্রোহের সঙ্গে শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন যোগ ছিলনা। নবযুগে জাতীয়তার তরঙ্গ উপস্থিত হওয়ায়, জনসাধারণের ভিতর উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দিয়ে, ঐ প্রাণশক্তিকে সুপরিচালিত করার ও সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব দেখা দিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৭০ খৃঃ 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা ও অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে জন-শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। সে পথে শিক্ষিত দেশবাসী তাঁর পরে আর বিশেষ অগ্রসর হননি। এখন এই রাজনৈতিক চরমপন্থীবাদের উত্তেজনা জনগণকে উত্তেজিত করে তুললো—কিন্তু তাদের বুদ্ধি বিবেচনার অভাবে অভাবনীয় ব্যাপার সব ঘটতে লাগলো। ক্রমে সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ হল। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতি এই নূতন মতবাদের জন্মদাতা ও নেতা। আয়রলণ্ড ও ইটালীর আন্দোলন তাঁদের আদর্শ ছিল। বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা, যুগান্তর, মারাঠা প্রভৃতি পত্রিকা এই মতবাদের প্রচার করতে লাগলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠন করে অর্থ সংগ্রহ করা আরম্ভ হল, অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠনের ব্যবস্থা হল। সন্ত্রাসবাদীরা জাতীয় মহাসভার বাহিরে রইলেন। ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়লো—ভারতের বাইরেও তাঁদের যোগাযোগ হল এবং অস্ত্র-শস্ত্র-গুলি-বন্দুক সরবরাহের ব্যবস্থা হল। ১৯৪৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সন্ত্রাসবাদী দেশসেবকেরা স্থানে স্থানে দলে দলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে, অত্যাচারী শাসকদের ভীতি উৎপাদন করতে লাগলেন। মুখে 'বন্দেমাতরম্' ও বুকে 'গীতা' ধারণ করে সহাস্য বদনে তাঁরা ফাঁসির কাঠে প্রাণ দিতে লাগলেন। 'সতীন সেন স্মৃতি সমিতির' উদ্যোগে ১৯৫৮ খৃঃ রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় 'মহাজাতি সদনে' এই সব বীরবৃন্দের তৈলচিত্র স্থাপন করে সেই আত্মদানের ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু মহাশয় একদিকে জাতীয় মহাসভার এবং অন্যদিকে এই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গত মহাযুদ্ধের ভিতর প্রহেলিকার মতন Indian National Army গঠন করে আরেক ইতিহাসের সৃষ্টি করে গেছেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন থেমে গেল, চরমপন্থীদের গঠনশীল কর্ম্মপন্থা না থাকায়, অধিকাংশের সমর্থনে নরমপন্থীরা জাতীয় মহাসভার নেতৃত্বভার ফিরে পেলেন। বৈধ উপায়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চল্‌লো। টাটারা স্বদেশী কারখানায় দেশী জিনিষ তৈয়ারী আরম্ভ করেছিলেন। বাংলা দেশে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় 'বেঙ্গল কেমিকাল' ও 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' বড় হয়ে উঠলো। শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেন, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও টাটারা বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন—উপযুক্ত কর্ম্মীরা বিদেশে শিল্পবিদ্যা শিক্ষার জন্য যেতে লাগলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রশস্ত হয়ে উঠলো। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সমাজ-সেবার পথ দেখালেন। এদিকে ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা অল্প সময়ের ভিতর বিদ্রোহ দমন করে ফেল্‌লেন। লালা লাজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংকে দেশান্তরীন করা হল; অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির দেশান্তরীন দণ্ড হল; তিলক ও বিপিনচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন; উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করলেন; অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নিলেন; বারীন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতিকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হল। শাসনকর্ত্তারাও নিজেদের শাসন-পদ্ধতির ভিতরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করলেন। ১৯১১ খৃঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ নিজে ভারতে এসে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে গেলেন। লর্ড হার্ডিং ভারতবাসীদের উপর বিশ্বাস ও নির্ভরের নীতি প্রবর্ত্তন করলেন এবং জাতীয় মহাসভার লক্ষ্য—সাম্রাজ্যের ভিতর

স্বরাজ্য স্থাপন—সমর্থন করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য উপনিবেশে ভারতবাসীদের উপর যে অত্যাচার ও অবিচার হ'ত তার প্রতিকারের জন্য তিনি তৎপর হলেন। ঐ সময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীদের প ক নিয়ে মহাত্মা টলষ্টয়ের প্রদর্শিত 'সত্যাগ্রহের' পথ ধরে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। লর্ড হার্ডিং তাঁকে সমর্থন করলেন এবং ১৯১৪ খৃঃ সাময়িকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গান্ধীজী ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এই সব কারণে নরমপন্থীদের (moderates) উপর দেশবাসীর আস্থা ফিরে এল। ঐ সময় প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ হয়েছে (১৯১৪-১৮ খৃঃ)। যুদ্ধে ভারতবাসীরা ইংরাজদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগীতা করলেন। মেসোপটেমিয়ায় প্রথম বাঙ্গালী পল্টন পাঠানো হল। যুদ্ধে সহায়তা করায় গান্ধীজীর অমত ছিল; কিন্তু যুদ্ধে আহত বা নিহতদের সেবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, এম্বুলেন্স সেবাদল গঠন করে পাঠালেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীরা এই সুযোগে জনগনের চিত্তকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। জার্ম্মানীর কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার চেষ্টা হল। বাবা গুরুদিৎ সিং, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি গুপ্তদল গঠনে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় আমরা তরুণ—ভাগলপুরে জেলা স্কুলে পড়ি—এই গুপ্তদল-গঠনের ডাক আমাদের কাছেও এসে পৌঁছেছিলো। সর্ব্বত্যাগী, সুদর্শন, বিপ্লবীদের সঙ্গ ও স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি তখন আমাদের কাছে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার শ্রেষ্ঠ উপাদান হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত এ চেষ্টা স্থানীয় সন্ত্রাস-প্রচেষ্টায় পর্য্যবাসত হল। চারিদিকে বিপ্লবীদের অন্তরীন করা হল। তার ভিতর আমার বন্ধু অনাথ বসু, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন। আপাততঃ এই সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজনের সব শেষ হয়ে গেল। ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ যে স্বতন্ত্র এই কথাই প্রমাণিত হল।

যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা শাসন-সংস্কারের আশা দিতেন, কিন্তু যুদ্ধের পর তাঁরা যা ঘোষণা করলেন তা গ্রহণ করতে জাতীয়

মহাসভা আপত্তি জানালেন। স্বাধীনতা আন্দোলন আবার প্রবল আকার ধারণ করলো। ঐ সময় দেশবাসী দুটী পথের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম, সশস্ত্র বিদ্রোহ; দ্বিতীয়, অহিংস সত্যাগ্রহ। এই সময় থেকে মহাত্মা গান্ধীর যুগের আরম্ভ।

গান্ধীজীর মহৎ জীবন-কাহিনী সকলেরই জানা। এই প্রসঙ্গে তারই একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করলাম। গান্ধীজীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর পিতার নাম করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী এবং মাতার নাম পুতলীবাই। পোরবন্দরে ১৮৬৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়। তাঁরা দুই ভাই। তিনি কনিষ্ঠ। গান্ধীরা জাততে বেনে। তাঁরা আগে মুদির ব্যবসা করতেন। গান্ধীজীর প্রপিতামহ দেওয়ানের কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে পর-পর তিন পুরুষ ঐ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর পিতামহ উত্তম-চাঁদ গান্ধী প্রথমে পোরবন্দরের এবং পরে জুনাগড়ের দেওয়ান হয়েছিলেন। গান্ধীজীর পিতা প্রথমে পোরবন্দরের এবং পরে রাজকোটের দেওয়ান হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও তীক্ষ্নবুদ্ধি ছিলেন। সেই ধারা গান্ধীজীর জীবনেও দেখা গিয়েছিল। গান্ধীজীর পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন। সকল ধর্ম্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। গান্ধীজীর মাতৃদেবী ভক্তিমতী সাধ্বী নারী ছিলেন। তিনি নিত্য কঠোর ব্রত-নিয়ম পালন করতেন। গান্ধীজীর উপর এঁদের দুজনের চরিত্রের প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষ করা যেত। বাল্যকালে তিনি রামায়ণের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, শ্রবণের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প শুনে শুনে সত্যের জন্য পণ করা, পিতামাতাকে ভক্তি করা, অন্যের উপকারের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করার ভাব নিজ জীবনে লাভ করেছিলেন। সত্যের জন্য পণ করায় অর্থাৎ 'সত্যাগ্রহীর আদর্শ পালনে' বয়সের, শারীরিক বলের, অস্ত্রশস্ত্র বা সৈন্যসামন্তের কোন

প্রয়োজন হয় না—কেবল সত্যকে আশ্রয় করলেই সত্যাগ্রহী হওয়া যায়, এই কথাগুলি বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। তাই পরবর্ত্তী সময়ে এই 'সত্যাগ্রহ' দিয়ে তিনি অনায়াসে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন। বাল্যের আরেকটি শিক্ষা তাঁকে চিরদিন বিপদে আপদে রক্ষা করেছে। তাঁর দাসী রম্ভার কাছে তিনি শিখেছিলেন যে, কোন রকম ভয় পেলেই 'রামনাম' উচ্চারণ করতে হয়; তাহলে আর কোন বিপদ আসতে পারেনা। এই রামনামই পরে তাঁর 'রামধুনের' আকার নিয়েছিল ও জনসাধারণকে অভয়-সাধন ও হিন্দু-মুসলমানকে মিলন-সাধন শিক্ষা দিয়েছিল।

গান্ধীজী ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনায় ভালই ছিলেন। সত্য-বাদীতা তাঁর ভিতর অত্যন্ত প্রবল ছিল। তার ফলে তিনি দুষ্টবুদ্ধি বন্ধুদের প্রভাবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটী গুণ ছিল—সেটী হল অধ্যবসায়। তিনি অনেক বিষয়ে অধ্যবসায়ের বলে উন্নতি করেছিলেন। বিশেষ করে ভাষা-জ্ঞানে তাঁর অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। নিজের দুর্ব্বল শরীরকেও তিনি অধ্যবসায়ের সাহায্যে সবল কর্ম্মঠ করে তুলেছিলেন। ব্যায়ামের অসুবিধা হ'ত বলে তিনি সারাজীবন নিয়মিত দীর্ঘ পথ দ্রুত ভ্রমণ করতেন।

তের বছর বয়সে গান্ধীজীর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী কস্তুরীবাই ও তিনি সমবয়স্ক ছিলেন। পত্নী লেখাপড়া একেবারে জানতেন না। গান্ধীজীই তাঁকে লেখাপড়া শেখান। কস্তুরীবাইর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল স্বামীর সেবা করা। তিনি অল্পভাষী ও সদা-প্রসন্ন মহীয়সী নারী ছিলেন। গান্ধীজীর কঠোর কর্ম্মময় জীবনের পথে যে তিনি কি করে তাল রেখে চলেছিলেন, এমনকি কারাবরণও করেছিলেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। তাঁদের চার পুত্র—হীরালাল, মণিলাল, দেবদাস ও রামদাস। হীরালাল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন। অন্য তিনপুত্র পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। মণিলাল দক্ষিণ আফ্রিকায়

শিক্ষার কার্য্যধারা অনুসরণ করে গেছেন। মেথরাস মহাত্মাজীর কাছে কাছে থেকে তাঁকে বহু বিষয়ে সাহায্য করতেন। তিনি শ্রীরাজাগোপালচারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এঁরা কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হননি। গান্ধীজীই এঁদের শিক্ষক ছিলেন।

১৮৮৭ খৃঃ গান্ধীজী এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। কলেজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮৮ খৃঃ ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য তিনি বিলাতে যান এবং ১৮৯১ খৃঃ ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরেন। দেশে অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা না হওয়ায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যবসায়ীর মামলা তদ্বির করার কাজ নিয়ে ১৮৯৩ খৃঃ সে দেশে যান। এই ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের এক নূতন দিক খুলে গেল। মামলা তদ্বিরের কাজ শেষ হয়ে গেলেও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে সেই নূতন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য রয়ে গেলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অন্যান্য উপনিবেশে যে সব ভারতবাসী উপার্জ্জনের জন্য গিয়ে বসবাস করতেন তাঁদের উপর সেখানকার ইংরাজেরা অত্যন্ত অপমানকর ব্যবহার করতেন— সকলকেই তাঁরা কুলি বলতেন এবং রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্রই তাঁদের উপর ঘৃণার ভাবে নানা অন্যায় উৎপীড়ন চালাতেন। গান্ধীজীও তার থেকে অব্যাহতি পাননি। তিনি হাইকোর্টে কোট প্যাণ্ট পরে যেতেন, এখন মাথায় হ্যাট ছেড়ে পাগড়ী পরতে লাগলেন। পাগড়ী ভারতীয় বেশ, এই অপরাধে জজ এক দিন তাঁকে বিচারালয় থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। আরেকবার তিনি ট্রেনে করে ডার্বান থেকে প্রিটোরিয়ায় প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাচ্ছেন, এমন সময় মধ্যপথে এক ইংরাজ এসে সেই কামরায় উঠে এবং তাঁকে নেমে যেতে বলে। তাতে তিনি অসম্মত হওয়ায় পুলিশ ডেকে বল প্রয়োগ করে তাঁকে নাবিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার বলে এক দল লোক বাস করতো। তারা হল্যাণ্ড

দেশের ডাচ্‌দের বংশধর—দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল। তখনো ইংরাজ-বোয়ার যুদ্ধ বাধেনি। তারা ছিল প্রিটোরিয়ার কর্তা। তাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ক্রুগার। তাঁর প্রাসাদের সামনে একটি মস্ত বড় রাস্তা ছিল। গান্ধীজী রোজ সেই রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে যেতেন। একদিন এক সান্ত্রী তাঁকে ঐ সময়ে ফুটপাথে হাঁটার অপরাধে কালা আদ্‌মি বলে ধাক্কা দিয়ে লাথি মেরে ফুটপাথ থেকে নাবিয়ে দেয়। সেই সময় তাঁর এক বন্ধু এসে পড়েন ও তাঁকে বাঁচান। ঐ বন্ধু তাঁকে সান্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বলেন। গান্ধীজী তা না করে, সান্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে বলেন। বন্ধু তাই করলেন। তখন সান্ত্রী গান্ধীজীর কাছে ক্ষমা চেয়ে অপরাধ স্বীকার করে নিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলিদের 'agreement' করে নিয়ে যাওয়া হত বলে তাদের 'গিরমিটিয়া' বলা হত। এদের উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হত। তিনি মালিকদের সঙ্গে দেখা করে এদের প্রতি যাতে ভাল ব্যবহার করা হয় তার জন্য নানারকম চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐজন্য তিনি ১৮৯৯ খৃঃ নেটালে জাতীয় মহাসভার শাখা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানকার ভারতবাসীরা এই মহৎ কাজে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। কুলিদের অভিযোগ বুঝবার জন্যে তাঁকে অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছিল—তামিল, তেলেগু, হিন্দি, উর্দ্দু। তার আগেই তিনি গুজরাটি, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। এই সব কাজ ও ব্যারিষ্টারী করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'Indian Opinion' নামে একটী সংবাদপত্র প্রকাশ করে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর হাতে Ruskin এর 'Unto the Last' বইটী এসে পড়ে। রস্কিনের সাম্যবাদ, বা কাউকে হিংসা বা ঘৃণা না করে সকলের সঙ্গে সমান হয়ে থাকার আদর্শ, তাঁর সম্মুখে জীবনের এক নূতন পথ খুলে দিল এবং তিনি মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের এক নূতন উপায় খুঁজে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডার্বানের কাছে

নেটালে ১৯০৪ খৃঃ 'ফিনিক্স সেটেলমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করলেন; সেখানে সকল রকম পেশার লোক—ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচি, চাষা, তাঁতী, শিক্ষক, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার থাকবে—সবাই সমাজের সেবক—নিজের নিজের হাতের কাজ করবে। এই সেটেলমেণ্ট থেকে তাঁর পত্রিকাটি নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো। ক্রমে দেখা যায় আরেকটী আদর্শ তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হল। টলষ্টয়ের 'The Kingdom of God is within you' বইটিতে তিনি ঐ আদর্শ পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সংঘর্ষ যখন তীব্র হয়ে উঠলো তখন তিনি ঐ Passive Resistance বা অহিংস সত্যাগ্রহের পথ ধরলেন। ঐ উদ্দেশ্যে ১৯১০ খৃঃ জোহান্সবার্গে ট্রান্সভালে সত্যাগ্রহীদের একত্র থাকার জন্য 'টলষ্টয় ফার্মের' সৃষ্টি করলেন। ঐ ফার্মেও সকলকে নিজের নিজের কাজ করতে হত। 'History repeats itself' কথাটি অত্যন্ত সত্য। গান্ধীজীর এই দুটী প্রতিষ্ঠানের ভিতর ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতাশ্রমের' অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ভিতর এই সঙ্ঘবদ্ধ ভাব ও তেজস্বীতা দেখে, তাদের জব্দ করার জন্য ইংরাজেরা এক নূতন আইন করলেন। ঐ আইন অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজের নাম রেজিষ্টারী করতে হবে এবং আসামীদের মত দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে ঐ নামের সঙ্গে রাখতে হবে। সকলেই এই আইন স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। গান্ধীজী এই আন্দোলনের নেতা হলেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল। গভর্ণমেণ্ট তাঁদের অনেক ভয় দেখালেন—অত্যাচার উৎপীড়ন চল্‌লো—কিন্তু তাঁরা অটল রইলেন। যখন জেনারেল স্মাটস্ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আপোষের কথা তুল্লেন, গান্ধীজী সম্মানকর আপোষে মত দিলেন। গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত সে চুক্তি মানলেন না। তখন গান্ধীজী আবার ঐ অন্যায় আইন অমান্য করার উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। রেজিষ্টারী সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলে, বিনা পরোয়ানায় ট্রান্সভালে ঢোকা আরম্ভ হল। দলে দলে ভারতবাসী তাতে যোগ দিলেন—মুটে

মজুর ব্যবসায়ী চাষী ব্যারিষ্টার ধনী নির্ধন সবাই। মেয়েরাও আন্দোলনে যোগ দিলেন—তাঁদের উপরও অন্যায় অপমান করা হয়েছিল। সত্যাগ্রহীরা নির্বিকার চিত্তে মার খেলেন, অত্যাচার সহ্য করলেন, এমনকি কেহ কেহ গুলিতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিলেন। তাঁদের ভিতর অনেকে খুবই গরীব—জীর্ণ বস্ত্র, শীর্ণ দেহ, আহার নিদ্রা নাই—কিন্তু গান্ধীজী যে অহিংস নৈতিক আদর্শ তাঁদের মনে ঢেলে দিয়েছিলেন সেই আদর্শের তেজ তাঁদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। তাঁরা অজেয় সাহসে সত্যাগ্রহের পথে এগিয়ে চলেছিলেন। সত্যের জয় হবেই হবে—'সত্যমেব জয়তে'। ১৯১০ খৃঃ সত্যাগ্রহের জয় হল—অন্যায় আইন রদ করা হল। ভারতবাসীরা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পেলেন। গান্ধীজী ইংলণ্ড হয়ে ভারতবর্ষে ফিরলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নাম এর মধ্যে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ রেখে চলতেন। নেটাল জাতীয় মহাসভার কাজকর্ম্ম ছিল তার একটী প্রধান কারণ। মহামতি গোখেলের সঙ্গে গান্ধীজীর হৃদয়ের যোগ ছিল। 'New India' জাতীয়তাবাদী পত্রিকাটীর সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। সে সময়ে বিপিনচন্দ্র ঐ পত্রিকাটীর সম্পাদক ছিলেন। গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে এলে মহামতি গোখেল তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সকল ব্যাপারের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ পরিচয় না করে যেন তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ না করেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন গুরুকুলে ও তারপর কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটালেন। এই দুই আশ্রমের আদর্শের ও কর্ম্মপন্থার ভিতরে থাকলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়না দেখে, তিনি নিজেই একটী আশ্রম গঠনের পরিকল্পনা করলেন এবং আমেদাবাদে সাবরমতী নদীর ধারে, সহর থেকে দূরে 'সত্যাগ্রহাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজে সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীদের নিয়ে তার কাজ আরম্ভ করলেন। আশ্রমবাসীদের প্রতিজ্ঞা করতে হত যে তাঁরা অভয়,

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ পালন করবেন; যথা সম্ভব স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করবেন; নিয়মিত চরকা কাটবেন, খদ্দর পরবেন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করবেন। গান্ধীজী নিজে সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেন। কোন বিরক্তির কারণ হলে তিনি উপবাস করতেন। ক্রমে অন্যান্য প্রদেশ, এমনকি বিদেশ থেকেও লোকেরা গান্ধীজীর আদর্শের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য, সত্যাগ্রহাশ্রমে আসতে ও থাকতে লাগলেন। আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিবারের ভাবে চল্‌লো। গান্ধীজীকে সবাই 'বাপুজী' বলে ডাকতে লাগলেন—তিনি সকল আশ্রমবাসীর পিতার স্থান স্বীকার করলেন। আশ্রমে নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা হত। ভোর চারটার সময় সকলে একসঙ্গে প্রার্থনায় বসতেন। প্রথমে ভজনগান, গীতাপাঠ ইত্যাদি হত। এগুলি পরে 'আশ্রম ভজনাবলী' বইটীতে ছাপা হয়েছিল। তারপর গান্ধীজী উপদেশ দিতেন। প্রার্থনা হয়ে গেলে যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে চলে যেতেন। গান্ধীজী তখন প্রাতর্ভ্রমণে বেরুতেন। ঐ সময়ে কোন কোন বাড়ী গিয়ে সকলের কুশল সংবাদ নিতেন। ফিরে এসে গান্ধীজী নিয়মিত ২২০ গজ সূতা কাটতেন। আশ্রমের সকল কাজ—রান্না থেকে মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত—নিজেদের হাতে করতে হত। আশ্রমে জাতিভেদ ছিলনা। খাওয়া অত্যন্ত সাদাসিধা—মাছ মাংস মদ তো নয়ই—রান্নায় মসলার ব্যবহারও বারণ ছিল। খাওয়ার আগে প্রার্থনা করা নিয়ম ছিল। পরিচ্ছন্নতা আশ্রমের একটা বৈশিষ্ট ছিল। কোনো দিকে একটুও ময়লা দেখা যেতনা। আশ্রমের পাইখানার ব্যবস্থা নূতন ধরণের ছিল। চাটাই দিয়ে ঘেরা ছোটো ছোটো বিভিন্ন অল্প গভীর গর্ত্ত করা থাকতো। তার পাশে খানিকটা মাটী রাখা থাকতো। পাইখানা করে ঐ মাটী চাপা দেওয়া হত। তাতে মাছি বা গন্ধ হতনা এবং জমির সার হত। একটা গর্ত্ত ভরে গেলে চাটাইটাকে একটু সরিয়ে আরেকটা ঐ রকম গর্ত্ত করা হত। আশ্রমের সঙ্গে বিদ্যালয়, তাঁত,

চারড়ার কারখানা, গোশালা, তুলার চাষ প্রভৃতি ছিল। আমার একবার ঐ আশ্রমে গিয়ে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। তখন আশ্রমটার খুব বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা—ইটের বাড়ী, পাকা রাস্তা, অনেক অধিবাসী, তার মধ্যে জেলখাটা কয়েদীদেরও অন্ত্যজদের সংশোধন করে আশ্রমবাসী করে নেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী সকলের সঙ্গেই মিশতেন, খাবার সময় নিজে পরিবেশন করতেন, ছোট ছেলে মেয়ে দেখলে তাদের নিয়ে খেলতেন। তাঁর প্রাণখোলা হাসি অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করতো। ওখানে যে সব সুন্দর খদ্দরের কাপড় ও আসন তৈরী হত তার কয়েকটা আমি কিনে এনেছিলাম। আজ ত্রিশ বছর পরেও সেগুলি সুন্দর আছে। পরে কোন কারণে গান্ধীজী আশ্রমটা নিজেই তুলে দেন। হরিজন আন্দোলনের সময় ওয়ার্ধার কাছে সেবাগ্রামে' এক হরিজন পল্লীতে নূতন আশ্রম গঠন করেছিলেন। এখানে তিনি কোন কড়াকড়ি নিয়ম করেননি, নিজের নিজের সুবুদ্ধির উপর সকলকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখানে কুটীর ও কাঁচা রাস্তার ব্যবস্থা ছিল যাতে গ্রামবাসীরা তার আদর্শে গ্রামের উন্নতি করতে পারে। এক এক কুটীরে জন কয়েক বা এক একটী পরিবারের লোকেরা থাকতেন। এখানেও সকাল ও সন্ধ্যায় সকলে মিলে একসঙ্গে প্রার্থনা করতেন। খাওয়ার সময় সকলে একসঙ্গে বসতেন। কোন জাতিভেদ ছিলনা। 'সেবাগ্রাম' দেখতে দেখতে জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠলো। দেশের গণ্যমান্য লোকেরা এবং বিদেশের বহু মনীষি ও অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য 'সেবাগ্রামে' আসতে আরম্ভ করলেন। 'সাবরমতী সত্যাগ্রহাশ্রম' ও 'ওয়ার্ধা সেবাগ্রামের' কথা মনে করলেই আচার্য্য কেশবচন্দ্রের 'ভারতাশ্রম' ও 'মঙ্গলবাড়ীর' পার্থক্যের কথা মনে হয়। ব্রহ্মানন্দ ও মহাত্মাজী—দুজনকেই একই রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জাতির উন্নতির জন্যে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কি আশ্চর্য্য!

'সত্যাগ্রহাশ্রমের' আদর্শ সুস্পষ্ট করার জন্য গান্ধীজী 'ব্রহ্মচর্য্য', 'নীতিধর্ম্ম', 'স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রভৃতি কয়েকটী বই প্রকাশ করেছিলেন। দেশের কল্যাণ-কর্ম্মে কি রকম মানুষদের প্রয়োজন সেই কথাই বইগুলিতে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দেখতে দেখতে ১৯১৭ খৃঃ তিনি চম্পারণে ও ১৯১৮ খৃঃ খেড়ায় সত্যাগ্রহ করলেন। দেশের আদর্শবাদী, নীতিবান মানুষেরা উৎফুল্ল হয়ে তাঁর কাজের সমর্থন করলেন। সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠলো। আমাদের পূজ্যপাদ সপ্ততিপর বৃদ্ধ পিতামহের কাছে আমরা তখন ঐ সকল সংবাদ শুনতাম। আজও সেই স্মৃতি স্বপ্নের মত মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। ঐ সময়ে তরুণদের সম্মুখে একদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের উত্তেজনা—অন্যদিকে অহিংস সত্যাগ্রহের তপস্যার মন্ত্র এক বিচিত্র দ্বন্দের সৃষ্টি করলো।

সাম্রাজ্যবাদী ভারত সরকার দুটীরই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। স্বাধীনতার পথ রোধ করার জন্য ১৯১৯ খৃঃ রওলট আইন নামে নূতন আইন প্রণয়ন করলেন। তার বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠলো। ঐ সময় অমৃতসরে জালিয়ানবালাবাগ নামে এক বাগানে প্রায় ২০০০ শিখ কোন পর্ব্ব উপলক্ষে একত্রিত হয়েছিলেন। ছোটোলাট ওডায়ার এবং জেনেরেল ডায়ার পরামর্শ করে ঐ নির্দ্দোষ মানুষগুলিকে বিদ্রোহী বলে সন্দেহ করে মেশিনগান দিয়ে গুলি করতে আরম্ভ করলেন—প্রায় ১৬০০ লোক নিহত হল। অমৃতসরে 'মার্সাল ল' .মোতায়েন হল। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হল। অমৃতসরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন ডাকা হল। সারা দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন আবার প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। মানুষ হিংসা ও অহিংসার পার্থক্য ভুলে যেন দিশাহারা হয়ে উঠলো। তখন নবীন তপস্বী গান্ধীজী মনে মনে নূতন উপায় খুঁজতে লাগলেন—দক্ষিণ আফ্রিকার মতন ভারতবর্ষেও সত্যাগ্রহ দিয়ে, গুলির সম্মুখীন হয়ে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় কি উপায়ে? ভারতবাসী কি তাঁর কথায়

বিশ্বাস করবে? ১৯২০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার আটদিনব্যাপী এক বিশেষ অধিবেশন হল। ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়—তিনি বহুদিন আমেরিকায় দেশান্তরীন থেকে তখন সবে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত ভাষণ পাঠ করলেন—তারপর গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলনের' প্রস্তাব বিষয়ে সকলের মতামত নেওয়া হল। বিপিনচন্দ্র তার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব আনলেন। শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। সভার শেষ দিনে লালাজী একটী উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণে গান্ধীজীর প্রস্তাবের ভাল ও মন্দ দিক আলোচনা করে সকলকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে অগ্রসর হতে উপদেশ দিলেন। জাতীয় মহাসভার ভিতর দলাদলির ভাব দেখে তিনি কয়েকটী কথা বিশেষ ভাবে বলেছিলেন, যা আমাদের আজ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ও কাজকর্ম্মে স্মরণ রাখা উচিত—

"He said that from the depth of his heart and he wished to give them a warning, namely, that they were on the brink of a volcano, if they continued in that way and they would reduce the Congress to the status of a purely petty party organisation. This was a great national organisation, brought up and founded by some of the greatest men in the public life of this country. He appealed to them with all the earnestness he could that they should not reduce the national character of this organisation. By all means let its affairs be managed by the party who happened to be in the majority, but let the minority have a fair say and a fair opportunity of putting their case before them. If they continued to hoot the other side down, it would be impossible for this organisation to continue as a national organisation. He appealed to them not to reduce the character of the national assembly into an assembly partisan in character and purely a party organisation"

১৯২১ খৃঃ নাগপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হল।

ঐ বৎসর গান্ধীজীর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল ও তাঁর উপর সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্বভার অর্পিত হল।

১৯১৭ খৃঃ আমি ভাগলপুর থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে I. Sc. ক্লাশে ভর্ত্তি হই। পার্কে পার্কে এবং বিভিন্ন হলে যে সব বক্তৃতা হত শুনে শুনে রাজনীতির প্রভাব বিষয়ে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম। গান্ধীজীর নৈতিক আন্দোলনের শক্তি প্রাণের ভিতর নানা প্রশ্ন ও গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করলো। মিসেস এনি বেশান্তের সভাপতিত্বে ঐ বৎসরেই কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হল। তাতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজের ভার নিলাম। মিসেস বেশান্ত, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, জিতেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, শ্যামসুন্দর, শাসমল, তিলক, মালব্য, মতিলাল, বিজয়রাঘবচারী, দীপনারায়ণ সিংহ ও মিসেস নাইডুকে দর্শন করে ও তাঁদের বক্তৃতা শুনে জীবনকে ধন্য করলাম। কলিকাতায় আবার ১৯২০ খৃঃ বিশেষ অধিবেশন হল। আবার স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজের ভার নিলাম। এবার আরও নূতন নূতন নেতাদের দেখার ও তাঁদের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হল। গান্ধীজী, লালা লাজপত রায়, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি, হাকিম আজমল খাঁ, আবুল কালাম আজাদ, জিন্না প্রভৃতি। জাতীয় মহাসভার আরম্ভের ছবি এবং এই ছবির কত পার্থক্য! ১৯২০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ অধিবেশনে লালা লাজপত রায় তাঁর শেষ বক্তৃতায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করেন তার এক অংশ এখানে তুলে দিলাম—

"He would like to tell them how he had rejoiced all these days in finding that this country had after all found its soul. It had rejoiced his heart to see this country and this national assembly had after all a clear political vision now. They had acquired a clear political vision and they had a clear conception of the means by which they could accomplish the end which they desired. He rejoiced to find that this assembly had after all found that the country's salvation must come from the country itself".

অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম--অসহযোগ আন্দোলন—আরম্ভ হল। দেশবন্ধুর আহ্বানে ১৯২১ খৃঃ আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়ে এলাম এবং ঐ আন্দোলনে যোগ দিলাম। ঐ সূত্রে আমার দুবার কারাদণ্ড হল। আমি খদ্দর প্রচার ও অশিক্ষিতদের ভিতর শিক্ষা প্রচারের কাজ নিয়েছিলাম। পাড়ায় পাড়ায় খদ্দর ও চরকা কেন্দ্র খুলতে লাগলাম। আমার ছোট ভাই বোনেরা যোগ দিলেন। ক্রমে দ বাড়তে লাগলো। গণসংযোগ ও গণশক্তিকে সুপরিচালিত করার অপূর্ব্ব উপায় এই চরকা। রাজাবাজারে মুসলমান বস্তির লোকেদের ভিতর শিক্ষা দানের জন্য Salvation Army একটি কুঁড়ে ঘরে স্কুল খুলেছিলেন—সেটীর ভার নিলাম। তিন নম্বর 'নববিধান প্রচারাশ্রমে' ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন মহাশয় গান্ধীজীর জন্মদিন করবেন বলে নিমন্ত্রণ পাঠালেন, উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম। তিনি গান্ধীজীকে নবযুগের নূতন মানুষ বলে বর্ণনা করলেন,—বুথ, গর্ডন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর তুলনা করলেন। সেদিনকার বক্তৃতা লিখে রাখার ভার আমার উপর ছিল। বক্তৃতা লিখে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিলাম। ব্রাহ্মসমাজে তখন একটা 'মৃত-রাজভক্তির' ভাব ঢুকেছিল—ঐ লেখাটী মনে হয় সেই জন্য ছাপা হতে বাধা হল। কিন্তু গান্ধীজীর শিক্ষা ও আন্দোলন ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা ও আন্দোলনের এত অনুরূপ যে, অগ্রণী ব্রাহ্মরাও ক্রমে ঐ আন্দোলনকে সমর্থন করতে লাগলেন। অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু মহাশয়ের মত একজন মানুষ চাকরী ছেড়ে সর্ব্বান্তঃকরণে আন্দোলনে যোগ দিয়ে গান্ধীজীর আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুললেন। মনোযোগ দিলে দেখা যায় আন্দোলন দুটীই বৌদ্ধভাবে পূর্ণ—প্রথম নীতি; দ্বিতীয় অহিংসা; তৃতীয় শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম্মের ভেদাভেদ শূন্যতা; চতুর্থ আত্মদানের ভাব। ঐ সকল ভাবের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা ও আদেশের কথা যখন গান্ধিজীর মুখে শোনা যেতে লাগলো, তখন ব্রাহ্মরা আরো এগিয়ে এলেন। কিন্তু যেখানে ইংরাজদের সঙ্গে বিরোধ সেখানে তাঁরা রাজভক্তির অভাব

মনে করে পেছিয়ে যেতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় কেউ কেউ ব্রহ্মানন্দের বাণী নূতন করে অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন এবং যখন দেখলেন যে তিনি পাপীকে ঘৃণা করেননি কিন্তু পাপকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিরোধ করেছেন—তখন গান্ধীজীর আন্দোলনের মাহাত্ম্য তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নীলকর আন্দোলন, মুক্তিফৌজ আন্দোলন, আবগারি আন্দোলন, শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন. সৈনিকদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিবাহ-বিধি আন্দোলন, উচ্চকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে আন্দোলন প্রভৃতিতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কিভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন ও কি বলেছিলেন, তার অনুসন্ধান করে নূতন করে তাঁর রাজভক্তি ও স্বাধীনতার আদর্শ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর কিছু কিছু চর্চ্চা আরম্ভ হল।

গান্ধীজীর আন্দোলনের কথা ভাগবত সমান। প্রথম দিকের কথা স্মরণ করলেই তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের আন্দোলনের ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পদ্ধতি ছিল নিত্য নূতন। ১৯২১ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতর্পণের দিন, গান্ধীজীর নির্দ্দেশে সমস্ত ভারতব্যাপী হরতাল হল, উপবাস হল, সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হল। ১৯২২ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ তিনি গ্রেপ্তার হলেন। জেলে যাবার আগে ভগবানের নাম হল, ভজন হল এবং সকলে বাপুজীকে প্রণাম করলেন। পুলিশের গাড়ী এসে সাবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে তাঁকে জেলে নিয়ে গেল। কয়েক দিন পরে বিচার হল। তিনি যখন বন্দীরূপে বিচারগৃহে ঢুকলেন—সকলে, এমন কি জজও, আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখালেন। বিচারে তিনি সব দোষ স্বীকার করে নিলেন—আইন মত তাঁর ছয় বৎসর কারাদণ্ড হল। কিছুদিন সাবরমতী জেলে ও পরে যেরবাড়া জেলে তাঁকে রাখা হয়েছিল। ১৯২৪ খৃঃ তিনি বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষে যেমন অনেক ছিলেন, বিপক্ষেও তেমনি বহু লোক ছিলেন। এই আন্দোলনে কি

কতখানি লাভ হতে পারে সে বিষয়ে তখন কারো স্পষ্ট ধারণা ছিলনা। গান্ধীজী ভগবানের আদেশ পেয়েছিলেন যে, অহিংস অসহযোগ ব্রতই (Non-cooperation with the forces of evil) লোকের দাস-মনোভাব দূর করবে, সাহসের সঞ্চার করবে এবং জড়তা ও উদাসীনতার অবসান হবে। এই নৈতিক আন্দোলনের সাহায্যে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। গঠনশীল কার্য্যপ্রণালীর প্রতিও তাঁর সমান দৃষ্টি ছিল। স্বদেশী বা কুটীর শিল্পের উন্নতি, জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও পঞ্চায়েৎ গঠনকে তিনি রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান স্বরূপ মনে করতেন। জাতীয় জীবনে যে সকল ব্যাধি প্রবেশ করেছিল তার নিরাকরণের জন্যও তিনি কম ব্যস্ত ছিলেন না। অস্পৃশ্যতা, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও মাদকতা ব্যাধিকে তিনি জাতির পক্ষে মারাত্মক বলে মনে করতেন। খাদি আন্দোলনকে সম্মুখে রেখে তিনি এই সকল ব্যাধি দূর করার কাজ আরম্ভ করলেন। ঘরে ঘরে চরকা চল্‌লো। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে চরকায় কতটুকু সম্ভব? এই প্রশ্ন উঠলো। অসহযোগের মতন চরকাকেও পাগলামি বলে লোকে প্রতিবাদ করলেন। গান্ধীজী বল্লেন, ভগবানের আদেশ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চরকাই হবে প্রধান অস্ত্র। আবেদন নিবেদন নয়, বাগ্‌যুদ্ধ নয়, সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, হিংসার পথ নয়—জাতীয়তার প্রতীক, নির্দ্দোষ স্বাবলম্বনের পথ, সকলের সহজলভ্য চরকাই হবে তার উপায়। মনঃ-সংযমের, একাগ্রতার, একনিষ্ঠার ও পবিত্র জাতীয়-বন্ধনের উপায় হয়ে উঠলো চরকা। তখন আমাদের মনে হত যেন প্রতি গজ সূতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী স্বাধীনতার নিকটতর হচ্ছে। ঐ সময় সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন। দুজনেই গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীনে জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক গঠন ও জাতীয় সংবাদপত্র পরিচালনার ভার নিলেন। ব্যাপার দেখে সরকার বাহাদুর ১৯২৯-৩০ খৃঃ সাইমন কমিশন পাঠালেন। কমিশনের প্রস্তাবে ভারতের নেতৃবৃন্দ

রাজী হতে পারলেন না। ১৯৩০ খৃঃ গান্ধীজী আবার আইন-অমান্য আন্দোলনের আয়োজন করলেন। এবার তিনি ভগবানের আদেশে লবণ-আইন ভঙ্গ করার জন্য ৭৯ জন সঙ্গী নিয়ে সাবরমতী সত্যাগ্রহাশ্রম থেকে পদব্রজে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডীর উদ্দেশ্যে যাত্রা স্থির করলেন। সাধারণ গরীব গৃহস্থের নিজের হাতে লবণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করার অধিকার ছিলনা। সকল গরীবের ঘরে জানা এই বিষয়টীকে অবলম্বন করে, গরীবের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যবস্থা হল। প্রত্যহ ভোররাত্রে প্রার্থনা ও ভজন করে যাত্রীদল রওনা হতেন। তাঁরা দিনে সামান্য কিছু আহার করতেন। হাতে দীর্ঘ যষ্টি ও পরিধানে সামান্য বস্ত্র। সত্যাগ্রহীদল দীনদুঃখীদের প্রতিনিধির বেশে দ্রুতপদে গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে গ্রামবাসীরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন। রাত্রে কোন গ্রামে এসে তাঁরা বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলে সেই গ্রামবাসীরা তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা ও উপদেশে যোগ দিতেন এবং ভোর হলে অনেকে যতদূর সম্ভব পথ পারতেন তাঁদের এগিয়ে দিয়ে আসতেন। হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রত্যাদেশের বাণী তড়িৎ-বেগে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়কে অধিকার করতে লাগলো। প্রতিদিন সংবাদপত্রের আশায় সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, আর সংবাদ পড়ে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে সত্যাগ্রহী দলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতেন। প্রাচীন যুগে বুদ্ধদেব এবং ঋষি মুনিরা—মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যদেব—বর্ত্তমান যুগে শ্রীকেশবচন্দ্র সদলে পদযাত্রা করেছিলেন। ঐ সকল পদযাত্রা দেশবাসীকে অশেষ অধ্যাত্মসম্পদে সম্পদশালী করেছিল। গান্ধীজী এখন 'মহাত্মা' নামে অভিহিত হলেন। তাঁর পদযাত্রাও ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে উঠলো—চল্লিশ কোটী মানুষের প্রাণকে সত্য, অহিংসা ও অভয়ের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করলো।

একমাস এইভাবে চল্‌লো। তারপর তাঁরা ডাণ্ডী পৌঁছে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ করলেন। তখন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। ঐ সংবাদ সারা ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো—মহাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে হাজার হাজার লোকে

আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ১৯৩১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে লবণ-আইন বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি হল এবং সত্যাগ্রহীদের কারামুক্তির ব্যবস্থা হল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষে বিলাতে Round Table Conference হল—ভারতের নেতারা যোগ দিলেন—গান্ধীজীও গেলেন। সরকার বাহাদুর সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করায় ঐ বৈঠক ব্যর্থ হল। এই সুযোগে বিলাতের লোকেরা 'The naked faquir কে দেখে এবং তাঁর অপূর্ব্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন।

বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি আবার আইন-অমান্য আন্দোলনের ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। ইতিমধ্যে সরকার বাহাদুর বর্ণ-হিন্দু ও অবর্ণ-হিন্দু ভিত্তিতে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করলেন। গান্ধীজী সেই সংবাদ পেয়ে জেলের ভিতরেই তার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন। ১৯৩২ খৃঃ ২০শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী উপবাস আরম্ভ করেছিলেন। কয়েক দিনের ভিতর তাঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হল। তখন নেতারা মিলে নির্ব্বাচন বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করলেন, যার ফলে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করলেন। ঐ সময় আমি কার্য্যক্রমে বোম্বাই গিয়েছিলাম। সেখান থেকে যেরবাড়া জেলে মহাত্মাজীকে প্রণাম জানিয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের রচিত কয়েকটী বই পাঠিয়েছিলাম। তিনি স্বহস্তে তার প্রাপ্তিস্বীকার করে আমায় চিঠি দিয়েছিলেন।

এইবার তাঁর 'হরিজন আন্দোলন' বা অনুন্নত ও অস্পৃশ্যদের সমাজে উপযুক্ত স্থান ও সমান অধিকার দানের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হল। দশ বৎসর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ চল্লো। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে সমাজসংস্কারের ইতিহাসের কথা এসে পড়ে। ইংরাজ যখন ভারতবর্ষকে তাঁদের শাসনাধীনে আনেন, তখন এদেশের রাষ্ট্র ব'লে কিছু ছিলনা, জাতিগঠনই ছিল দেশের প্রধান কাজ। জাতিগঠনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সমাজের নবজন্ম।

দিকে দিকে নব আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারিত হল। আধ্যাত্মিক বিকাশ, নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা ও সমাজ রচনার কাজ আরম্ভ হল। ঐ কাজের জন্য একে একে এলেন রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। স্বামী দয়ানন্দ কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে সমাজ-সংস্কারের ও শিক্ষার উদ্যোগ করেছিলেন। ১৯০৫খৃঃ পুণায় Servant of India Society প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামতি গোখেল ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছিলেন তার মেরুদণ্ড। ঐ সময়ে বংলাদেশে দরদী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় রসায়ন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা ও সমাজসংস্কারের আদর্শ ছাত্রদের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল ব্রহ্মানন্দের আদর্শ। এঁদের তিন জনের সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ যোগ ও বন্ধুত্ব ছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে মহাত্মার প্রথম দিকের মতামত ও কার্য্যাবলীকে ব্রহ্মানন্দের আদর্শের অনুরূপ বলা যায় না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এক অখণ্ড মানব-পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় মহর্ষিদেব উপবীত ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন তাতে ক্ষান্ত না হ'য়ে অব্রাহ্মণ আচার্য্য, অসবর্ণ বিবাহ, ভগবানের সন্তান বলে উচ্চ-নীচ সকলের ভিতর পারিবারিক সম্বন্ধের ব্যবস্থা ও দেশীয় বিদেশীয় সকল সাধুকে সমান সম্মান দিতে আরম্ভ করলেন, তখন রক্ষণশীল দলের চাপে মহর্ষি আবার উপবীত গ্রহণ করে পূর্ব্ব প্রচলিত ব্যবস্থাদি সমর্থন করলেন। ব্রহ্মানন্দ সম্প্রদায় ও জাতিভেদবর্জ্জিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করলেন। অনেকে এখনো বলে থাকেন যে, যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে দেশবাসীর সঙ্গে মিশতে পারেননি বা দেশবাসী যাঁদের গ্রহণ করেননি তাঁরাই ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অখণ্ড পরিবার রচনার আদর্শেই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী বর্ণভেদ স্বীকার করে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুন্নত শ্রেণীকে সকল বিষয়ে যথা, ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষার অধিকার দেবার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। চতুর ইংরাজ ভেবেছিলেন, হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে Divide and Rule

করবেন। গান্ধীজীর আন্দোলনে সেই পথটী বন্ধ হল। অনুন্নতরা অস্পৃশ্য রইল না, কিন্তু জাতিভেদ কায়েমী হয়ে রইলো। এই পথে কিন্তু সকল মানুষের ভিতর এক পারিবারিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেই পরিণতির ভার গান্ধীজী স্বভাবের নিয়মের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

জাতিগঠনের মত আন্তর্জাতিকতা গঠনেরও একটী নূতন আদর্শ নববিধানে প্রকাশিত হয়েছে। সেটীকে আজ মনযোগ সহকারে দেখা প্রয়োজন। রেনেসাঁর পরে ইয়োরোপে যুক্তি-বিচার ও বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হয়েছিল। ফলে তাঁদের ভিতর কিছু উদারতা (liberalism) দেখা দেয়, অন্ধসংস্কার দূর হয় ও মানুষের সুখ-সুবিধার (material) সৃষ্টি করে। কিন্তু ইয়োরোপের সেমিটিক জাতির ভিতর সাম্প্রদায়িকতা-দোষ (intolerance and sectarianism) অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁদের একেশ্বরবাদ অন্য ধর্ম্মের একেশ্বরবাদকেও সহ্য করতে পারেনি, heathenism বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এই প্রকৃতিগত সাম্প্রদায়িকতা-দোষ বশতই যুক্তি-বিচার ও বিজ্ঞানকেও তাঁরা অন্যদের ধ্বংস করার কাজে প্রয়োগ করে এসেছেন। সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করে, ইয়োরোপের যুক্তি-বিচার ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এসিয়ার আধ্যাত্মিক উদারতাকে মিলিত করে অগ্রসর হও— নব-বিধানের এই বার্ত্তা দিব্য কর্ণে শ্রবণ ক'রে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১৮৮৩ খৃঃ "Asia's Message to Europe" বক্তৃতা নিবেদন করেন। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের ঐ বক্তৃতায় Law of Universal Federation, Unanimity, Co-existence প্রভৃতি কথা দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়—

"Europe, I charge thee to be unsectarian".

"Sectarianism is not only carnal, it is also unscientific". "Thou art pledged to science, and therefore to unsectarian truth in all branches of knowledge, physical and spiritual. Come with thy science, and harmonize these discordant elements".

"What Asia demands is unity in variety. Great is Europe, let her flourish. Great too is Asia, let her prosper. We want not their annihilation but unification".

"It (the new science of harmony) is not the mixture of purity with impurity, of truth with falsehood, of light with darkness, but the fusion of all types of purity, truth and light in all systems of faith into one integral whole".

"The nations differ, and their antipathies unmistakable; and yet they live, move and have their being in mutual recognition, and in the subordination of their respective interests to common welfare". "Each nation has particular mission to fulfil." . . . "Among the advanced nations of the West the tendency of modern politics is not to exclude any, but to include all".

"In this marvellous formation of communities, which is going on every where, you see how unity and diversity happily *co-exist*".

"If the law of universal federation is working in other departments—in society, in politics, in commerce, in literature—it must work too in the sphere of religion".

১৯৩৯-৪২ খৃঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখা দিল। এই যুদ্ধ ক্রমে ভীষণ আকার ধারণ করলো। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে, সভ্যতার সকল নিয়ম লঙ্ঘন করে, মানুষ বর্ব্বরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিল। ভারতেও অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৯৪২ খৃঃ আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবল ভাবে আরম্ভ হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রের (Monarchy) অবসান ও সাধারণতন্ত্রের (Republic) প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। Social justice ও Co-operative method এর চিন্তা বা সোস্যালিজম্ এবং ধনী ও শ্রমিকের পার্থক্য আইন দিয়ে দূর করে সকলকে সমান করবার জেদ বা কম্যুনিজম্ দেখা দেয়। অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার চেষ্টায় মার্কিন সভাপতি Wilson প্রভৃতি League of Nations গঠন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করলে দুটী বড় ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, Militarism সভ্যজগতের অধীনে এসে পড়ে; দ্বিতীয়, পৃথিবীর উপনিবেশগুলি ধীরে ধীরে

স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে এবং উন্নত-অনুন্নত-জাতি-নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই দুই নীতি বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ-নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ গৃহীত হল। ১৯৪৫ খৃঃ United Nations Organisation বা বিশ্ব-দরবার গঠিত হল। ঐক্যমতে (Unanimity) আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করা আরম্ভ হল। কোন পরাধীন দেশ পরাধীনতায় অসন্তোষ প্রকাশ করলে, U.N.O. একমত হয়ে তাদের স্বাধীনতা দান ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে লাগলেন। কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতায় বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে, U. N. O. একমত হয়ে তাদের সংযত করতে আরম্ভ করলেন। উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজ অর্থ ও বিশেষজ্ঞের সাহায্যে অনুন্নত রাষ্ট্রের উন্নতির ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন।

এই নূতন পরিস্থিতির ভিতর মঙ্গলময় বিধাতার শুভ ব্যবস্থায় ইংরাজ-সরকার মৈত্রীর সঙ্গে ভারতবাসীর হাতে স্বাধীনতা দান করে চলে গেলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, ভারতবাসীও সকল আন্দোলন রহিত করে, অহিংসভাবে, বৃটিশ Commonwealth এর অন্তর্ভুক্ত থেকে, স্বদেশের স্বাধীনতার ভার গ্রহণ করলেন। ইংরাজ-শাসনের অধীনে থেকে স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ঈপ্সিত স্বাধীনতার নূতন দায়িত্ব বরণ করে নিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে নববিধানের জয়যাত্রা আরম্ভ হল।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র নববিধানের আলোকে জাতীয়চরিত্র গঠনের জন্য 'ভারত আশ্রম' ও 'শ্রীদরবার' গঠন করেছিলেন। ঐক্যমত (Unanimity) ও পরস্পরের আদান প্রদানে কার্য্য-পরিচালন (Co-existence) ছিল তার মূলমন্ত্র। কেশবচন্দ্র দেশবাসীকে নববিধানের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছিলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের ও পরস্পরের স্বার্থের মিলনে রচিত মহাশক্তির ও বিশ্বশান্তির পথ তার লক্ষ্য। 'সাধুসমাগম' তীর্থ-সাধনে বিস্মৃত শাক্যসিংহের আত্মত্যাগ, আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানের পুনরাবিষ্কার

জাতিকে কেবল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করেনি—অখণ্ড মানব-পরিবার রচনার ও বিশ্বমানবের কল্যান সাধনার পথও প্রদর্শন করেছে। নির্ব্বুদ্ধিতার ও স্বার্থ-পরতারবশে মানবপ্রকৃতি, বারংবার আত্মবিস্মৃত হয়ে, নীতি ও আধ্যাত্মিকতাবর্জ্জিত নগ্ন রাজনৈতিক power politics এর পথে চলে গিয়েছে। এই দুর্বলতা ও খণ্ডতা থেকে তাকে মুক্ত করে সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই হল নবযুগের সাধনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতামালার" ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম বক্তা পণ্ডিতবর শ্রদ্ধেয় ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমন্বয়-সাধনা বিশ্লেষণ করে বলেন যে, পৃথিবী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পার্থিব উন্নতির উচ্চতম সোপানে আসীন। এই আংশিক উন্নতি তাকে যুগপৎ চরমোন্নতির ও ধ্বংসের মধ্যস্থলে ফেলেছে। ঐ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে এখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির (Inward progress) দিকে মনোযোগী হতে হবে। চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে পূর্ণ উন্নতির সমন্বয়ের ভিতর মানুষকে নবজন্ম লাভ করতে হবে।

অন্তর-রাজ্যের সঙ্গে বাহিরের রাজ্যের সামঞ্জস্যের অভাবে বর্ত্তমান জগতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় নিত্য নূতন অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজগতের কল্যানের জন্য ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের তপস্যালব্ধ সত্য, নববিধানের দেব-নিঃশ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে, আজ আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। শাক্যসিংহের অষ্টাঙ্গ আর্য্যমার্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা সদ্ব্যবহার, সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে জীবিকা আহরণ, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি—বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠাকে অন্তর্জগতের উপলব্ধির সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন নীতির ও কর্ম্মপদ্ধতির সূচনা করেছে। নূতন স্বাধীনতার নূতন অধিকার ভারতে নববিধানের জয় ঘোষণা করুক—সমগ্র পৃথিবীতে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতায় শান্তি ও আনন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' গ্রন্থের
প্রথম সংস্করণ হইতে গৃহীত ফটো-চিত্র

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রথমভাগ।

অনুশীলন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন।

১২৯৫।

মূল্য ১।৷০ টাকা।

[১৪৮ (ক)]

ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম. লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্যপাত্র।

শিষ্য। আপনার এ রূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ে

কয়েকটি সাক্ষ্য

১। ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

যে মহাত্মার জন্মদিন মনে রাখিবার জন্য আজ আমরা এখানে আসিয়াছি, আমি বাল্যকালে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার মন্দিরে গিয়া তাঁহার মুখের কথা শুনিয়াছি। এই সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, এমন লোক, বোধ হয়, এখন দশ পনের জনের বেশী বাঁচিয়া নেই। কেশবচন্দ্রের জীবন আজ সত্তর বৎসর হল শেষ হইয়াছে, কিন্তু তিনি নব্যভারতের জীবনধারা যে কত মহৎ, কত সুন্দর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন আমরা কখন না ভুলি। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে যে শক্তি ঘুমাইয়া ছিল, বীজের মধ্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড গাছের প্রাণ লুকাইয়া থাকে,—কেশব তাহাকে জাগাইয়া, কাজের ক্ষেত্রে বাহির করিয়া, আমাদের এই নূতন যুগের ভারতের সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। একটি ইংরাজী কথায় বলিতে পারি যে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে dynamic force এ পরিণত করিলেন। জলপ্রপাতের মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, বিদ্যুৎ লুকাইয়া থাকে; একটা ডাইনামোর কাজ সেই শক্তিকে টানিয়া আনিয়া মানুষের হিতের নানা কাজে খাটাইবে—রেলগাড়ী, চালাইতে, কল ঘুরাইতে, আলো দিতে। মহৎ চিত্তে নিহিত কোন চিন্তাশক্তিকে এই ভাবে কার্য্যকরী রূপ না দিলে, তাহা একজনের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। আমার মনে হয় যে, কেশব যদি কর্ম্মক্ষেত্রে না নামিতেন, তবে কত কত বৎসর ধরিয়া সেই যুগের ব্রাহ্মসমাজ একটা কলেজের ফিলসফি-সেমিনারী মাত্র হইয়া কলিকাতায় একটি ধনী দলের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, আর

"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বাঙ্গালী-সমাজ" বই দুইটিতে ইহার প্রমাণ আছে। কেশব নিজে দেখিয়াছিলেন সেই প্রথম যুগের ইংরাজী শিক্ষিত কত কত যুবকের উচ্ছৃঙ্খল দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ভোগবিলাসী ব্যবহার। তিনি দেখিলেন এই বিপদ হইতে আমাদের নারীজাতিকে বাঁচাইতে হইবে। সমাজ মধ্যে নারীর প্রকৃত স্থান গৃহিণীরূপে, জীববিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে নারীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য মাতারূপে। এই চির সত্যের বিরোধী যে শিক্ষা নারীকে দেওয়া হইবে, তাহা নারীকে ব্যর্থ করিবে, সৃষ্টিকে লোপ করিবে, ইহা কেশব ঘোষণা করিলেন। নবীন-মতবাদীদের সঙ্গে তাঁহার যে বিচ্ছেদ ঘটিল, তাহার এই একটি প্রধান কারণ ছিল।

কেশব চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যার সঙ্গে চরিত্র, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম, উচ্চতম চিন্তার সঙ্গে নিম্নতম দৈনিক গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য-জ্ঞান, ধনের সঙ্গে বিনয় একসূত্রে বাঁধিয়া দিবে। এই বীজ বপন করিবার ছয় বৎসরের মধ্যে একটি ঝড় আসিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। ভগ্ন-হৃদয়ে ভগ্ন-স্বাস্থ্যে কেশব মাত্র ৪৫ বৎসর ২ মাসে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু নারী-শিক্ষার যে স্তরে তাঁহার শুভ চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়, তাহার কথা এখন বলিব, কারণ আমি বাল্যকালে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি সমস্ত ভদ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে অপূর্ব্ব আলোক আনিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারেরও বিশ্বাস ছিল যে স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখাইলে সে হতভাগিনী বিধবা হইবে, চরিত্রহীনা হইবে। অন্তঃপুর মধ্যে মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর প্রবেশে আপত্তি ছিল, সন্দেহ হইত যে স্বাধীন নারীটি যদি ঘরের বৌকে কুপথে চলিবার পরামর্শ দেয়।

এই সব কারণে কেশব এক চমৎকার ফন্দি করিলেন। প্রথমে তাঁহার কমিটির দ্বারা চালিত পরীক্ষাগুলির ক্রম

অনুসারে পাঠ্যপুস্তক ঘোষণা করিয়া, পরে যে গৃহস্থের বাড়ীর কোন মেয়ে অন্তঃপুরে বসিয়া পরীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছে, তাহার নিকট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ডাকে পাঠান হইত। কর্ত্তা ঠিক দিনে খাম খুলিয়া, প্রশ্নপত্রখানি দিয়া, উত্তর লিখাইয়া, সেই উত্তরের খাতাখানা ডাকে কমিটির কাছে পাঠাইতেন। কলিকাতার কমিটি তাহা পরীক্ষা করিয়া পাস-ফেল ঘোষণা করিতেন এবং সকল পাসকরা গৃহিণীকেই পুরস্কার পাঠাইতেন। পুরস্কার ছিল একটি পাতলা কেরছিন টিনের ছোট বাক্স, উপরে নানারঙে চিত্রবিচিত্র করা, আর ভিতরে থাকিত দু'একখানা পুস্তক, কার্পেট বুনাইবার সূতা ও কাঁটা, চিরুণী এবং হয়ত একটি ছোট জামা। সেই যুগে ভ্যানিটিব্যাগ আবিস্কার হয় নাই। কখন কখন হিংসুক প্রতিবেশীরা বলিত যে, বাড়ীর পুরুষেরাই অর্দ্ধেক প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সৎকার্য্য কখনও ব্যর্থ হয় না। এত বাধা, এত অসুবিধার মধ্যেও কেশবের এই চেষ্টায় দেশ আশ্চর্য্য সাড়া দিল। অসংখ্য গ্রামে ও ছোট সহরে হিন্দু পরিবারে যে সব বউ নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত অবস্থায় দশ বছর বয়সে বিবাহিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইল এবং পরে নিজ পুত্র-কন্যাদের ঘরে পড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিল।

অন্তঃপুর-নারী-শিক্ষার আরেকটি প্রবল কর্ম্মী হইল বামাবোধিনী পত্রিকা। ১৮৬৪ সালে প্রথম প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকায় মেয়েদের কাজে লাগে, তাহাদের মধ্যে নানা জ্ঞান বিস্তার করে, এরূপ বিষয় লইয়া অতি সহজ সুরুচিসম্পন্ন ভাষায় প্রবন্ধ ছাপা হইত; নীতিকথাও থাকিত। আমি জানি, কোন কোন অন্তঃপুরবাসিনী নিজের রচনা ডাকে পাঠাইতেন এবং সম্পাদক তাহা ছাপিতেন। এই উৎসাহ পাইয়া কত কত গ্রাম্য ভদ্রমহিলা প্রথমে নিজের রচনা-শক্তি বুঝিতে পারিলেন, ক্রমে দক্ষ লেখিকা

হইলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত অনেক বৎসর ইহার সম্পাদক ছিলেন, অতি সুচারুরূপে এইরূপে দেশসেবা করিলেন।

কেশবচন্দ্রের কীর্ত্তির অতি অল্প কথাই বলিলাম। * যদি এই বিদ্যায়তনের ছাত্রীগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত, তাঁহার শিক্ষা ভাবিয়া তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা এখানে যে শিক্ষা লাভ করিল, তাহা সফল হইবে। †

* সামাজিক-ব্যবহার শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র অন্তঃপুরের নারীদের জন্য যে 'সামাজিক সম্মেলন' ও 'আনন্দ বাজারের' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা এই সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

† ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে ২১শে নভেম্বর ১৯৫৩ ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে বক্তা এই লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। 'যুগান্তর' ২৫শে নভেম্বর, হইতে গৃহীত।

ADULT EDUCATION

"The movement for adult education has been going on in our country now for a number of years. In fact, as far as this State (West Bengal) is concerned it has been in existence for more than seventy-five years. I recall in this connection the efforts among others of the late Keshub Chunder Sen, the great social reformer and religious leader, in the field of adult education, specially his *Sulava Samāchāra,* a cheap newspaper written in very simple language, for the education of people who had little education, people whom we would now-a-days call the neo-literate. It was a unique venture even in those days, which still remains unparalleled after three-quarters of a century". —Prof. Anath Nath Bose.

[Extract from the Presidential Address at the tenth session of the All India Adult Education Conference held at Calcutta on 28th and 29th December, 1953.]

২। সমাজতাত্ত্বিকের সাক্ষ্য

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে বহু ইতিহাসবিদ্ ও লেখক নিজ নিজ মত ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেগুলির প্রত্যেকটিই খণ্ড চিত্র হিসাবে গ্রাহ্য—কোন একটি বা কয়েকটি মিলেও সম্পূর্ণতার দাবী করতে পারে না। এমন কি সব ক'টি মতের গ, সা, গু, কিংবা ল, সা, গু, ক'রেও সত্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। বিচার স্বতঃই একদেশদর্শী হয়ে থাকে। তার যোগ্যতাও খুব সীমাবদ্ধ। এইজন্য আমি জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে কোনো বিচার না ক'রে শুধু ঘটনাবলী উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করব।

আমি গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ বোঝ্‌বার চেষ্টা করেছি ; সেই চেষ্টা করতে গিয়ে আমাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন আন্দোলনের আলোচনাও করতে হয়েছে। এ কথা আমার বারবার মনে হয়েছে যে কেশবচন্দ্র শুধু মহাত্মার একজন পূর্ব্বগামী নন,এঁদের দু'জনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সামঞ্জস্যও রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে হয়তো এই মিল চোখে পড়বে না; কিন্তু একে অস্বীকার করার উপায় নেই। গান্ধীজীই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক এ কথা বল্‌লে তাঁর দলের লোকের খুসি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইতিহাস সে কথা প্রমাণ করে না।

আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ দেশ নেতিমূলক চিন্তাধারায় ছেয়ে গেছে ; সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে, বিপ্লবের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাপিত—চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন। এই সময় মহাত্মা রামমোহন এলেন। তিনি বীজ বপন করবার চেষ্টা করলেন। ক্ষেত্র অনুর্ব্বর,

প্রতিকূল আবহাওয়া—সেই সংকটের যুগে তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ না করলেও স্মরণীয় হয়ে রইল। রামমোহনকে প্রথম modern man আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সে যুগের হিন্দুসমাজ তাঁকে প্রচণ্ড বাধা দিল। তখনকার দিনের সংস্কৃত বইয়ের বাংলা অনুবাদের অব্যাহত ধারার মধ্যে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার অথবা হয়ত বোঝ্‌বার প্রয়াস দেখা যায়। কথায় বলে, ভূতের পা পেছন দিকে ঘোরানো থাকে। এ কথা সেই যুগ সম্পর্কে খুবই প্রযোজ্য। ইসলাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত "মৌলভী" রামমোহনকে বরদাস্ত করা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। বারবার দেখা গেছে, যুগে যুগে যাঁরাই হিন্দু-সমাজের মোড় ফেরাতে চেষ্টা করেছেন, সংস্কারের পক্ষপাতী হয়েছেন, তাঁরাই কালে একটি আলাদা জাতিতে (separate caste) পরিণত হয়েছেন। বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজের গঠন ভাঙ্‌তে গেলেন—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল। চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করলেন—বৈষ্ণবেরা পৃথক একটি গোষ্ঠীরূপে পরিগণিত হলেন। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-সমাজেরও এই দশা ঘট্‌ল। গান্ধীজীর "হরিজনও" আজ এক আলাদা শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। বিনোবাপন্থীরাও হয়ত এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তিনি প্রথমতঃ autocrat এবং দ্বিতীয়তঃ পুরাতনপন্থী ছিলেন। কিন্তু যিনি হাফেজের অনুরাগী, যিনি প্রগতিশীল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে শেষদিন পর্য্যন্ত সন্তানের ন্যায় স্নেহ ক'রে গেছেন তাঁকে কিছু ভুল বোঝা হয়েছে ব'লে মনে হয়। আসল কথা, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সেতু তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেল্‌তে চান্‌ নি; জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তিনি ভাল ব'লে মনে করেন নি। তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথের তীব্র জাতীয়তাবোধ ছিল; তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও

অদ্ভুত ব'লে মনে হত। গান্ধীজীর জীবনেও আমরা এই রকম অদ্ভুত কাজ লক্ষ্য করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হঠাৎ তিনি একদিন একখানি চিঠি লিখলেন। জানা গেল, সেটি তিনি লিখেছেন হিট্‌লারকে। হিট্‌লারকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলা বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনুরোধ জানানো কোনো যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে চিঠি না পাঠানোই অসম্ভব ছিল, কারণ বিবেকের নির্দ্দেশ না মেনে তাঁর উপায় ছিলনা। ঈশ্বরসিদ্ধ পুরুষদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা সব সময়ে সফল হয়না। আমরা জানি পরমহংসদেবও এই রকম অদ্ভুত ধরণের মানুষ ছিলেন। তাঁর সত্যদৃষ্টিও সকল সময়ে যুক্তিতর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা।

কেশবচন্দ্র বা গান্ধীজীর জীবনে আর একটী বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি—সেটি হল মানব-প্রেম। সেই প্রেমের কাছে শত্রু-মিত্র সকলে সমান। তাঁরা কাউকে বর্জ্জন করেন নি। এই মহাপুরুষরা কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। ইংরাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ইংরাজকে ভালবাসতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। জাতির কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন, কিন্তু সকলকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। হয়ত তাঁরা কোনো কোনা ক্ষেত্রে কিছু আপোষ করে চলতেন—কিন্তু কখনই তা' মৌলিক ব্যাপারে নয়, এবং সে আপোষও সর্ব্বদাই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অবলম্বিত হয়েছে। একবার J. C. Kumarappa বলেছিলেন Stateকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা গান্ধীবাদীর কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। আমি যখন তাঁকে গান্ধীজীর রচনাবলী থেকে দেখালাম যে তিনি নিজে Stateকে পরিবর্তিত করা অন্যতম কর্ত্তব্য ব'লে মনে করতেন তখন Kumarappa বলে উঠলেন—"Gandhiji was not sufficiently gandhian"। এই ভাবে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' এবং বিভিন্ন প্রকার

ধর্ম্মবিশ্বাসের ওপর আঘাত করা হয়েছে—তাঁকে "রক্ষণশীল" বলা হয়েছে—তাঁর কর্ম্মকাণ্ডকে "অ-ব্রাহ্মোচিত", "অ-কেশবোচিত" বলা হয়েছে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই অভিযোগগুলি অসত্য ব'লে প্রমাণিত হ'বে।

জাতীয় ভাবধারার উন্মেষের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের দান কতখানি তা আমার পক্ষে বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভবপর হ'ল না বটে, তবু এই ক্ষুদ্র ভূমিকাটি তাঁকে বোঝবার দিক দিয়ে কিছু সাহায্য করবে, এই আশা আমি রাখি। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যদি যথার্থভাবে কোনদিন লেখা হয় তার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাব-বিপ্লবের পুরোধা কেশবচন্দ্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।*

---

* 'দেবালয়ে' (২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৮ খৃঃ প্রদত্ত ভাষণের সার। "শনিবারের চিঠি," বৈশাখ ১৩৬৬ বিশেষ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩। পরিসংখ্যানবিদের সাক্ষ্য

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, এফ্ আর এস্

গত ১৯শে নভেম্বর ১৯৫৯ খৃঃ "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষে Indian Statistical Instituteএর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এফ্ আর এস্ মহাশয় দুই ভাবের দুইটী ভাষণ দেন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৈলচিত্র উন্মোচন করেন। ঐ ভাষণ দুইটি উপস্থিত একবন্ধু কর্তৃক যেভাবে লিপিবদ্ধ হয় সেই ভাবেই প্রদত্ত হইল।

প্রথমে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া মহলানবীশ মহাশয় বলেন—

"আজ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর তৈলচিত্র উন্মোচন করতে গিয়ে এখানে আপনাদের 'রামকৃষ্ণভজন ও মঙ্গলাচরণ' প্রোগ্রামে জুড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। আমার সময় কম আর আপনাদের সঙ্গে এই রকম কাজে সময় দেবার কথা ছিল না। প্রোগ্রামে এই সব বিতর্ক মূলক অসত্য কথা জুড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আপনারাই বলুন আমার কথা ঠিক কিনা? এখানে সত্য কথা বল্‌তে গেলে এই কথাই সত্য যে রামকৃষ্ণই ব্রহ্মানন্দ লাভ করবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিছনে ছুটেছিলেন ও তাঁকেই চেয়েছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের পিছনে ছোটেন নি। এই সত্য ভুলে যাবার ফলে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি ও হারাতে বসেছি।"

তারপর অধ্যাপক মহলানবীশ মহাবিদ্যালয়ের হলে সমবেত ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"আজ এই পবিত্র দিনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৈলচিত্র উন্মোচন উপলক্ষে ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে একত্রে "ব্রহ্মসঙ্গীত" শুনে আমার ১০০ বৎসর পূর্ব্বের এই বাংলাদেশের, বাঙ্গালী জাতির ও বাংলা ভাষার ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, পলিমাটির দেশে আমাদের জন্ম বলেই আমরা যেমন হুজুগে, তেমনি সব কিছু ভুলে যাবার ইচ্ছা করি—একের মধ্যে আরেক পথ ও মতের সৃষ্টি করি। একথা আমার নিজস্ব নয় যে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। এদেশের অনেক গুণী, মানী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও শাস্ত্রীদের গবেষণার কথা যে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি,—এই ব'লে তাঁরা দুঃখ করেছেন। আজ বাংলাদেশের বাঙালী জাতির ঘোর দুর্দ্দিনে আমার ১০০ বৎসর আগেকার কথা মনে হচ্ছে। ১০০ বৎসরেরও বেশী হবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দলবল নিয়ে সকল অসত্যের, অজ্ঞানতার ও অবিচারের মূলে প্রথমেই ধাক্কা দিয়ে ছিলেন। তাঁর স্বাধীনতা, তাঁর মানবতা ও সামাজিক সভ্যতা, সংসারের ধর্ম্মে-কর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসের উপর, অপ্রতিদ্বন্দী ভেদা-ভেদের উপর ধাক্কা দেয়। তিনিই এই কলিকাতা মহানগরীতে, ভাগীরথীর তীর থেকে দেশদেশান্তর পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের সংকীর্ত্তন গান গেয়ে—জনসাধারণের মধ্যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু ভক্ত, শ্রমিক শিল্পী, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, জগতের সামনে এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার—যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাই জাত বিচার"। এই সংস্কৃতি আজ সকলক্ষেত্রে দেশ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ না করলেও, ইতিহাস এই সত্য কথাটী স্মরণ করিয়ে দিবে। আজ ছাত্রছাত্রীদের এই সত্যনিশান হাতে নিতে হবে। বেশী দিনের কথা নয় ১৯২২—২৩ খৃষ্টাব্দে ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ তখন নানান বিষয়ে সংস্কারের জন্য তাঁর বক্তৃতা ও বাণী "রামমোহন লাইব্রেরী" হ'তে প্রচার করেন। সেই সময় মেয়েরা চিকের আড়ালে ছিলেন। মেয়েরা যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ও তাঁর বাণী মন দিয়ে শুনতে চাইলেন, তখন কবিগুরু এই কথা

বল্লেন—"দাও উড়িয়ে দাও, চিক্ উড়িয়ে দাও"—এসব আমাদের সামনে ঘটেছে।

এই কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী প্রায় সমান সমান দেখছি। এই সকলেই যদি এক সঙ্গে জাতি গঠনে, ধর্ম্ম গঠনে, সমাজ সংস্কারে মানবতার চরম আদর্শ দেখাতে পারেন তাহলে ব্রহ্মানন্দের ও তাঁর দলবলের মুখের বাণী সার্থক হবে। গোটা উনবিংশ শতাব্দীর সকল ক্ষেত্রে ঐ একটি মানুষের মনুষ্যত্বে জগৎ অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি ও এখন হারাতে বসেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশী নয়, দু-চার জন যদি সত্য ইতিহাস ও সত্য কথার গবেষণা করেন, তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার দিকে ফিরে তাকাতে হবে। আজ বাঙ্গালী একতা করতে গিয়ে, এক দেশ ও এক জাতি গড়তে গিয়ে, কোন্ পথে ও কোন্ মতে পাক খাচ্ছে বুঝতে হলে, আমাদের পিছনের দিকে তাকাতে হবে। আমি সামনেই থাকি, কিন্তু আমার সময় কম। অধ্যক্ষ মহাশয় বলেছেন প্রতিবেশীদের একতা চাই। একটু আগে খবর দিলে আমার সাহায্য আমার এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ থেকে অযাচিত ভাবে পাবেন। আমি এত কর্ম্মব্যস্ত যে খুব কমই কলকাতায় থাকি, তাই বলছি একটু আগে থেকে জানালে আমি আপনাদের সঙ্গে এসে মিলতে পারবো। মেলা-মেশাতে অনেক উপকার হয় একথা সকলেই বোঝেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে তৈলচিত্র উন্মোচন করা আমার কথা। সেই পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে আমাকে এখন অন্য সভায় যেতে হবে। আপনারা কাজ চালিয়ে যান—আমায় চলে যেতে হচ্ছে—ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।"

[—"ধর্ম্মতত্ত্ব" ১লা ও ১৬ই চৈত্র ১৩৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত]

৪। ভক্ত, দার্শনিক ও ধর্ম্মযাজকের সাক্ষ্য

SYNTHESIS OF FAITHS AS PROPOUNDED BY KESHUB CHUNDER SEN

Dr. Mahendra Nath Sircar, M.A., Ph.D.,

Prof. of Philosophy, Presidency College, Calcutta

"Keshub not only confined himself to the personal realization of God; he felt the impulse of establishing a new church. He separated himself from the church established by Devendranath, since this church appeared to him not sufficiently catholic to accept the truth of all religions. Nava-Vidhan is based upon a unique conception of the *synthesis of faiths*; it embraces all faiths, it seeks their fundamental synthesis and fusion. To the ardent soul the church of God must be broad enough to embrace all faiths and all seeking spirits in the eternal communion with God. The universal church is the true church of God, for it is based upon the conception of the essential truth of all religions and faiths. The synthesis which Rammohan established is an intellectual synthesis, but Keshub drew his inspiration from life and he saw a finer synthesis of faiths since they are ultimately inspirations from life. Islam, Christianity, Hinduism and even Buddhism were studied by his various disciples to find out their living and helpful forces, and Keshub was broad enough not only intellectually but also spiritually to accept them; for from his own spiritual experience he could fit one another, not exactly in their individual connotations but as the different aspects of total human spiritual experience. His sympathy with the diverse spiritual experiences of the human race endowed him with a wide outlook which gave him uniqueness as an inspired teacher.

[Extracts from 'Eastern Lights' pp. 203-6 by Mahendranath Sircar (1935).]

The synthesis of faiths was raised upon theistic ground and theistic setting, for that was the philosophic outlook in Keshub. Buddhism appealed to him by its finer humanism, wide catholicity, and beautiful ethics. Though the negative aspects of its teachings had no charm for Keshub, still he could find that Buddhism in its ethics had laid the foundations of a cosmic humanity.

Islam also had an appeal to him by its conception of God as power and its insistence on the equality of men. The finer democratic spirit of Islam cannot escape the sharp eyes of this ardent seeker. Vaishnavism attracted him by finer stretches of love, a love that could see in God the human element and make him more accessible to us. God is not only the God of heaven, He is also the God that visits us every hour through the human relations. Keshub was keenly alive and sensitive to this beatitude of Love. But he seems to have been attracted chiefly by the human character of Christ and the death of Christ for humanity. In it he could see God's power of redemption and the sacrifice of almost his own self for fallen humanity. If Vaishnavism could attract him by the ministration of God in all spheres of life, Christianity could satisfy him by the anxious solicitude of God to redeem humanity.

Vaishnavism makes love the central conception of its credo: Christianity grace. Grace has a better appeal for a fallen humanity, have a finer appeal for redeemed souls. Christ was to him the most attractive spiritual figure in history, for Christ is so precious to humanity. Christ is the Love that saves, the force that uplifts, the power that elevates, the divine that secrifices itself for suffering humanity. This aspect of Christ-life made the finest appeal to Keshub, because he could understand from his nature how redemption is almost impossible without Divine Grace. And Christ is Grace in flesh. This mingling of the Divine with the human in Christ is attractive; and, to Keshub, Christ not only bridges the gulf between man and God, but also he

is the goal of approach. Man will not be completely divine, but he shares a divine nature; a divinity that sleeps, but which the influence of Christ awakens in him. Christ represents the eternal truth of the finite embarced by the infinite, the divine expressing itself through the human. This unification of the two is the hope and the promise, and at the same time justification of the life of man in the Divine.

"Christ existed in God before he was created. There is an uncreated Christ, as also the created Christ, the idea of the son and the incarnate son drawing all his vitality and inspiration from the Father." *

The Christ that drew homage from Keshub is the 'True Asiatic Christ,' divested of all Western appendage, carrying on the work of redemption among his own people. 'In his every movement—in his uprising and downsitting, his going forth and coming in ...... Christ was truly Asiatic.' 'Jesus,' in Keshub's words, 'was our Jesus.' This Asiatic Christ, the moving love, the redeeming mercy, the untutored Son of God, unsophisticated, humble and catholic in nature, was to Keshub the veritable ideal of the divine Love that embraces us and saves us. The spirit of God penetrates everywhere as the gentle breeze stimulating life and spirituality". *

* "That Marvellous Mystery—The Trinity".

BRAHMANANDA AS A SEEKER AFTER TRUTH

Prof. Haridās Bhattāchārya, M.A., B.L., P.R.S.,
Head of the Dept. of Philosophy, Dacca University.

Brothers and Sisters,

This gathering is somewhat unusual for me. It is not a public meeting of the ordinary type. The spirit of levity or intellectual appeal is not likely to satisfy the audience. This place is sanctified by hallowed memories. Some of the greatest sayings of modern India were uttered here, words which came in the spirit of revelation, of the truth of which we are common inheritors. There is no monopoly in this field, the seekers of truth have glimpses of the whole truth according to their visions. Here truths revealed to the races and communities were focussed into one unit.

The Pilgrim—A Seeker of Truth

This is very well expressed in the words of this great son of Mother India. He said that on his forehead was the stamp of the pilgrim. This is one of the greatest of sayings ever uttered. According to the Buddhist philosophers, they are eternal wayfarers, their way is long and never-ending. They never believe that they have reached the end. This eternal wayfarer of ours touched and ransacked life at so many points and issues to get at what he was really seeking after. He was not a solitary seeker. He was in the vortex of social reformation, in the midst of the multitudinous activities of this city, busy in the propagation of education, female education, temperance, reforms and so on. He sought truth in every field. He searched for truths particularly in one aspect of life, the type of life he wanted to live, glorious and reflecting glories.

[Substance of a lecture delivered by Prof. Haridas Bhattacharya at the Bharatvarshiya Brahma Mandir, Calcutta, on the 19th of November, 1952. Recorded by the author of this book and revised by the lecturer.]

Keshub by Birth Combined Two Streams of Thought

Keshub Chunder Sen was born a Hindu, combining two distinct streams of thought in him. His father was a *Vaishnava* and his mother a *Shakta*. In his childhood he imbibed both the traditions. A student of psychology will tell you that we carry our memories which express themselves in our behaviour in mature life. From *Shāktaism* he got the experience of God as the Mother and from *Vaishnavism*, the experience of God as the Father. Mother is fondness and Father awe. The combination of these two experiences made him the greatest sage of modern India, the combination of the God of stern justice and the God of mercy. Thinkers recognize these two elements as the greatest aspects of God. He felt God in those aspects not through books but through life. There are two types of religious people. One type acquired its religion through traditions, sets of doctrines and dogmas inherited, imbibed and practised, and passed on from generation to generation. Bergson has discussed this in his book on 'The Two Sources of Morality and Religion'. This explains conventional religion, the faith which runs from generation to generation. Some are Buddhists, some Hindus, some Christians, some Muhamedans and so on. Have they received their religions direct from God? No. Being born in a fold, they have imbibed them from that fold. There is no harm in that. We are born amidst them and are satisfied with them. As a coin they may be genuine or counterfeit, we may try to assess their truth or not so received, but we get them ready and accept them.

Direct God-vision

These are the ordinary types of conventional religions. But there is another type as Keshub was. He was original, singular and particular. In his childhood he was a devout boy in the traditional sense and developed an intuitive way of religious life in course of time.

Keshub Singular and Intuitive

Ordinarily we see no vision, we follow socio-economic practices and ceremonies, sacraments and rituals, because we are born in the inheritances of a particular society. Societies then were not so liberal. There were occasions when courage of conviction had to be proved, not merely for choosing a way, merely as an adventure or experiment, but as a challenge to the heart. On such occasions we get frightened. Here was a man who acted fearlessly upon the voice of God. In his family when he was prescribed certain religious ceremonies, he refused to obey, which indicated his singularity.

Perpetual Growth of Religious Genius—The Secret

Now you see, religious genius, saints and prophets are like growing tips of a plant, growing incessantly, piercing through the bark around it, barks cannot stop their growth. The growing plant grows gathering fresh sap which expresses itself in flowers and fruits.

Reason and Faith

Keshub Chunder Sen was such a growing tip. His religion refused to stop growing. He heard the call of the Infinite, 'Pray', 'Pray'. Keshub is described as a man of prayer, praying for light direct from God, without the intervention of *Gurus*. Whenever in doubt, difficulty or temptation he would pray. There was no necessity of codified book-learning. "The Lord said, I was to have no heaven but life in Himself, no creed but a perennial and perpetual inspiration from heaven". "Thus the freedom of my reason was completely overcome, and I lost my self-will". *

Ādesh

What benefit will be derived spiritually if you do not accept what you find in books and codes? In that

* "Am I an Inspired Prophet?"

respect Keshub was more a Christian than anything else. He said like Christ, 'Thy will be done'. This was in spite of oppositions and troubles. It was a challenge from God. As to the Jewish Prophets of old, the call came to him from God. Much has been said on this *Ādesh*. The church has been split on this issue. How did he explain it? Abstracting intellect does not come in at the moment of communion with God. That which makes us godlike only counts. It is a common experience that the best-read man in the world may be the sorriest specimen of humanity. So learning or intelligence is of no help to us in this domain. As self-bereft souls we enjoy an inseparable spirit-union with the Supreme by attuning our will to His. This is actual self-surrender for a positive godliness or godlikeness. It is the spirit of God greeting your spirit. You cannot see the truth unless God has revealed it to you. In his *Jivan Veda* Keshub said, "I have spoken to God and God has spoken to me". The spirit of God reveals Himself to you. It is subjective appropriation of objective revelations. Unless these produce sympathetic response in us, we cannot understand them. God is fond of life and not words. Therefore inspiration was the main pillar of his life. Inspiration prevails over will. In *Sruti* and *Smriti* and everywhere inspiration has the final say.

Singularity of Greatness and Perpetual Inspiration

All men are not Keshub Chunder Sen. All men cannot hear distinctly as he did, because we are more or less spiritually deaf. We must learn how to hear. Cultivation of the spiritual faculty is necessary. Great-men, because of their highly developed spiritual faculty, hear the still small Voice of God. We have to enlarge our hearts, purge our mind of many abuses that act as a screen between our spiritual sense of hearing and the Voice of God. We too can tune our hearts to that sound of the still small Voice within. Is there no end of inspiration? Christ said, "I am the way and the

life". Many christians accepted its letter and lost its spirit. If you accept the man as a mediator and a final medium of divine revelation, inspiration stops. Inspiration is not other peoples' gift. It is direct, it is endless, it is perpetual. There is no spiritual rationing. The independent spirit of Keshub bore evidence to this fact. Keshub said he was shy in matters secular, but bold in matters spiritual, independent in matters spiritual. The Spirit of truth bloweth directly from God and fulfils itself in the world. It is no dead God, it is the living God. Spirit is transmitted generation after generation, now as before of old. No interpreter or mediator is necessary. The Living God dwells everywhere. God speaks direct. There alone is the assurance of infallibility. There is so much risk in going through a mediator. Therefore approach God direct. God is no respecter of persons. We are frail vessels of eternity. If anybody hears distinctly, he will accept it as true. If anyone is deaf now, he will cast it away. The deaf will distrust inspiration, they will also distrust God. It is nothing new.

Distrust of Inspiration Analysed

Distrust of inspiration, of great men, and of God is seen in every age. In his famous lecture, 'Am I an Inspired Prophet?', Keshub has explained his claim for inspiration. He said he was a sinner, but singular. His singularity consisted in the inspiration he received. Spiritual genius is a freak of nature, a biological freak. Keshub has explained the need of spiritual discipline and yogic practice to be able to listen to inspiration clearly. He said he was not a prophet. He was a man of prayer. God appeared to him in inspiration and appeared frequently. Without inspiration he was nothing. God has revealed Himself in ways, times, and places peculiar to Himself, from Mahomed of Arabia to Ramakrishna of Dakshineswar.

Idolatry Analysed

Can you bind God to any fixed codes, that this man shall be a prophet and that man not? Keshub

has pointed to two dangers; dangers both in not accepting Divine visitations and in accepting them. In the first case it results in irreverence and scepticism. In the other case to idolatry. The Christians called Christ 'Lord', the Buddhists call Buddha '*Bhagavān*' and so on. These are instances where men are raised to the position of God Himself. But taking the place of God by men is not right. Christ said, 'I and my Father are one'. This does not mean that he himself was God. But this speaks of his entire surrender to God, absolute dependence on God, complete self-negation. So Keshub was concerned when some of his followers questioned him whether he was a Prophet. He said, "No. I am a man, a sinner, imperfect. God alone is perfect. Has He ceased to be approached? It is when we approach Him that He reveals Himself to us".

Keshub-centricism

There was a controversy about Keshub-centricism. What could it actually mean? Does it mean raising him to the place of God? Is it an attempt at getting inspiration through him? Then it is an abuse. But it can be looked upon as the central sun being in the middle and the lesser luminaries all around. In that sense it is all right. In abnormal psychology we know of cases where a patient suffering from some disease, when he or she gets rid of it by the aid of some doctor, begins to love the doctor. The healer of sinful souls runs the risk of being divinized. Religious heroes are quickly defied especially in India and Bengal. Here saints have become gods. Half a dozen men and women have of late been raised to the pedestal of divine glory and are being worshipped. Keshub was right in emphasising this aspect of human weakness. In the last chapter of his *Jivan Veda* he has made it absolutely clear. But it is also a natural attitude to look upon the great as great. Keshub understood things which lower down no one could. He was idealised as an exemplar of virtue and faith and was likened to God, because God is the exemplar of virtue and faith. That was the attitude of the people. But Keshub like a good

doctor declined this honour accorded to him by his admirers. Keshub was distrustful of idolatrous attitude. He abolished idolatry altogether. He warned men against idolatry of all types. Men build idols of the heart too e.g. pride, conceit, indulgence, meanness, 'isms', imperfections of life both individual and international. Keshub repudiated idolatry of all shape. He invited all to be truly spiritual worshippers of God Who alone could reveal His truths to us, could lead us to spiritually great men.

Democracy Analysed

Keshub chastised men for their proneness to littleness, for small things being magnified, for doubting his motives and for having stopped down to ventilate such matters as did harm to his cause which he knew to be divine. He was sincere in his protestations. In the first place he was accused of being proud of doing things without caring for the opinions of the people, that is, working against the principles of democracy. There is, no doubt, wisdom in collective judgment. But there is always the possibility of a conflict of ideals. There is a spiritual way of doing things which is not accessible to all indiscriminately. The ideal of the noblest few may not necessarily be the ideal of the large number. The great and the noble can hear clearly the still small Voice of God, receive inspiration regarding every detail of life, whereas the large number of ordinary people think on a lower level. Progress of profession of the largest number is different from that of the noble few. Religion of great men is dynamic, their personality is dynamic. Keshub has been compared with Napolean. Just like Napolean, Keshub proceeded from one conquest to another in his spiritual warfare.

The New Dispensation and Shock Method

There was no stop. This was the programme for the Church of the New Dispensation. He applied successive shocks to keep the followers of his ideal alive. Just as electric shocks have to be applied to people who

have swallowed opium to counteract their tendency towards sleepiness, so he applied spiritual shocks to the members of his church and led them onward. In every religion the members follow some formulæ of worship blindly. In Islam there is *Namāz*. In Hinduism *Tri-sandhyā* and so on. The Brahmo Somaj followed a form of congregational worship on the model of the Christians. At first the service was on a fixed line. This form of worship was found to be inadequate by Keshub. While engaged in an uniform or routine form of *Upāsanā* people quickly succumb to spiritual dozing. He felt the necessity of shock treatment to make them alert spiritually. The words of God must come fresh from the minister.

Extempore Upāsanā

Hence extempore expression of Inspiration was introduced in the form of Divine service to rouse the inspiration of the congregation. In Rabindra Nath Tagore we have seen that whatever he thought, he spoke. His writings even to-day rouse the same feelings in us which inspired his utterances. These are men of emotion.

Nagar Sankirtan

There are others of rapturous emotion, e.g. Sri Chaitanya. In the inundation of his rapture, Sri Chaitanya flooded the country. Similar was the effect of Keshub's *Nagar Sankirtan*. He introduced *Nagar Sankirtan* to rouse devotional fervour in the men of the street. He went to Bihar and many other places spreading the contagion of his spiritual fervour.

Lectures

What a commotion his lectures created! Even now, you cannot read them without being carried away by them. What transparency of thought and purity! One is amazed at these lectures. In them the inside of human nature has been laid bare to the outer gaze.

He was born with an emotional temperament; but not by itself, but with the aid of inspiration it bore fruit. He sought inspiration in every way. Otto in his book, 'Idea of the Holy', has described it as the feeling of the numinous. It requires a weird, awe-inspiring, quickening stimulus to evoke the sense of the Holy. Reading of the lives of great men, reading scriptures, a gathering of expectant hearts, all these rouse the idea of the Holy in us.

Retirement to the Hills

The spirit must be periodically revived by retiring to numinous situations. For this Keshub went to solitary retreats. We all know that Moses and Mahomed went to the mountains to seek inspiration. There the spirit breathes infinity, comes in contact with wide expanse. Here in busy places, our pre-occupations interrupt religious calls and the cramped atmosphere limits our vision. Keshub retired to the mountains to see God.

Yoga

It was during his stay in the hills of Simla that he wrote the articles on 'Yoga—Objective and Subjective'. Yoga Objective speaks of God in nature, from outside, as a mighty force pleasing and at the same time terrifying, leading us to *Karma*. Then comes Yoga Subjective, seeing God in soul, feeling the touch of God in our innermost heart leading us to *Jnān*. Last of all comes *Yoga Paurānic* or *Bhakti Yoga*, God active amongst His children in His creation. No aspect of life remains irresponsive. Too much emphasis on outward creation makes man material, idolatrous. Too much thinking is a danger too, it makes us too much intellectual and abstract. So direct appreciation of the presence of God is necessary.

The Formula of Trinity

This is Trinity—God in Nature, God in Soul, God in History. The cardinal principle of Keshub's God-

vision is this theory of God in History. It was from this revelation of God that he had a vision of the New Dispensation. "Behold the tabernacle of God is within men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor cry, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And God said, I make all things new".* To Him and Him alone belongs the power of converting all mankind into sons and daughters of God. Firstly, God manifests Himself in the creation; secondly God sends down His Divinity into the world through great men, through His Sons; lastly He reproduces His Divinity in millions by making all things new, and thus saves sinners.

Direct Inspiration: The Grace of God recreates humanity

It is God in history that converts outward truth into inward purity and thus saves sinners by His grace in different environments. God in history is a legitimate assumption. This experience led him on to further experience and preach that not only 'There is Truth in all religions', but that 'All religions are True'.

The Challenge of All Religions are True

It is exactly the same thing as the यत मत तत पथ (As many views, so many avenues to God) of Ramkrishna Paramhansa. There is no conversion in the latter, there is nothing to be preached in this to others except to be tolerant to other creeds and faithful to ones own. But if you have inspiration, speak out; do not enjoy it yourself and wait for interlocutors but make it possible for humanity to get an access to truths revealed to you through active preach-

* "That Marvellous Mystery—The Trinity".

ing, change the morals of the people about you. It at once establishes the Fatherhood of God and the Brotherhood of man. Now, how to change the way of thinking of all, if all beliefs are true? With the tide of time new experiments and new institutions have come to India. Science has come.

Advent of New Things Making Everything New

All these factors have combined to replace the old institutions. And the life of old in the country has been influenced by new institutions and new values. New events are daily taking the place of old ones, making the face of India entirely new.

The New Dispensation i. Apostolic : ii. Universal and National

On this challenge of 'All religions are True' is built the Church of the New Dispensation which is altogether new. Instead of human agency, it is governed by Apostolic spirit. It is both Universal and National. It assimilates all religions of old in its texture, but the garb in which they are assimilated is national. Christ as preached by the Westerners was rejected by Keshub; but welcomed and accepted in a new oriental garb, understandable and natural to our Indian understanding. There is a beautiful book written by Bhai Protap Chunder Mozoomdar named 'The Oriental Christ'. Christ has been surveyed with oriental eyes as taught by Keshub. Of late Swami Akhilananda has written a book on the same line. In one of his lectures Keshub addressed the West and protested against their work of national slaughter in Asia. Says Keshub, "Before the formidable artillery of Europe's aggressive civilization, the scriptures and prophets, the language and literature of the East, nay her customs and manners, her social and domestic institutions, and her very industries have undergone a criminal slaughter". Again he adds, "Her (Western) science and literature, her commerce and trade, her politics and religion have saved us from ignorance and error, and given us light, liberty, and joy,

and have laid all Asia under lasting obligations. But Europe, thou holdest in one hand life, in another death. Thy civilization has proved a blessing, but inasmuch as it utterly exterminates our nationality, and seeks to destroy and Europeanise all that is in the East, it is a curse". "Asia is the fountain-head whence have gone forth streams of various creeds and diverse movements, religious, moral and social, east, west, north and south, to the uttermost parts of the world, producing varied results in different places and climes. They have gone in different directions. Yet in their source they are all one". "Not even her worst enemies can predicate narrow exclusivism of Asia". "Asia's first message to Western nations is—Put the sword of sectarianism adroitly into the sheath. ...It (sectarianism) is made of envy, jealousy, pride, anger, resentment and vindictiveness".*

Nationalising Foreign Ceremonies

He said that when we accept Christ, we do so as an Asiatic. For this, he interpreted Christian ceremonies in symbolic fashion. Baptism in *Snān*, Eucharist in *Prosād* and so on. It was an anathema to a certain section. But this was found to be most effective to imbibe the spirit of the historical religions. Keshub taught men to try to live that religion in order to make its spiritual things living.

Nationalising Foreign Words

Even in the use of words, he applied this method. There are many instances where his words were direct copies of old Testament passages. Keshub was a great imitator of Jewish ways. He thought like a Jew, he was imbued with the spirit of Judaism. The words 'I am' are used in the Old Testament to signify the existence of God. He used these words very often to denote the uncompromising God. The Christian conception of God as Son was explained by him as the loving attitude of God. Then he spoke of the Holy Ghost or the Spirit

* "Asia's Message to Europe."

of God, which waited on humanity to lift it up to God. He combined these three aspects of the revelation of God in the Hindu idea of *Sat Chit Ānanda* or God as 'I Am', God working through Son, God revealing Himself in all in inspiration.

Eternal Punishment

He did not believe in punishment in the Christian sense as pictured in Dante's description of Hell or as in Madhva's philosophy. How was it possible that when there was God, a portion of the world should remain eternally unredeemed? To him this was an unthinkable proposition.

Man can not be God

He also explained the saying of Christ, 'I and my Father are one', in a very simple manner. The Christians took Christ's words in a particular sense and put the Son in the place of God the Father; He said that by that interpretation of the Christians, Christ usurped the position of God, which could not be the real meaning. He said that the inner meaning could be nothing but complete self-negation of Christ before the will of his Father.

Nationalisation with Universalities Leads on to a Natural Harmony of Religions

Thus Keshub entered into the spirit of some of the ceremonies and great sayings of their religions, which were so long enigmas to others and kept them divided. This new angle of vision leads us on to another important principle enunciated by Keshub, harmony of religions, often known as eclecticism. Bacon mentions three types of philosophers. Firstly, he mentions the case of those, like ants, collecting food particles but unable to assimilate them into a whole. Then he speaks of those, like the spider, spinning its web out of its own body without any concern for the outside world. Lastly he mentions those, like bees, collecting honey

from different sources but mixing it all up so well that it is transformed into one type and there remains no trace of the separate sources of supply. Like honey different religious practices combined in Keshub's life into a homogeneous whole. He introduced *Kirtan* of the *Vaishnavas*, 'Motherhood of God' of the *Sāktas*, the *Homa* of the *Rishis*, *Baptism* of the Christians, and so on. Now it may be asked whether it was the policy of Keshub to make his religion popular with all communities. Was this synthesis invented just to placate the feelings of others? Was it a compromise or an appeal to popular imagination? These thoughts came to the mind of many and need thorough analysis. Brahmananda practised Homa, Eucharist, Islamic and Buddhist rituals; but in practising the ways of all religions he transcended idolatry and bigotry altogether. God has revealed Himself in many ways; through science, through human hearts, through all good things, and so on. When God is revealed to us, our minds are illumined by everyhing. God is found everywhere. In his search for truth, Keshub communed with the saints of every religion. Every advancement of knowledge had an appeal for him and he approached all spiritual solutions for greater light. In the last years of his life, Keshub wrote articles in the *New Dispensation*, explaining the various aspects of the 'Religion of Harmony'. He discovered that no religion need have really idolatrous significance, but that each could be reduced to idolatry when detached from reference to the living God. He did not believe in caste. He called himself a member of the caste of the poor, the lowly. Thus he spiritualised the idea of caste in Hindu sociology. To man, if he was going to be a full man, this new doctrine in humanity was essential. If God was working in all humanity from China to Peru, through Islam, Buddhism, Christianity, Hinduism and so on, the whole of humanity was to be looked upon or converted into one great mass of spiritual life. We are all votaries of truth. We accept new truths wherever found and add them to the store of truths gathered before.

One Truth : One Religion

Thus we find Truth is one and Religion is one. Herein lies the harmony of institutions. The fundamental note is the Fatherhood of God and its overtone the Brotherhood of man. Multiplicity is reduced to unity. Human nature is diverse, but there is a grand unity in this diversity. However there is one danger in it, the unity so found suffers from one weakness, the weakness of imagination.

Real Vs. Unreal

Keshub eliminated this imagination in toto. Some speak, for example, of Zorostrian religion as worship of abstract concepts, of some other religions as idolatrous, of others still as based on fictions of the mind. How can all these defects be remedied to make religion real?

Solution in the Living Personal God

Keshub saw God as a Living God, a Personal God, a Being to Whom we can offer prayer. It was this God Who sent each and every religion to satisfy the calls of the spirit in man. Every religion has served humanity according to the needs of a particular age and clime and served as a link in the chain of spiritual continuity and evolution.

Every Religion a Dispensation

Thus in religion man has been exalted through the ages It is that Personal God we want. When we approach the Personal God, our whole personality works. The calls of the Divine, man responds to, are inherent in all historical religions as Dispensations of God. Thus there is a grand synthetic procession of religious beliefs which is not arrested, does not degenerate into a new idolatry. When man rises to that height, God appears to each and every one in his own individual way. Such is the harmony of religions in the character of man. In the words of Keshub—"It

is the harmony of all scriptures and prophets and dispensations. It is not an isolated creed, but the science which binds and explains and harmonises all religions. It gives to history a meaning, to the action of Providence a consistency, to quarrelling churches a common bond, and to successive dispensations a continuity...... Thus shall we put on the new man and each of us will say—the Lord Jesus is my will, Socrates is my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my Soul, and the philanthropic Howard my right hand. And thus transformed we shall be an witness unto the New Gospel".*

---

* "We Apostles of the New Dispensation."

THE CONTRIBUTION OF KESHUB TO MODERN CHRISTIAN THOUGHT AND LIFE

Rev. G. Howells, M.A., B.Litt., B.D., Ph.D.
Serampore College, Serampore.

I am glad to be here to-day to have the opportunity of contributing my humble token of regard and reverence for the memory of the great Brahmo reformer, Keshub Chunder Sen, a man who, in my judgment, will take his place as one of the commanding figures in the religious history of the 19th century. Much has been said and written regarding Keshub's influence on Hinduism, and his indebtedness to Christianity. The few minutes I have at my disposal this evening I would devote to what I consider to be the influence of Keshub on Modern Christian Thought and Life for it needs to be remembered that his work and teaching excited deep interest and aroused earnest thought not only in Christian missionary circles in India but in Christian circles throughout the West, especially Great Britain and America.

Christ The Bond of Brotherly Union Between East And West.

In my judgment he has *helped us, Western Christians, to give recognition to the Oriental aspect of Christ's character.* As the result of many centuries of Christian life and theological speculation our views of Christ had taken on an unduly Western aspect. We had come to think of him in the light of an ordinary European, and had grown accustomed to assign to him characteristics, that are essentially Western rather than Eastern, or universal. It cannot, therefore, be surprising that India regarded the religion brought to them by the missionary as something essentially European and foreign. Keshub rendered invaluable service to modern Christian thought in bringing home to us

[Extracts from a lecture by Rev. Howells delivered at the Calcutta University Institute on 8th January and published in the World and the New Dispensation, January 1919.]

the fact that Jesus Christ was not an Englishman from London or an American from New York, but an Oriental of Palestine with a world-wide outlook and appeal.

Christ's Communion And Community.

Keshub has *helped us to recognize more clearly the paramount significance of the human element in Jesus Christ.* The tendency of Western thought for centuries had been to remove Christ far away from human life, and to think of him too exclusively as the Divine son rather than also the Son of Man. We have become in relation to Jesus himself as in relation to God unduly deistic in our outlook. There was in our thinking an unreality about the character of Christ that made the true imitation of him by men something beyond human attainment. The Christ of theological speculation was not the Jesus of the Gospels, and our Christianity suffered to an incalculable degree in thus removing Jesus from the realities of our human life and conceiving him as simply, if not exclusively, superhuman. In this connection I may quote the following words of Keshub—

"Analyse Christ's fundamental theology, and you will find in it two parts essentially distinct from each other. The first is, "I in my Father"; the second, "Ye in me." All Europe believes in the first, but the second has yet to be realized. Who is there in orthodox Christendom that does not say, Ay, when Christ says, I and my Father are one? Surely in the identity of his nature with that of the Supreme God all Christian nations in the West have established their firm faith. But they have only accepted one half of Christ. Why should they abjure the other half? If Christ is one with Divinity, he is also one with Humanity. If you believe in the full Christ, in the perfect Christ, you must believe in the double harmony of his nature, harmony with God or communion, and harmony

with men or community. Alas! Christian Europe does not yet comprehend the real secret of the words—"Ye in me". Christ's identity with all mankind is indeed a grand mystery, which Christian Europe seems yet unable to understand. I do believe as you do that the Son and the Father are one, but this unity is only the first half of Christ. Why do you cast off the other half of Christ, his unity with humanity? Take this second half, take the entire Christ."*

Words such as these were altogether necessary for modern Christians. In our fears for the divinity of Jesus and his claims to identity with the Father we have not done justice to the humanity of Jesus and his claims to identity with his brother men. As in another place Keshub points out, Christ went to his Father and prayed:—"As Thou Father art in me, and I in Thee, that they also may be one in us." Until recent years the modern Christian has shrunk from the significance of this aspect of the teaching of Jesus. It is still far from fully recognized by modern Christianity, and our spiritual life is all the poorer in consequence. When we attain to the fulness of such teaching and all that it involves we shall recognize more clearly the debt we owe to the teaching of Keshub and to men of similar outlook of faith.

Spiritual Meaning of The Trinity.

Keshub has *helped us to give a more human interpretation* to the doctrine of the Trinity. Western Christianity had come to regard the Trinity almost entirely in the light of a metaphysical abstraction or a theological dogma. In the early centuries of the Christian era a sharp controversy arose in the Christian Church between the followers of Arius and Athanesius, on this great subject. The controversy centred round points of a metaphysical character and Christian Bishops in numberless synods cursed one another turn by turn. Riots and armed conflicts became the order

---

* "Asia's Message to Europe."

of the day. The bearing of the doctrine on the realities of the spiritual life were almost wholly ignored, and throughout the Christian centuries the doctrines of the Trinity had an air of unreality about it to the average Christian mind. To-day, we are beginning to think of the doctrine of Trinity more in terms of the spiritual life. The following words of Keshub illustrate what I mean—

"Here you have the complete triangular figure of the Trinity, three profound truths—the Father, the Son, and the Holy Ghost—making up the harmonious whole of the economy of creation. Gentlemen, look at the clear triangular figure with the eye of faith, and study its deep mathematics. The apex is the very God Jehovah, the Supreme Brahma of the Vedas. Alone, in His own eternal glory He dwells. From Him comes down the Son, in a direct line, an emanation from Divinity. Thus God decends and touches one end of the base of Humanity, then, running all along the base permeates the world, and then by the power of the Holy Ghost drags up degenerated humanity to Himself. Divinity coming down to Humanity is the Son: Divinity carrying up Humanity to heaven is the Holy Ghost. This is the whole philosophy of salvation. Such is the short story of human redemption. How beautiful, how soul-satisfying! The Father continually manifests His wisdom and mercy in creation, till they take the form of pure Sonship in Christ and then out of one little seed-Christ is evolved a whole harvest of endless and ever-multiplying Christs. God coming down and going up—this is creation, this is salvation. In this plain figure of three lines you have the solution of a vast problem. The Father, the Son, the Holy Ghost; the Creator, the Exemplar and the Sanctifier: I am, I love, I save; the Still God, the Journeying God, the Returning God; Force, Wisdom, Holiness; the True, the Good, the Beautiful; Sat, Chit, Ānanda; Truth, Intelligence and Joy."*

Minute discussions of a metaphysical Trinity will always have interest for the philosophical few, but the

* "That Marvellous Mystery—The Trinity."

doctrine has reality for spiritual life only in so far as it can be related to the deeper spiritual needs and experiences of men. No one brought this out more clearly than Keshub.

The Same Spirit in Independent Forms.

Keshub has helped us to see that Christian Institutions may be adapted to Indian conditions. There can be no doubt that Christian ordinances as practised to-day,—Christian forms of worship and the forms of our Christian ministry,—all bear marked traces of adjustment to Western conditions, and not unnaturally so. Baptism, for instance, as practised in a modern Christian cathedral is something very different in form from that which Jesus submitted to in the river Jordon. The rite of Eucharist as celebrated in a modern Christian Church would hardly be recognized by a Christian of the Apostolic age as the same as that which he himself participated in with his fellow disciples. In the supper or Love-feast, common in the early Christian age, the ordinary Christian service of the modern Western Church, no matter of what denomination it may belong to, is something very different in form from that which prevailed in the time of Jesus and his apostles. The Bishop of Rome, or the Bishop of London, has a position and undertakes responsibilities differing very widely indeed from anything characteristic of the Bishops of the first Christian century. In all matters of this character there have been developments in Christian forms, and Christian worship adapted to the special conditions prevailing in Europe and suited to our changing needs and our traditions. The mistake we make is in thinking that our forms are necessarily adapted to the needs of Eastern lands. Keshub realized that forms of worship, ministry and church-government in India should be in full accord with India's traditions, customs and sentiment. The originality of Keshub in matters of this character may profitably be pondered by leaders of Christian thought and life in India.

Keshub has *helped us, modern Christians, in recognizing that the essence of our religion is the life of the Indwelling Spirit of God.* There can be no doubt that the ordinary Western has a tendency to think of God as outside the world, in other words as transcendent, while the average Oriental thinks of Him as within the universe or immanent. An unprejudiced student of the Christian Scriptures will recognize that the great Jewish prophets, including Jesus and the apostles, gave equal prominence to both aspects of the Divine Nature and Divine Life. "The Kingdom of God is within you" was the teaching of Jesus, and he devoted all his energies to the establishing of the divine kingdom in the hearts of men. "Is not your body a temple of the Holy Spirit?" is one of the searching questions of St. Paul to the earliest Christian converts. Keshub saw this with the utmost clearness, and the Christianity of Western lands was in many respects a source of real disappointment to him. In the teaching of Keshub the doctrine of the Indwelling Spirit is constantly emphasised.

"I fear it is too true that you are guided in a great measure by your own judgment, and that there is too much of prudential calculation and earthly deliberation in your plans of operation. There seems to be more dependence upon the wisdom of committees and councils than upon the inspiration which comes direct from Heaven. In all things that you do, show by your devotion and enthusiasm that you always consult the Holy Spirit, and are led by His voice and animated by His living breath."*

There can be no doubt that such teaching as this deeply influenced Christian missionaries in this land, and indeed Christian circles throughout the West. The West has never been without its Christian teachers who

* "Christian Mission Work in India."

have seen and emphasised the truth of the Divine Immanence and the doctrine of the Indwelling Spirit, but in recent years there has been a widespread revival of this aspect of Christian teaching. We are coming to interpret our Christianity in terms of the life of the Holy Spirit in man, rather than in terms of creeds and ceremonies. And when the future historian of Christianity will seek to trace their various sources the changes that have taken place in Western Christian thought in this direction, he will give full recognition to Keshub and other religious thinkers of the East.

Include And Absorb All Humanity And All Truth: The Harmony of all Religions.

Keshub has helped us, modern Christians, to recognize heartily and sincerely the truth and the good in other religions. Perhaps this is the crowning achievement in the religious teaching of Keshub. The idea of the harmony of all religions has come to be associated specially with his name, and here, I venture to say, he has exercised a deep influence not only on modern Christianity, but on the thought of the whole world. So far as we Christians are concerned, we had certainly moved very far from the sources of our religious authority, Christ and the New Testament. Jesus claimed that he came to fulfil rather than to destroy all that was good and true in the religious thought and life of previous ages, and that was the attitude of the early apostles and the Greek Fathers. To them Christianity was a fulfilment of all that was true and good not only in Judaism but in the paganism of Greece and Rome. Pagan teachers like Plato and Socrates came to be regarded as in their way forerunners of the Christ. But there grew up in much of later Christian thought a hardness that characterised all non-Christian prophets and teachers as agents of Satan, and all non-Christian religions as inventions of the devil. All this was, in my judgment, a direct contradiction to the spirit of Jesus, who would not break the bruised reed, nor quench the smoking flax. To-day the great body of

Christians have come to recognize that truth is truth, wherever it is found, and that God is infinitely greater than the limited Deity of Orthodox Christianity. Herein the teaching of Keshub has had a world-wide effect on modern thought.

Humanity, to-day, in its search for fulness of life and truth is moving in the direction of a fundamental unity. We shall come to our own as brother-men, not by standing up for any particular 'ism' or the inherited tradition of any particular geographical area whether we regard them deep down in our hearts as right or wrong. We are true to the Divine within us only in so far as we are ready to pursue truth and follow the Divine Light even though the Heavens fall. There is a mighty task awaiting the modern world, no less than the reconstruction of the whole life of the world, in all its varied phases, on a basis of truth and justice and brotherly love. I would implore the young men of the New India of to-day to maintain, with Keshub, an open mind and an unprejudiced outlook, and be bound down by no slavish worship of the past, but follow Truth and Light into Freedom and Victory!

ব্রহ্মানন্দের তিরোধান স্মৃতিসভার জন্য
আচার্য্য যদুনাথের স্বহস্ত-লিখিত
শ্রদ্ধাঞ্জলির ফটো-চিত্র

3rd January 1953.

Modern India will be failing in its duty if it forgets what it owes to Keshav Chandra Sen. The new light and reforming zeal which the impact of English education gave to us, were passed from Calcutta to the towns and villages of the mufassil and, from Bengal to the other provinces of India primarily through his initiative and everywhere it established itself through his noble personality.

He was more than a religious preacher. In that dim dawn of our renaissance in the eighteen sixties, it was Keshav who introduced female education by breaking the stone wall of old superstition which then held